ঠাকুর দয়ানন্দ

বিশ্বশান্তি

শ্রীযদুনাথ সিংহ, এম. এ, পি. আর. এস,
দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, মিরাট কলেজ,
প্রণীত।

অরুণাচল মিশন

১৩৩৬

মূল্য ১২৲।

ভৈরবভীমশঙ্কাহরণ, অচপল-আলো-দাতা,

সুখশান্তি, বিশ্বমৈত্রী, যাঁর রাতুল চরণে পাতা ;

সেই সে নায়ক, কুসুম-সায়ক, ছুঁড়িয়া হরিল

ছিল দুখ যত, ভবত্রাতা !

দীনবন্ধু, করুণাসিন্ধু, জয় দয়ানন্দ—

ধরণী করিল করুণাস্নাতা ।

কলিকাতা ৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে, সুরেশচন্দ্র মজুমদার

মুদ্রিত ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস, মন্সিপাড়া, দিনাজপুর, কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ভূমিকা

মানবজাতির জীবন-ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে একদিক দিয়ে পুরাতন চ'লে যাচ্চে, আর একদিক দিয়ে নূতন এসে তার স্থান গ্রহণ ক'রছে।

সৃষ্টির প্রথমে আসে নূতন চিন্তা, নূতন ভাব, নূতন প্রেরণা। আর আসেন এই নূতন চিন্তা, নূতন ভাব, নূতন প্রেরণা নিয়ে এক নূতন মানুষ। তাঁহার ভিতর দিয়ে এই নূতন চিন্তা চিন্তা-জগতে ব্যাপ্ত হয়, তাঁহার ভাব প্রাণে প্রাণে ভাবের প্লাবন ঘটায়, তাঁহারই প্রেরণায় মানুষ অসাধ্য সাধন ক'রতে ছুটে। নূতন জগৎ গ'ড়ে উঠে।

ক্ষুদ্র, বৃহৎ, জগতে যত পরিবর্ত্তন ঘটেছে সব এই ভাবে।

আজ পুরাতন জগৎ ভেঙ্গে প'ড়ছে, নূতন জগৎ গড়ে উঠছে। শিল্পী প্রথমে গড়ে তার মনে, তার পরে স্থূলে। বাহিরের রূপসৃষ্টি, তার মনের ভিতর যে ছবি সে এঁকে নিয়েছে তারই অনুরূপ হয়। সৃষ্টির পিছনে থাকে একটি প্ল্যান, একটি ডিজাইন, একটি স্কীম।

এই যে নূতন জগৎ গ'ড়ে উঠছে তাহাও ঠিক প্ল্যান মত, কোনও খেয়ালের বশে নয়। এই নূতন জগৎসৃষ্টির পিছনে রয়েছে একটি স্কীম—আর একটি বিরাট মন যেখানে এই স্কীমের উৎপত্তি, যেখান থেকে প্রেরণা আসছে।

এই মনের চিন্তার বশে বিশ্বমানবের চিন্তা রূপান্তরিত হচ্চে। এই ভাবুকের ভাবধারা বিশ্বমানবের ভাবকে পুষ্ট ক'রছে। এই মহাপ্রাণের প্রেরণাই বিশ্বমানবকে কর্ম্মপ্রেরণা দিচ্চে। লোকচক্ষুর অগোচরে থেকে কোনও অতিমানব এই নূতন

জগৎ সৃষ্টি ক'রছেন। বিশ্বের নরনারীর জীবনধারা এই স্কীমের বশে পরিবর্ত্তিত হচ্চে। কিন্তু তারা চলেছে অজ্ঞানে, অনিচ্ছায়, অবস্থার তাড়নায়, বাধ্য হয়ে। তারা চলতে চাইছে স্রোতের বিরুদ্ধে। তাই জগতে এত অশান্তি, এত দুঃখকষ্ট। এই স্কীমটী উপলব্ধি ক'রে, সজ্ঞানে, পরিপূর্ণ ইচ্ছা নিয়ে, সানন্দে, স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চ'ললে জগতের সকল দুঃখের অবসান হবে, বিশ্বমানবের সুখ, শান্তি, আনন্দ লাভ হবে।

বাংলাদেশের ভাইবোনেরা এই স্কীমটী ভাল ক'রে বুঝতে পারবেন ব'লে এই বইখানি বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে।

ভারতের ভাইভগ্নিদের, বিশেষ ক'রে ভারতের নেতাদের জনে, জনে, বুঝাবার চেষ্টা অরুণাচল করে এসেছে। কিন্তু তাঁদের চিন্তা এখনও নিম্নস্তরে পড়ে রয়েছে।

এই স্কীম উপলব্ধি ক'রে সজ্ঞানে এই স্কীমকে অনুসরণ ক'রে না চ'ললে ভারতের স্বাধীনতালাভের চেষ্টা ব্যর্থ হবে, অশেষ দুঃখলাঞ্ছনা তাকে ভোগ ক'রতে হবে।

শ্রীযদুনাথ সিংহ

প্রকাশকের নিবেদন

প্রায় এক বৎসর কাল "বিশ্বশান্তি" লেখা হয়ে প'ড়ে ছিল। বহু বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়ে, একমাত্র শ্রীভগবানের কৃপায় বইখানি প্রকাশিত হ'ল। স্থানে স্থানে ভুলত্রুটী থাকিল। যেখানে অর্থবোধের অসুবিধা, পৃথক শুদ্ধিপত্র দিয়ে সংশোধন করা গেল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস

সূচীপত্র

ওঁ দয়ানন্দ

বিশ্বশান্তি

প্রথম অধ্যায়

অমৃত-বারতা

"অরুণাচলে অমৃত-বারতা
জয় মা বলিয়ে জাগ জীবগণ।
*　　*　　*
মহাভ্রাতৃভাবে করিয়ে বন্ধন,
বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে কর আলিঙ্গন।
সুখ শান্তিভরা হবে বসুন্ধরা,
হবে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে মগন॥"

এই হ'ল জগতের কাছে অরুণাচলের বাণী। এই হ'ল অরুণাচলের জীবন-সঙ্গীত। এই হ'ল অরুণাচলের মিশন—জীবকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদান, পৃথিবীতে শান্তি-স্থাপন, সমগ্র জগতে এক মহাভ্রাতৃরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। এই সঙ্কল্প নিয়ে যে দিন শ্রীশ্রীঠাকুর দয়ানন্দ দেব অরুণাচল মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন, সে আজ ২০ বৎসর আগেকার কথা। ১৩১৫ সালের পৌষ

সংক্রান্তির দিন একটী আশ্রম স্থাপিত হ'ল—আসামের শিলচর সহর হতে ৩ মাইল দূরে, একটী পাহাড়ের উপর, বরবক্র নদীর তীরে। আশ্রমের নাম দেওয়া হ'ল "অরুণাচল"। আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হ'ল কালীমূর্ত্তি স্থাপন ক'রে। মায়ের নাম দেওয়া হ'ল "আনন্দময়ী"। মিশনের কার্য্যারম্ভ হ'ল মায়ের আরাধনা ক'রে।

দয়ানন্দের মুখে এই অমৃতবারতা শুন্‌বার জন্য দলে দলে মানুষ আস্‌তে লাগ্‌লো। স্বদেশী আন্দোলন তখন আরম্ভ হ'য়ে গেছে, সমস্ত দেশময় এক নূতন প্রাণের সাড়া পড়েছে, জাতীয় ভাবের উন্মেষ দেখা দিয়েছে। দয়ানন্দ তাদের ডেকে বল্লেন, তারা "ভ্রান্ত পথে চলেছে—একেবারে গোড়ায় না গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়া একটা ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছে। ধর্ম্মকে জাগ্রত না করিলে কিছুতেই কিছু হইবে না। যিনি ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, তিনি চিরস্বাধীন। মানুষের আত্মা যদি স্বাধীন না হয়, তবে পদে পদে দুর্ব্বলতা আসিবে, আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে।"

তখনকার দিনে এ কথা অনেকেরই ভাল লাগে নাই। আজ কিন্তু এ কথাগুলির সত্যতা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছেন। দয়ানন্দের প্রথম ও প্রধান কার্য্য হ'ল মানুষের প্রাণে এই ধর্ম্মকে জাগ্রত করা। যুবকবৃন্দের ভিতর থেকে তিনি কয়েকটীকে বেছে নিলেন এবং তাদের নিয়ে কার্য্য আরম্ভ ক'রলেন। তিনি তাদের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগ্‌লেন।

নবযুগের নবধর্ম্ম

এ কোন্ ধর্ম্ম? এ ধর্ম্ম আচার অনুষ্ঠানের ধর্ম্ম নয়, এ ধর্ম্ম শ্বাস প্রশ্বাস রোধ ক'রে দুঃসাধ্য সাধন নয়, এ ধর্ম্ম সংসারবিরাগী বনবাসীর ধর্ম্ম নয়, এ ধর্ম্ম কর্ম্মবিমুখ অলসতার প্রশ্রয় নয়। এ নবযুগের নবধর্ম্ম, সত্যযুগের সত্যধর্ম্ম। দয়ানন্দ পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন মদকে নূতন বোতলে ঢেলে তাকে নূতন ব'লে চালাবার চেষ্টা করলেন না। তিনি বল্লেন, "আমি সহজ সংস্কার চাই না, আমূল সংস্কার চাই। আমি মালা তিলকের দ্বারা সমাজে সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে চাই না। এ দেশে ধর্ম্মের আদর্শ মলিন হইয়া গিয়াছে, আচার তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে, মনুষ্যত্ব দেখিয়া বিচার করিবার শক্তি নাই—মালা তিলকাদি ধর্ম্মের বাহ্যিক বেশভূষা দেখিয়াই লোকে সাধুতার বিচার করিতে বসে। এ স্রোত সম্পূর্ণরূপে ফিরাইতে হইবে। বাহিরের দিকে অতিরিক্ত দৃষ্টি পড়িলে লোকে ভিতরের দিকে যাইতে চাহিবে না।"

তাই তিনি চাইলেন—তাঁর শিষ্যদের নিয়ে এমন "এক দল সন্ন্যাসী গঠন করিয়া যাইতে যাহারা জীবনে পূর্ণতার দৃষ্টান্ত দেখাইবে"। তিনি চাইলেন "ভারত থেকে চিমৃটা কমণ্ডলুর আদর উঠাইয়া দিতে"।

তিনি চাইলেন—মানুষকে একাধারে ত্যাগী এবং ভোগী, গৃহী এবং সন্ন্যাসী, ভক্ত অথচ জ্ঞানী, জ্ঞানী অথচ কর্ম্মী, সাধক অথচ বাহ্যাড়ম্বরশূন্য, শ্রীভগবানের সঙ্গে নিত্যযোগযুক্ত তাঁহারই হাতের যন্ত্র, এই বোধসম্পন্ন নিরভিমান কর্ম্মীর দল গঠন করতে। উৎকট সাধন ভজন থেকে, পুরাতন শাস্ত্রকথার পুনরাবৃত্তি থেকে, রন্ধনশালার ধর্ম্ম থেকে তিনি তাঁর ভক্তদের মুক্তি দিলেন। তিনি তাদের বল্লেন, "কেবল তাঁকে মা মা বলিয়া ডাক, আর কিসের সাধন ভজন? তাঁর প্রতি যদি নিষ্ঠা থাকে, তবে মাছ মাংস খাও, যাহা ইচ্ছা কর, কিছুতেই পতন হতে পারে না। অভিমান ছাড়া আর কিছুতেই সাধকের পতন হয় না। যতক্ষণ মনে থাকিবে আমি কিছু নই, আমি তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র, ততক্ষণই এক 'বৃহৎ আমি' তোমার পাছে রহিয়াছেন অনুভব করিতে পারিবে কিন্তু যে মুহূর্ত্তে অহঙ্কার মনে আসে, সেই মুহূর্ত্তে 'ছোট আমি' ফিরিয়া আসিবে। কামিনীকাঞ্চন না ছাড়িলে যদি ধর্ম্ম না হয় তবে জগতের কোটি কোটি লোক কখনই ধর্ম্মপথে আসিবে না। আমি পূর্ণতা চাই, ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় চাই, সাংসারিক জীবনের সঙ্গে পারমার্থিক জীবনের বিচ্ছেদ দূর করিয়া

দিতে চাই। এ যুগের মানুষকে সবল-চিত্ত হইতে হইবে। ভোগ ছাড়িবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ত্যাগ সঙ্গে রাখিতে হইবে। ভোগ ও তাঁহার, ত্যাগও তাঁহারই। প্রাণের ভিতর যদি তাঁহারই আলোক জ্বলে, প্রতি কার্য্যের মধ্যে যদি তাঁহারই খেলা, তাঁহারই আনন্দ দেখি, তবে ভোগও বন্ধন হইবে না। অনাসক্তিই ত্যাগ—অনাসক্তিই প্রকৃত সন্ন্যাস,—অনাসক্ত হইয়া কামিনীকাঞ্চনের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।"

ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয়

এই ত্যাগ এবং ভোগের সমন্বয়ই এ যুগের বাণী। ইহাই এ যুগের সাধ্য। জগতের কতক লোক ভোগ ক'রতে ক'রতে ভোগের ভিতর তাদের প্রাণ হারিয়ে ফেলেছে। পার্থিব ভোগ ছাড়া তারা আর কিছু জানে না, বুঝে না। ভোগের লালসাতেই তারা নিশিদিন ব্যস্ত, নিজের ভোগের জন্য তারা পরের দুর্ভোগ ঘটাতেও কুণ্ঠিত নয়। এই ভোগস্পৃহা তাদের মনকে, তাদের চিন্তাকে, তাদের বুদ্ধিকে পার্থিব বস্তুর উপরে উঠতে দিচ্চে না। ছোট জিনিষ আস্বাদন ক'রতে ক'রতে মানুষ বড় জিনিষের, ভাল জিনিষের আস্বাদন ভুলে গিয়েছে। বড় জিনিষ আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষাও তাদের লোপ পেয়েছে। ক্ষুদ্র জিনিষের, ভোগে যে সুখ উৎপন্ন হয় তাহা ক্ষণস্থায়ী,

বৃহৎ জিনিষের ভোগে যে সুখ তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী। পার্থিব জিনিষ ভোগ ক'রে যে সুখ তাহা মানবের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখ। কিন্তু মানুষ তো শুধু ইন্দ্রিয় নয়, পঞ্চেন্দ্রিয়কে অবলম্বন ক'রে সে পার্থিব জগতের সঙ্গে যোগ স্থাপন ক'রে রয়েছে বটে। কিন্তু ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হলেও সে ইন্দ্রিয়াতীত পুরুষ। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে পার্থিব জগতকে ভোগ ক'রে সে যে সুখ আহরণ করে তাতেই এই ইন্দ্রিয়াতীত পুরুষ তৃপ্ত হন না। পার্থিব বস্তুর ভোগে সহজেই অবসাদ আসে, তখন মানুষ এক বস্তু ছেড়ে আর এক বস্তু ধরে। এমনই ক'রে ভোগের কাছে সে আত্মবিক্রয় করে।

এই ভোগস্পৃহা মানুষের মজ্জাগত। ইহা মানুষের প্রকৃতি। ভগবান মানুষকে এই ভোগস্পৃহা দিয়েছেন। এক দিকে, ভোগস্পৃহার দ্বারা চালিত হ'য়ে সে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে যোগ রক্ষা ক'রে জগতে বিচরণ ক'রছে। এইরূপে জগতের নাট্যশালায় শ্রীভগবানের অনন্ত লীলা চলছে। আবার এই ভোগস্পৃহাই তাকে ছোট জিনিষ ছেড়ে বড় জিনিষ, বড় জিনিষ ছেড়ে আরও বড় জিনিষ, এমনই ক'রে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ভোগের দিকে নিয়ে যায়। ভগবান স্বয়ং ভোগরত। তিনি নিজেকে নিজে ভোগ ক'রছেন। তিনি তাঁহার সৃষ্টির আনন্দ, তাঁহার লীলার আনন্দ ভোগ করছেন। এই ভোগস্পৃহাকে অস্বীকার ক'রলে বা ইহাকে উচ্ছেদ ক'রবার চেষ্টা ক'রলে মানুষ প্রকাণ্ড ভুল করবে। কিন্তু ইহার হাতে মানুষ নিজকে ছেড়ে দিলেও তার প্রাণ ক্ষুদ্র বিষয় ভোগেই ম'জে যাবে। কাজেই মানুষ ভোগ ক'রবে বিচার ক'রে।

ভোগের সঙ্গে এমন জিনিষ রাখবে যাতে সে ভোগে ডুবে না যায়। সেই জিনিষ ত্যাগ।

মানুষ ভোগ করবে, আবার ত্যাগও ক'রবে। ভোগ না ক'রলে যেমন ত্যাগ হয় না, আবার ত্যাগ না থাকলেও ভোগ হয় না। ত্যাগই ভোগের আস্বাদ বাড়িয়ে দেয়। মানুষ সেই জিনিষই প্রকৃত ভোগ করে যাহা সে ত্যাগ করতে পারে। একখানি শীতবস্ত্র নিজের গা থেকে খুলে পথের কাঙ্গাল ভাইটিকে মানুষ যখন দিতে পারে তখনই সে পূর্ণরূপে তাহা ভোগ ক'রল। কাজেই ভোগের সঙ্গে ত্যাগকে রাখতে হবে।

আবার ত্যাগের সঙ্গে ভোগকে না রাখলে চলবে না। শুধু ত্যাগের আদর্শ আদর্শই নয়। ত্যাগের সঙ্গে ভোগকে না রাখলে ত্যাগই হয় না। নিছক ত্যাগের আদর্শ নিকৃষ্ট ভোগের আদর্শ। ভোগ বন্ধন হবে এই ভয়ে যে মানুষ কৌপীন পরে ব'সল, সে কৌপীনখানিও ভোগ করে। যে কৌপীন ত্যাগ ক'রে একেবারে দিগম্বর সেজেছে সেও শরীর ধারণের জন্য আহার গ্রহণ করে। কিছু না কিছু তাকে ভোগ করতেই হয়, না হ'লে তার বেঁচে থাকবার জো নাই। বৃষ্টির সময় তাকে আচ্ছাদনের তলে আশ্রয় নিতে হয়, শীতের সময় তাকে অগ্নির উত্তাপও ভোগ ক'রতে হয়। মানুষ একেবারে পার্থিব বস্তুর ভোগ ছাড়া বাঁচতেই পারে না। শীতের সময় হয় তাকে ছাই মেখে আগুনের ধারে বসে থাকতে হবে, না হয় শীতবস্ত্র গায়ে দিতে হবে। দুইই ভোগ, একটা নিকৃষ্ট, অপরটী উৎকৃষ্ট। শীতবস্ত্র মানুষকে কষ্ট

ক'রে আহরণ করতে হয়। আর কাঠ সংগ্রহ ক'রে, আগুন জ্বালিয়ে ছাই সংগ্রহ করতেও মানুষকে, সামান্য হলেও, কষ্ট ক'রতে হয়। দুয়েই মন ও সময় দিতে হয়। একটি যদি বন্ধন না হয়, অপরটিও না হতে পারে। মানুষের মন যদি শ্রীভগবানে অর্পিত হয় তবে উৎকৃষ্ট শীতবস্ত্র ব্যবহার ক'রেও সে সাধু, তার মন যদি ভগবানের কাছ থেকে দূরে থাকে তবে সাধুর বেশভূষা নিয়েও সে অসাধু।

তাই ঠাকুর দয়ানন্দের কথা, অনাসক্তিই ত্যাগ আসক্তিই ভোগ। মানুষ সব ছেড়ে এসে কৌপীনেও আসক্ত হ'তে পারে, যদি আসক্তি তার মন থেকে না গিয়ে থাকে। উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি ধারণ ক'রেও মানুষ অনাসক্ত হতে পারে যদি শ্রীভগবান কৃপা ক'রে তার মন থেকে আসক্তি দূর করে দেন। আসল কথা বিষয়ভোগও নয়, বিষয়ত্যাগও নয়। আসল কথা মনের। যার মনে আসক্তি নাই, তার পক্ষে ভোগও যাহা ত্যাগও তাহাই। বিষয়ভোগ তাহার বন্ধন নয়, বিষয়ত্যাগও মুক্তি নয়। যার মনে আসক্তি আছে, সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে গেলেও ভোগী। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছোট হরিদাসকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বর্জ্জন করেছিলেন তিনি মনে মনে ভোগ করেছিলেন ব'লে। আবার পরম ভোগী রায় রামানন্দকে অনাসক্ত ব'লে বহু আদর করেছিলেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ রঘুনাথকে তিনি উপদেশ করেছিলেন অতুল ঐশ্বর্য্যের ভিতর অনাসক্ত হয়ে থাকতে—"যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া"। তিনি নিজে যে সংসারের সমস্ত সুখভোগ ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন তার কৈফিয়ৎ তিনি

নিজমুখে দিয়েছেন—"যে কালে সন্ন্যাস কৈনু ছন্ন হইল মন।
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন॥" গীতাতেও শ্রীভগবান
বলেছেন কৌপীন প'রে, চিমটা কমণ্ডলু নিয়ে সাধু সাজবার কথা
নয়। তিনি বলেছেন "যুক্তাহারবিহারেরই" কথা। এই
যুক্তাহারবিহার ত্যাগভোগের সমন্বয়ের আদর্শ ছাড়া আর কিছুই
নয়।

মায়াবাদী বৈদান্তিক ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে জীবনের
শেষ দিন পর্য্যন্ত এই "মিথ্যা" জগতে বিচরণ ক'রে এবং এক
ভাবে না এক ভাবে ইহাকে ভোগ ক'রেও "ব্রহ্ম সত্য,
জগৎ মিথ্যা" ব'লে নিছক্ ত্যাগের এক মিথ্যা আদর্শ এ
দেশে দিয়ে গিয়েছেন। বৈষ্ণব সাধুসন্ন্যাসীরাও পুরাতন সংস্কার-
বশে ভোগকে বিভীষিকা জ্ঞান ক'রে ত্যাগের পথই দেখিয়ে
গিয়েছেন। পূর্ণ ত্যাগ ক'রতে হলে পৃথিবী ত্যাগ ক'রতে
হয়। তাহা অসম্ভব। নিছক্ ত্যাগের আদর্শ একটা নিকৃষ্ট
ভোগের আদর্শ ছাড়া আর কিছু নয়। ইহা দ্বারা মানবসমাজের
কল্যাণ হ'তে পারে না। এরূপ আদর্শ মানবের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।
এরূপ আদর্শ জনসমাজকে দিলে তাহা আদর্শই থেকে যাবে,
মানুষ কোনও দিন তাহা পালন করতে পারবে না। ফলেও
তাহাই হয়েছে। ভারতে বাইশ কোটি হিন্দুর মধ্যে ৫৪ লক্ষ
হিন্দু সন্ন্যাসী, সকলে চিম্‌টা কমণ্ডলুধারী না হলেও, আর
অনেকে উৎকৃষ্ট ভোগী হ'লেও, এই ত্যাগের কথাই শুধু মানুষকে
তাঁরা শুনিয়ে থাকেন। কিন্তু তার ফল কি হয়েছে? আদর্শ
এক দিক দিয়ে গিয়েছে, সমাজের জীবনধারা আর এক পথ দিয়ে
গিয়েছে। বাইশ কোটি হিন্দু এই সব সাধু সন্ন্যাসীকে ছুটা

চারটি পয়সা দেয়, কখনও বা প্রণামও ক'রে, কিন্তু হিন্দুসমাজ কোনও দিনই এই আদর্শ গ্রহণ করে নাই। যারা ভোগ করছে তারা ভোগই করছে, যারা ত্যাগ করেছে তারা নিকৃষ্ট ভোগ করছে।

এরূপ আদর্শ কখনও জনসমাজের আদর্শ হ'তে পারে না। ইহাতে জনসমাজের আদর্শে এবং আচরণে তফাৎ হয়। আদর্শ ঠিক না হ'লে এবং আদর্শ অনুযায়ী আচরণ না হ'লে, আচরণও দূষিত হ'য়ে যায়।

এই যুগের আদর্শ ত্যাগভোগের সমন্বয়। এই যুগাদর্শ দয়ানন্দ মানবসমাজকে দিলেন। এই আদর্শই সত্য আদর্শ, এই আদর্শই প্রকৃত ধর্ম্মের আদর্শ। সার্ব্বজনীন সত্যের উপর এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। ইহা শুধু হিন্দুর নয়, ভারতবাসীর নয়। সমস্ত পৃথিবীর নরনারীর জীবন এই আদর্শ ধ'রে চললেই সুখ ও শান্তিপূর্ণ হতে পারে। মানুষ ভোগেও আসক্ত হবে না; ত্যাগেও আসক্ত হবে না। ত্যাগ ও ভোগের উপরে সে সহজভাবে অবস্থান করবে।

মানুষ ভোগ ক'রবে ছোট জিনিষ নয়। সে ভোগ ক'রবে বড় জিনিষ। জগতের যাহা সার জিনিষ, যাহাতে অবসাদ আসে না, যাহা দুদিনেই ফুরিয়ে যায় না, তাহাই মানুষ ভোগ ক'রবে। "ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।" ভূমানন্দ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ সে ভোগ করবে। তার জীবনের লক্ষ্য হবে শ্রীভগবানের অনন্ত লীলার সহচর হ'য়ে এই ভূমানন্দ উপভোগ করা। কিন্তু সে রয়েছে এই পার্থিব জগতে। এই পার্থিব জগতকে ভুললে, একে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দিলে, একে

অবহেলা ক'রে কেবল ভূমানন্দের দিকে লোভ করলে, সে তার খণ্ড দৃষ্টিরই পরিচয় দিবে, শ্রীভগবানের লীলার গূঢ় তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সে নিজের অজ্ঞতারই পরিচয় দিবে। এই লীলার জগতকেও সে পূর্ণভাবে উপভোগ ক'রবে। সমস্ত ভোগের ভিতর সে সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানকেই ভোগ করবে।

দয়ানন্দ মানুষকে দিতে চাইলেন পূর্ণ মানবতা, পূর্ণ সামঞ্জস্যময় জীবন। প্রাচ্যের ত্যাগের আদর্শ একদেশদর্শিতাদুষ্ট, প্রতীচ্যের ভোগের আদর্শও তাহাই। এই দুই আদর্শের সমন্বয় ক'রে পূর্ব্ব এবং পশ্চিমকে একই সার্ব্বজনীন আদর্শে দয়ানন্দ অনুপ্রাণিত ক'রতে চাইলেন। দশ বৎসর পরে তিনি জগতকে যে বিশ্বমিলনী স্কীম দেন তাহাতে এই ত্যাগভোগের পূর্ণ সামঞ্জস্যের সুরই বাজছে।

নবযুগে নারীর স্থান

ভাগবত জীবনলাভের নূতন এই পথ দেখিয়ে দিয়েই দয়ানন্দ ক্ষান্ত হ'লেন না। তাঁর বিশেষত্ব শুধু বলায় নয়, করায়। বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাজে প্রবৃত্ত হলেন। অনেক সময় তিনি আগে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তার পরে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি শুধু গুরু নন, তিনি ভক্তদের কার্য্যে নেতা। তিনি শুধু শিক্ষক নন, তিনি সহকর্ম্মী। উপদেশ দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে নিজে কাজ ক'রে শিক্ষা দেওয়াই তিনি বেশী পছন্দ করেন। ধর্ম্ম মানার চেয়ে ধর্ম্ম পালনের উপরই তিনি বেশী জোর দেন। কথার চেয়ে কাজের মূল্যই তাঁর কাছে বেশী।

দয়ানন্দের একটী বড় কাজ হ'ল স্ত্রীজাতিকে মুক্তি দান।

"নারী নরকস্য দ্বারং"—একথা তিনি স্বীকার ক'রলেন না। তিনি নারীকেও আশ্রমে স্থান দিলেন। পুরুষও সাধক, নারীও সাধক। ভগবানকে ভুলে যদি একজন আর একজনের প্রতি আসক্ত হয়, তবে তার নরক ভোগই হয়। কিন্তু সমস্ত জগতে স্ত্রী আর পুরুষের মাঝখানে এক অভ্রভেদী প্রাচীর তুলে উভয়কে রক্ষা করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। জীবনের কোন কাজই তো স্ত্রীলোককে বাদ দিয়ে চলে না, তাকে সঙ্গে নিতেই হবে। ধর্ম্মের ক্ষেত্র থেকে, সাধনের ক্ষেত্র থেকে তাকে বাদ দিলে স্ত্রীপুরুষ সমস্যার সমাধান কোন দিনই হবে না। ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও স্ত্রীলোককে সমান প্রবেশাধিকার দিতে হবে। ইহার প্রতিকার স্ত্রী এবং পুরুষকে ধার্ম্মিক করা, উভয়ের প্রাণে ধর্ম্মের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া, উভয়ের মনকে বলিষ্ঠ, দৃঢ় ও সংযমী করা। দয়ানন্দ স্ত্রীলোককে পুরুষের সঙ্গে সমান আসন দিলেন। স্ত্রীলোককে অধঃপতিত, হীন এবং কেবল গৃহকর্ম্মে আবদ্ধ ক'রে রাখলে সমস্ত মানব সমাজের কল্যাণের পথই রুদ্ধ ক'রে রাখা হয়। দয়ানন্দ স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা দিলেন, তাদের অবগুণ্ঠন উঠিয়ে দিলেন, পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দিলেন। একজন আশ্রম-সেবিকাকে মূল আশ্রম অরুণাচলের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত ক'রলেন। সেদিন এই পুরুষসিংহ বলেছিলেন, "আজ আমি যাহা করিলাম, একদিন সমস্ত জগৎ ইহা করিতে বাধ্য হবে। ইহা ভবিষ্যতের রিহার্সেল্ হ'ল।" বহুদিন পরে যখন কলিকাতার কংগ্রেসে মিসেস্ এনি বেসান্তকে সভানেত্রী করা হ'ল, সেদিন তিনি কলিকাতাস্থ সব ভক্তদের বলেছিলেন কংগ্রেসে যোগদান করতে। শুধু কংগ্রেসে একজন নারীকে

সম্মান ক'রে সমগ্র নারীজাতিকে সম্মান করা হ'ল এবং নারীকে তাহার ঈশ্বরদত্ত আসন দেওয়া হ'ল—এইজন্য।

আজ ২০ বৎসর পরে, অবস্থায় বাধ্য হ'য়ে হিন্দু সমাজ নারীজাতি সম্বন্ধে তার ধারণা, নারীর প্রতি পুরুষের ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ক'রতে বাধ্য হয়েছে। আজ হিন্দু সমাজ বাহিরে, জগতের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে, সামাজিক সংস্কারকার্য্যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে, শ্রমিক-ধনীর দ্বন্দ্বে নেতৃত্ব ক'রতে, সমুদ্র পারে হিন্দু জাতির হ'য়ে বিশ্বমানবের দরবারে হিন্দু সভ্যতার কথা ব'লতে নারীকে আহ্বান ক'রছে। আজ নারীরা প্রকাশ্যভাবে অভিনয় পর্য্যন্ত ক'রছে, পরপুরুষের কাছে লাঠি খেলা শিখছে। অবস্থায় বাধ্য হ'য়ে হিন্দু সমাজের নেতারা, শাস্ত্রজ্ঞ নিষ্ঠাচারী পণ্ডিতরা সকলেই আজ ব'লছেন নারীকে এ অবস্থায় রাখলে চ'লবে না, তাদের স্বাধীনতা দেওয়া দরকার, তাদের শারীরিক উন্নতি বিধান করা দরকার, মুক্ত বায়ু সেবন এবং শারীরিক ব্যায়াম তাদের পক্ষেও দরকার। আঘাতের পর আঘাত ক'রে শ্রীভগবান আজ হিন্দু সমাজকে নারীজাতি সম্বন্ধে সজাগ এবং তাদের উন্নতির জন্য সচেষ্ট ক'রে তুলেছেন। নারীর প্রতি পুরুষের ব্যবহারে আজ অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন এসেছে। কিন্তু ২০ বৎসর পূর্ব্বে গোঁড়ামি যখন চারি দ্বার রুদ্ধ ক'রে আরামে নিদ্রা যাচ্ছিল, আর দয়ানন্দ যখন রুদ্রতেজে তার বন্ধ দুয়ার ভগ্ন ক'রে নব যুগের নবীন সাধনাকে আহ্বান ক'রে আনলেন, তখন সমাজ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দয়ানন্দ এবং তাঁহার ভক্তদের উপর অত্যাচার আরম্ভ ক'রে দিল। যুগে যুগে এইরূপই হ'য়ে আস্‌ছে। দয়ানন্দ আমূল সংস্কার চাইলেন, তিনি বল্লেন, "পথ কণ্টকাকীর্ণ হ

হউক বা কুসুমাস্তীর্ণই হউক, আমি চলিবই।" বহু কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়েই তাঁকে যেতে হ'ল।

যুগ-সাধন—আত্মসমর্পণ

বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের একটি ভাইকে লিখেছিলেন :—"**এ যুগে তোমাদের একমাত্র সাধন আত্ম-সমর্পণ**"।

একদিন ভাবাবেশে তিনি গেয়েছিলেন :

"গৌর গৌর গৌর ব'লে এবার নাচিব।
গৌরহার গলে প'রে জীবকে মাতাব॥

* * * *

ছেড়ে দিব তন্ত্র মন্ত্র, গৌর যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।
যেম্নি বাজায়, গৌর ব'লে তেম্নি বাজিব॥
(যেম্নি নাচায়, গৌর ব'লে তেম্নি নাচিব)॥

এতদিন জগতের সাধনার ধারা ছিল আত্মচেষ্টার দ্বারা ভগবানকে লাভ করা। বৈরাগ্য, সংসারত্যাগ, শরীরকে নানা প্রকারে কষ্ট দিয়ে মনকে শাসন করা, নানারূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা মনের বৃত্তিগুলিকে ধ্বংস ক'রে তাকে স্থির করা, ইহাই ছিল ভগবানকে পাওয়ার উপায়। ভগবান মানুষকে সংসারে পাঠিয়েছেন, কিন্তু এই সংসারের সঙ্গে তাঁহার চির-বিরোধ, তিনি মানুষের ভোগের অসংখ্য বস্তু দিয়েছেন, মানুষের ভিতর ভোগের প্রবৃত্তি দিয়েছেন, কিন্তু এ সবই মানুষকে ভোলাবার জন্য, মানুষ ভোগ করলেই তাঁকে হারাবে। ভগবান এই জগতের মাঝে নিত্যই ক্রিয়ারত।

মানুষের ভিতর এমন এক প্রকৃতি দিয়েছেন যাহা তাকে স্থির হ'য়ে বসে থাকতে দেয় না, তাকে নিয়ত কর্ম্মে নিযুক্ত করে। কিন্তু এই কর্ম্মই ছিল সাধকের বিভীষিকা। সাধক মনে করতেন সংসারে থেকে সাংসারিক কর্ম্ম করা ভগবানকে পাওয়ার প্রতিবন্ধক। কর্ম্ম করতে করতে মানুষ কর্ম্মের জালে জড়িয়ে পড়ে। কর্ম্ম মহাবন্ধন। কোনও রূপে এই কর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন ক'রে পলায়ন ক'রতে পারলে মানুষের ভগবৎ-প্রাপ্তির পথ সুগম হয়। মানুষের আচরণে প্রকাশ হ'ত যেন কর্ম্মের কর্ত্তা সে। কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলের সংস্কার এমনই প্রবল হ'য়ে উঠেছিল। মানুষের যত কিছু দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, সমস্ত অঘটন ঘটায় এই কর্ম্মফল। মানুষের বিষম শত্রু এই কর্ম্ম। ভগবান তাঁহার অপরা প্রকৃতিতে জীবকে এমনই এক মায়াতে আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন, এমনই এক কর্ম্মের জালে মানুষকে জড়িয়েছেন! মানুষের পক্ষে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়, ভগবানের এই মায়াজাল ছিন্ন করা। চক্রীর চক্রকে ব্যর্থ ক'রে দেওয়া। সংসারী সৎ কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মকে ক্ষয় ক'রে, প্রাক্তন কর্ম্মফলের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা ক'রত। তার চেয়েও বেশী যাঁহারা ধর্ম্ম লাভ করতে চাইতেন তাঁরা সমস্ত কর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়ে সংসার থেকে পলায়ন ক'রে ধর্ম্মসাধন ক'রতেন।

এই সংসার যে "অনিত্য", "দুদিনের" তাহা ভারতের উচ্চতম সাধক থেকে নিরক্ষর শাস্ত্রজ্ঞানহীন কৃষক পর্য্যন্ত জানে। কে বা তোমার স্ত্রী? কে বা তোমার পুত্র? বাড়ীঘর, ধন ঐশ্বর্য্য, খাওয়া পরা, সবই মায়া। এই "মায়াময়মিদং অখিলং

হিত্ব” ব্রহ্মপদ লাভের উপায় বৈরাগ্য-সাধন, সংসারত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ।

সাধকের পক্ষে স্ত্রীলোকের মুখদর্শন ক’রতে নাই, স্ত্রী শব্দ উচ্চারণ ক’রতে নাই, অথচ সেই স্ত্রীলোক না থাকলে তিনি জগতের মুখদর্শন ক’রতেন না। কামিনী আর কাঞ্চন মানুষের মহালোভের কারণ। ভগবানকে যে লাভ করতে চায়, কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ তার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য।

যুগ যুগ ধ’রে ভারতবর্ষে যে সাধনধারা চ’লে এসেছে তাহা এইরূপ। ভারতবর্ষের সমস্ত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিই ছিল এইরূপ। কিন্তু এই দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, এই আদর্শ অপূর্ণ, এই জীবন খণ্ড। ভগবানকে লাভ করার এই যে চেষ্টা তাহা মানুষের আত্মচেষ্টা।

দয়ানন্দ চাইলেন ভারতবর্ষের এবং জগতের সাধনধারাকে পরিবর্ত্তন ক’রে দিতে। তিনি বল্লেন, এ জগৎ মিথ্যা নয়। ব্রহ্ম যদি সত্য হন তবে ব্রহ্মের প্রকাশ এই জগৎ মিথ্যা হবে কেন? জগৎ পরিবর্ত্তনশীল বটে, কিন্তু তাহা মিথ্যা নয়। ব্রহ্ম সৃষ্টি করেছেন এই জগৎ—তাঁর নিজের ভিতর হ’তে। এই জগৎ তাঁহাতেই অবস্থান ক’রছে, তাঁহাতেই ধৃত। “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম”। সুতরাং ইহাকে মিথ্যা ব’লে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে হবে কেন?

দয়ানন্দ বল্লেন, জগৎও সত্য, পার্থিব বস্তুর ভোগে মানুষের ভগবৎপ্রাপ্তির বিঘ্ন হয় না। মানুষ ভোগ করে ইহা ভগবানের অভিপ্রেত। কিন্তু ভোগের ভিতর সে নিজকে হারিয়ে না ফেলে তার জন্য চাই ত্যাগ সঙ্গে রাখা।

ভোগও মানুষের লক্ষ্য নয়, ত্যাগও নয়। লক্ষ্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ। এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ মানুষের ঘটে, যখন সে আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের সঙ্গে নিত্য যোগযুক্ত। শ্রীভগবানকে কি ক'রে সে লাভ ক'রবে? কি ক'রে তাঁহার সঙ্গে যোগযুক্ত হবে? কি উপায় সে অবলম্বন ক'রবে? কোন্ তপস্যা তাকে ক'রতে হবে?

দয়ানন্দ ব'ললেন অনন্ত ভগবানকে পাবার জন্য মানুষ কতটুকু সাধনভজন ক'রতে পারে? মানুষের শক্তি কতটুকু? সাধন-ভজন ক'রবার শক্তিও ভগবান না দিলে মানুষের সাধনভজনই হ'তে পারে না। সাধনভজন ক'রবার ইচ্ছা তিনি কৃপা ক'রে মানুষের ভিতর জাগিয়ে না দিলে, সে ইচ্ছাই মানুষের প্রাণে জাগতে পারে না। এই ইচ্ছা তিনি জাগিয়ে দিলে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে তিনি অনুকূল করে দিলে তবেই মানুষ সাধন ভজন করতে পারে, না হ'লে পারে না। সবই তাঁহার কৃপা সাপেক্ষ, তাঁহার ইচ্ছা সাপেক্ষ। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের মনে সাধন ভজনের ইচ্ছা জাগে না, বহুলোকের জাগে। এই ইচ্ছা জাগিয়ে দেন শ্রীভগবান। বহুলোকের ইচ্ছা জাগলেও আবার সকলে সাধন ভজন ক'রতে পারে না। পারিপার্শ্বিক জগৎ কাহারও অনুকূল, কাহারও প্রতিবন্ধক হ'য়ে উঠে। কাহারও মন চঞ্চল হ'য়ে উঠে, কাহারও মন সহজে স্থির হ'য়ে যায়। ইহার কোনটারই উপর মানুষের নিজের কর্তৃত্ব নাই। সমস্তই শ্রীভগবানের হাতে। সুতরাং মানুষ আত্মচেষ্টার দ্বারা ভগবানকে লাভ ক'রতে পারে না। তবে মানুষ কি ক'রবে? মানুষের 'অহং' জ্ঞান রয়েছে। তার প্রকৃতি তাকে স্থির থাকতে দিবে না। তাকে খুঁজে

দেখতে হবে তার এই 'অহং'কে কে চালিত কচ্চেন,' তার প্রকৃতি কাহার ইঙ্গিতে চ'লছে। মানুষ 'অহং' জ্ঞান থেকে চেষ্টা ক'রে বার বার ব্যর্থ হয়, তার সকল চেষ্টা ভেসে যায়। যুগ যুগ ধরে এই ব্যর্থ প্রয়াস চলেছে। এখন নূতন যুগ। এ যুগে শ্রীভগবান ইচ্ছা করেছেন মানুষের কাছে ধরা দিবেন। তাই মানুষের প্রাণে ইচ্ছা জেগেছে তাঁকে লাভ করবার, তাঁর সঙ্গে নিত্য যোগযুক্ত হবার। তিনিই কৃপা ক'রে মানুষকে তাঁকে পাবার নূতন পথ ধরিয়ে দিয়েছেন। সে পথ আত্মসমর্পণের পথ। মানুষের ভিতর এই জ্ঞান তিনি ফুটিয়ে দিচ্ছেন। তিনি সহজ সরল উপায় দেখিয়ে দিচ্ছেন। আত্মচেষ্টার দীর্ঘ পথ চলতে চলতে সাধকের যে জ্ঞান ফুটে উঠে, নবযুগের প্রভাতে তিনি প্রথমেই মানুষের প্রাণে সেই জ্ঞান জাগ্রত ক'রে দিয়েছেন।

জগতে একজন মাত্র কর্ত্তা, তিনি শ্রীভগবান। জগতে যাহা কিছু হচ্চে সব তিনিই করাচ্ছেন। মানুষ তাঁহার হাতের যন্ত্র মাত্র। এই অসংখ্য মানব-যন্ত্রকে অবলম্বন ক'রে তিনিই কার্য্য করছেন। মাঝখানে রয়েছে শুধু মানুষের 'অহং' জ্ঞান। এই 'অহং' জ্ঞান মানুষকে বুঝতে দেয় না সে যন্ত্র মাত্র, যন্ত্রীর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে যন্ত্রীর ইচ্ছামত চলাই তার চরম সার্থকতা, তার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভের উপায়। এই 'অহং'কে সঙ্কুচিত ক'রতে হবে, এই 'আমি'কে ছেড়ে দিতে হবে সেই বিরাট 'আমি'র হাতে। 'অহং কার' ? 'অহং' তাঁহার। প্রথমে চাই মানুষের প্রাণে আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প, এই চিন্তা তার প্রাণে আসা চাই, এই ভাব তার প্রাণে জাগা চাই। একজন মানুষের

প্রাণে এই সঙ্কল্প জাগ্‌লেই সমস্ত জগদ্বাসীর প্রাণে তাহা জাগ্‌বে। তাই দয়ানন্দ গাহিলেন :—

"কৃপাহি কেবলম্ মন্ত্র করে আমি সার গো।
ভবার্ণবে জীর্ণ তরী ভাসানু এবার গো ॥"

* * * *

"ছেড়ে দিব তন্ত্র মন্ত্র, গৌর যন্ত্রী আমি যন্ত্র,
যেমনি নাচায় গৌর ব'লে তেমনি নাচিব।
যেমনি বাজায় গৌর ব'লে তেমনি বাজিব ॥

দয়ানন্দ এইরূপে ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মকে যোগ ক'রে দিলেন। সাধকের প্রাণে যখন ধর্ম্মের জন্য প্রথম পিপাসা জাগে তখন সে সমস্ত কর্ম্ম থেকে অবসর নিয়ে শুধু ভগবানের প্রতি দিতে চায়। দয়ানন্দ শিখালেন "কর্ম্মই সাধন, কর্ম্ম ভগবান।" কর্ম্ম বন্ধন হয় মানুষ যখন মনে করে সে কর্ম্মের কর্ত্তা, সেই কর্ম্ম ক'রছে। আর যখন সে প্রকৃত কর্ত্তার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে মিশিয়ে দেয়, যখন সে যন্ত্রীর হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়, তখন তার কাছে কর্ম্মই সাধন, কর্ম্ম ভগবান। কর্ম্ম তখন তার ভগবৎপ্রাপ্তির অনুপায় নয়, উপায়। কর্ম্মের ভিতর দিয়ে ভগবানের সঙ্গে তার যোগ সে উপলব্ধি করে। কর্ম্ম তখন তাহার বন্ধন নয়, কর্ম্ম তাহার মুক্তি। কর্ম্মে ষোল আনা মন দিলে ভগবানকেই তাহার মন অর্পণ করা হ'ল। শুধু সদা সর্ব্বদা অন্তরে এই জ্ঞানটুকু তাকে রাখতে হবে "আমি যন্ত্র মাত্র, তুমি যন্ত্রী, তুমিই কর্‌ছ। এই কর্ম্ম হচ্চে, আমার শক্তিতে নয়, এ তোমার শক্তিতে।"

যে মুহূর্ত্তে সাধক এই সঙ্কল্প করেন, সেই মুহূর্ত্ত হ'তেই

ভগবান তার ভার গ্রহণ করেন। সংসারে চ'লতে চ'লতে বার বার তার আমিত্ব ফিরে আসে, কিন্তু শ্রীভগবান কৃপা ক'রে তার আমিত্বকে অপসারিত ক'রে দেন, ক্রমে স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতররূপে তাকে দেখান যে তিনিই তাঁহার যন্ত্রকে চালিত ক'রছেন। তখন সে প্রতি কার্য্যের ভিতর মুক্তির আস্বাদ পায়, তার আনন্দ গাঢ় হ'তে গাঢ়তর হয়। তার জীবন এক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-সঙ্গীতে পরিণত হয়।

সাধক তখন তার মনের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রবে না, তার চিত্তের বৃত্তিগুলিকে সমূলে উৎপাটিত ক'রবার বৃথা প্রয়াস পাবে না। সে মনকে ছেড়ে দিবে ভগবানের হাতে। সে ব'লবে, "তুমি লও আমার মনের ভার"। মানুষ নিজের শত চেষ্টাতেও তার মনকে সংযত, স্থির করতে পারে না। তার মন স্থির হয় তখনই যখন শ্রীভগবান কৃপা ক'রে তার মন স্থির ক'রে দেন। নবযুগের সাধক ছেড়ে দিবে তার মনের বল্গা শ্রীভগবানের হাতে। পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ সময় সময় তার মন বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যাবে কিন্তু শ্রীভগবান কৃপা ক'রে তার মন সংযত ক'রে দিবেন।

এইরূপে সাধক শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ ক'রে সমস্ত কর্ম্ম ক'রে যাবেন। খাওয়া, পরা, বসা, শোওয়া, দৈনন্দিন প্রতি কার্য্যই তিনি যথাযথ ভাবে ক'রে যাবেন, কিন্তু প্রতি কার্য্যই শ্রীভগবানে সমর্পণ ক'রে, তাঁহার যন্ত্ররূপে। ভোগ তখন তাঁর বন্ধন হবে না, ত্যাগ সহজ হবে। তখনই তাঁর কর্ম্ম হবে অনাসক্ত, শত কর্ম্মের ভিতরও তিনি মুক্ত।

মানুষ সাধন দ্বারা ভগবানকে লাভ ক'রতে চায়। তার

সাধনের বল কতটুকু ? ভগবান কি সাধনের বশ ? না। ভগবান মানুষের কাছে ধরা দেন তার সাধনের জন্য নয়। তিনি ধরা দেন নিজে ইচ্ছা ক'রে, মানুষের উপর কৃপা ক'রে। তিনি কৃপালু, তাঁহার কৃপা অহৈতুকী। তাঁর কৃপা দোকানের জিনিষ নয় যে মানুষ আত্মচেষ্টার দ্বারা, সাধনের দ্বারা তাহা ক্রয় ক'রবে। এই 'কৃপার' জন্য মানুষ কৃপার উপরই নির্ভর ক'রবে। তাঁর কৃপা হ'লে মানুষের শত বৎসরের সাধনা এক মুহূর্ত্তে হ'য়ে যায়। তাঁহার কৃপা কখন হবে তার দিন ক্ষণ নাই, সময় অসময় নাই। তিনি যে কোনও মুহূর্ত্তে, যে কোনও অবস্থায় কৃপা ক'রতে পারেন, শুধু পারেন না, কৃপা করেন। তিনি মানুষকে কৃপা করেন, মানুষের সাধনের মাপ ক'রে নয়। তিনি মানুষকে কৃপা করেন তিনি কৃপাময় ব'লে। তিনি প্রতিনিয়তই কৃপা ক'রছেন।

তবে কি মানুষ সাধন ক'রবে না ? হাঁ, সে সাধন ক'রবে কিন্তু তার নির্ভর থাকবে সাধনের উপর নয়, তার নির্ভর থাকবে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর। সে ব'লবে, 'যদি তুমি সাধন করাও ক'রবো'। এই যে সাধন তাহা ভগবানকে ধরবার ফাঁদ নয়। এ সাধন, তিনি যে অহঃরহঃ কৃপা ক'রছেন তাহা বুঝবার জন্য। এ সাধন ভগবানের জন্য নয়, এ সাধন তার নিজের জন্য, তার প্রাণের ময়লাগুলি ধুয়ে ফেলবার জন্য। মানুষ ব্যাকুল হবে সাধনের জন্য নয়, মানুষ ব্যাকুল হবে ভগবানের জন্য।

গীতাতে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য ক'রে শ্রীভগবান যে উপদেশ জগতকে দিয়েছিলেন তার সার কথা "আত্ম-সমর্পণ"।

যুগ যুগ ধ'রে গীতা নিয়ে কত বিচার, কত আলোচনা, কত শাস্ত্রমন্থন চলে এসেছে কিন্তু ভারতের সাধনায় এই আত্ম-সমর্পণের ভাবটি ফুটে উঠে নাই। আজ এই নবযুগের প্রারম্ভে দয়ানন্দ চাইলেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান, সকলকে এই সাধনপথ অবলম্বন করা'তে।

এ যুগে মানুষের জীবন হবে খণ্ড নয়, পূর্ণ। শুধু ভোগের নয়। ত্যাগ এবং ভোগের সমন্বয়ের জীবন। কর্ম্মকে বন্ধন মনে ক'রে সে দূরে পালিয়ে থাকবে না। এ যুগের মানুষ হবে উৎকৃষ্ট কর্ম্মী; কর্ম্মই হবে তার সাধন, কর্ম্মই তার ভগবানকে পাবার উপায়। জগতের সমস্ত কর্ম্মধারার সঙ্গে তার জীবনের পূর্ণ যোগ থাকবে। তার যন্ত্রে আরূঢ় হ'য়ে, তার প্রকৃতির ভিতর দিয়ে শ্রীভগবান তাকে দিয়ে যে কর্ম্ম করাবেন, সজ্ঞানে, পরমানন্দে, যন্ত্রজ্ঞানে সে সেই কর্ম্ম ক'রে শ্রীভগবানের লীলা বিস্তার করবে।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয়

বুদ্ধদেব মানুষকে দিয়ে গেলেন এক মহা কর্ম্মপ্রেরণা; সৎকর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় করার আদর্শ। আচার্য্য শঙ্কর জোর দিলেন তত্ত্বজ্ঞানের উপর; তত্ত্বদর্শনে, তত্ত্বজ্ঞানে মানুষের মুক্তি। শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিয়ে গেলেন শুধু ভক্তির দিক, প্রেমের দিক, রসের দিক্। মানুষের জীবন যেন তিন ভাগে ভাগ করা। মানুষের সামনে তিনটি রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া হ'ল, মানুষ দুটিকে বাদ দিয়ে একটি ধ'রে চলবে। দয়ানন্দ ব'ললেন, না, মানুষের জীবন জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম এই

ত্রিধারাতে ছুটে যাবে সাগর সঙ্গমে। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে পেলে মানুষের সব পাওয়া হ'ল না। শুধু তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তাঁকে পেয়ে সে সন্তুষ্ট থাকবে না, সে নিখিলরসামৃত শ্রীভগবানকে পূর্ণরূপে উপভোগ ক'রবে। জ্ঞানের সঙ্গে সে রাখবে ভক্তিকে। মানুষের প্রাণ শুষ্কতা চায় না, সে চায় রস। সে ভগবানকে জানবে, সে ভগবানকে উপভোগ ক'রবে। তাতেই তার প্রাণের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হবে। জ্ঞানের সঙ্গে থাকবে ভক্তি, আবার ভক্তির সঙ্গে চাই জ্ঞান। মানুষ শুধু তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে পাবে না, সে শুধু ভক্তি রসেও ডুবে থাকবে না। সে লীলাময় শ্রীভগবানকে তাঁর অনন্ত লীলার ভিতর দিয়েও উপভোগ ক'রবে, তাঁর লীলার সহচর হ'য়ে জগতের সমস্ত কর্ম্ম প্রবাহের মধ্যে থেকে, ভগবান তাকে দিয়ে যে কর্ম্ম করান সেই কর্ম্ম ক'রবে। জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের ত্রিধারায় নিত্য স্নান ক'রে সে পরমানন্দ লাভ ক'রবে। দয়ানন্দ জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের সমন্বয় ক'রে জগতকে দিতে চাইলেন এই পরিপূর্ণ আনন্দ, এই পূর্ণ, অখণ্ড জীবন।

শুধু ভক্তির পথই ঠিক পথ নয়। শুধু ভক্তি পরিণত হ'য়ে যায় ভক্তিবিলাসে। মানুষ রস পেয়ে রসেই ডুবে যেতে চায়। সে ব'সে ব'সে প্রেমময় শ্রীভগবানকে উপভোগ ক'রতে চায়। কিন্তু তা হ'লে লীলার জগৎ চলে না। মানুষকে বহির্জগতে কর্ম্ম ক'রতে হবে। তার প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হ'য়ে কর্ম্মে অপারগ না হ'য়ে যায়, তাই ভক্তির সঙ্গে চাই শক্তি। মানুষকে হ'তে হবে ভক্ত অথচ বলিষ্ঠ-প্রাণ। ভক্তিতে তার প্রাণ ভেঙ্গে নুইয়ে প'ড়বে না, তার প্রাণকে রাখতে

হবে পূর্ণ কর্ম্মক্ষম ক'রে। প্রাণ তার ভক্তিতে পূর্ণ, অথচ সে জগতের সকল কর্ম্মই ক'রে যাবে। দয়ানন্দ এই শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব দূর ক'রে দিলেন। তাঁহার গৌরী-গৌরাঙ্গ আশ্রমে তিনি একাসনে শ্রীভগবানের প্রেমরূপ শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি এবং শক্তিরূপা দশভূজা দুর্গামূর্ত্তি স্থাপন ক'রলেন।

অন্বভ—তত্ত্ব

বৌদ্ধ সাধক কর্ম্মকে যে আসন দিলেন তাহা খুব উচ্চ নয়। ভগবানের স্থানে তাঁরা বসালেন নির্ব্বাণকে। ক্রমে বুদ্ধ এসে সে স্থান গ্রহণ ক'রলেন। তাঁদের মতে মানুষের কর্ম্ম এই নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পথে কণ্টক। তাঁরা ব'ললেন কণ্টক দিয়েই কণ্টক উদ্ধারের কথা, সৎকর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করার কথা। কর্ম্মকে সহজভাবে তাঁহারা গ্রহণ ক'রলেন না। কর্ম্মকে ক্ষয় ক'রে পরিশেষে কর্ম্মত্যাগই তাঁহাদের কাম্য। এই দিকেই তাঁহাদের মনের গতি।

শঙ্কর দেখালেন জ্ঞানের পথ। এই পথে বুদ্ধিকে, বিচারকে, যুক্তিকে সম্বল ক'রে মানুষ চ'লবে ভগবৎ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে। জ্ঞানই প্রধান, জ্ঞানই সব, জ্ঞানের দ্বারা সেই অবাঙ্‌মনসগোচরকে পাওয়াই পাওয়া। জ্ঞানের পথেই মুক্তি। অজ্ঞানীর ধর্ম্ম হয় না। জ্ঞানকেই তিনি সর্ব্বোচ্চ আসন দিলেন।

বৌদ্ধরা জ্ঞানকে সঙ্গে নিলেন। বুদ্ধের "বুদ্ধত্ব" জ্ঞানের উপর। ভক্তিকে মুখে বাদ দিলে ও তাঁরা কার্য্যতঃ দিতে পারলেন না। মানুষের হৃদয় জিনিষটা বাদ দেওয়া যায় না।

শঙ্করও শুধু তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে ব'সে থাকেন নাই। জ্ঞানমার্গে চ'লতে চ'লতে তিনি সময় সময় ভক্তিমার্গে প্রবেশ ক'রে দেবদেবীর আরাধনা করেছেন। মানুষের ভক্তির দিক কে উচ্ছেদ ক'রতে পারে? ভারতময় ভ্রমণ ক'রে, বহু বিচার যুক্তি তর্ক আলোচনা ক'রে তিনি বৌদ্ধ যুগের পর বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলেন। কর্ম্মকে নিকৃষ্ট আসন দিলেও তিনি কর্ম্মত্যাগ ক'রতে পারেন নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে যে প্রেম শিক্ষা দিয়ে গেলেন জগতে তাহার তুলনা নাই। কিন্তু এই যে প্রেমোন্মাদ, এই যে সদা অশ্রুপাত, বিলাপ, মূর্চ্ছা, এ সব নিছক প্রেমেরই বহির্বিকাশ। এর সঙ্গে জ্ঞানের এবং কর্ম্মের সামঞ্জস্য নাই। ভগবৎ-প্রেম যে কি বস্তু তাহা জীব শিখিল। কিন্তু প্রেমের দিকই মানুষের সবখানি নয়। জ্ঞানের দিক, কর্ম্মের দিকও তাহার রয়েছে। সংসারের জীবকে জ্ঞানও সঙ্গে রাখতে হবে, কর্ম্মও ক'রতে হবে। মহাপ্রভু প্রেমের পূর্ণ বিকাশ দেখালেন, কিন্তু পূর্ণ জীবন দেখালেন না, পূর্ণ আদর্শ জীবকে দিলেন না, যে আদর্শ লক্ষ্য ক'রে চ'লে সংসারের মানুষ জীবনকে পূর্ণ ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারে। কি ক'রে মানুষ জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের এবং উভয়ের সঙ্গে কর্ম্মের সামঞ্জস্য ক'রে চলবে তাহা বুদ্ধ বা শঙ্কর, এমন কি মহাপ্রভুও দেখালেন না। দেখাবার সময় হয় তো তখন আসে নাই।

সে যুগ এখন এসেছে। ঠাকুর দয়ানন্দ যে আদর্শ জগতের নরনারীর সামনে ধ'রেছেন তাহা হচ্চে জ্ঞান-প্রেম-কর্ম্মের পূর্ণ সামঞ্জস্যের আদর্শ। এই আদর্শ অনুসরণ ক'রে চ'ললে পূর্ণ

জীবন গ'ড়ে উঠবে। ভগবান শুধু জ্ঞানময় নন, তিনি প্রেমময়। তিনি শুধু প্রেমময় নন, তাঁহার অনন্ত সৃষ্টির মাঝে তিনি নিত্য ক্রিয়ারত। মানুষের লক্ষ্য তিনি, মানুষের আদর্শ তিনি। মানুষ তাঁহারই ভাবে, তাঁহারই অনুকরণ ক'রে তাঁহার পূজা ক'রবে। এই তত্ত্ব দয়ানন্দ ফুটিয়ে তুলেছেন নিম্নলিখিত তাঁহার "অমৃত" কবিতায়।

সই, অমৃতে—অমৃত এত।
অমৃত তৌলেতে, অমৃত মাপিয়া
বুঝি না অমৃত কত॥
অমৃত নিচয় মোর।
অমৃত-পুরেতে, বসতি আমার
অমৃত প্রাসাদে ঘর।
অমৃত চাদরে, বিছানা আমার
অমৃত পালঙ্কোপর॥
অমৃত ভোজন, অমৃতাচমন
অমৃতে শয়ন মোর।
অমৃত নেশায়, অমৃত নিশাতে
অমৃত স্বপন ঘোর॥
অমৃত স্বপনে, অমৃত প্রভাতে;
অমৃত বদন ভরি।
অমৃত আধারে, অমৃত লইয়া
মুখ প্রক্ষালন করি॥
অমৃত পেয়ালে অমৃত ভরিয়া
অমৃত সেবন করি।

অমৃত তারেতে, রাগিণী বাঁধিয়ে
অমৃতে অমৃত ধরি ॥
অমৃত লইয়া, অমৃত বাজারে
বিকাই অমৃত কত ।
অমৃত পাইয়া অমৃত দেখিয়া
অমৃত ভকত কত ॥
অমৃত বাতাসে অমৃত পরশে
অমৃতে শীতল হই ।
অমৃতে অমৃত, মিশিলে অমৃত,
যতনে রাখি গো সই ॥
অমৃত আমার, আমি অমৃতের
বুঝিয়া বুঝে না সই ।
শুনিয়া শুনে না, দেখিয়া দেখে না
তালাসে অমৃত কই ॥
দয়াতে অমৃত, আনন্দে অমৃত,
অমৃত সকলি মোর ।
অমৃত আঁখিতে চাহিয়া দেখনা
অমৃতে হইবে পূর ॥
অমৃত বলিয়া, অমৃত ভখিনু
অমৃতে হইনু ভোর ।
অমৃত সাধিয়া, অমৃত হরিয়া
অমৃত হইল চোর ॥

এখানে তিনি জীবকে ব'লছেন অমৃতরাজ্যের কথা, জ্ঞান যেখানে প্রেমের সঙ্গে কোলাকুলি ক'রেছে, কর্ম্ম যেখানে জ্ঞান

ও প্রেমের সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে অমৃতময় পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বৈষ্ণবসাধকরা ব'লেছেন প্রেমের চরম অবস্থা বিরহ। মহাপ্রভু সেই ভাবটাই জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন নিভৃতে, গম্ভীরার কক্ষে। গম্ভীরার বাহিরে কর্ম্ম-কোলাহলময় জগতে এ প্রেম ফুটে উঠতো কি না সন্দেহ। গম্ভীরার বাহিরে যে জীবনধারা চ'লছিল তার সঙ্গে এই প্রেম-সাধনার যোগ ছিল না। সাংসারিক জীবনে এই ভাবে প্রেমসাধনা করা সম্ভবপর নয়। গম্ভীরার বাহিরে জনসাধারণের জীবনে এই প্রেমসাধনা ফুটে উঠলো না। মহাপ্রভুর পথ ধ'রে তারা এই প্রেমসাধনা ক'রে এই প্রেম আস্বাদন ক'রতে পারলো না। এ প্রেম তো তাদের সাধ্য বস্তু নয়। মহাপ্রভু কর্ম্মময় জগতের জীবের কাছ থেকে এতদূরে চলে গেলেন যে, তারা তাঁকে অনুসরণ করতে পারলো না।

দয়ানন্দ দেখালেন প্রেমের সেই অবস্থা যেখানে সাধক পূর্ব্বরাগ হ'তে আরম্ভ ক'রে বিরহ পর্য্যন্ত পার হ'য়ে পরবর্ত্তী—অবস্থা অমৃতত্বে এসে পৌঁছেছে। এখানে মিলনের পর শুধু বিরহ নাই। বিরহের পর পরিপূর্ণ চিরমিলন আছে, প্রেমিককে পূর্ণভাবে উপভোগ আছে, তাঁহার সঙ্গে লীলা আছে, বৈচিত্র্য আছে, পরিবর্ত্তন আছে। এখানে প্রেমের সমস্ত অবস্থাই বর্ত্তমান, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান আছে, কর্ম্ম আছে। এ প্রেমসাধনা ক'রতে সাধককে কর্ম্মময় জগত থেকে দূরে চলে যেতে হবে না। এ প্রেমসাধনা সমস্ত জগৎ জুড়ে, জগতের সমস্ত নরনারীকে সঙ্গে নিয়ে, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী সকলকে সঙ্গে নিয়ে। সাধকের কাছে তখন সব অমৃতময়, তাঁর প্রেমিক অমৃত, তিনি নিজে

অমৃত, বিশ্বের সমস্ত বস্তু, সমস্ত প্রাণী অমৃত। সংসারের সমস্ত বলা, কহা, করা সবই আছে, সবই তাঁর কাছে অমৃত। তাঁর প্রাণে তখন বিরহের জ্বালা নাই, মিলনের পরিপূর্ণ শান্তি, পরিপূর্ণ আনন্দ, লীলার বৈচিত্র্য, আনন্দের নবীনতা আছে। তাঁর প্রাণে তখন কোথাও ফাঁক নাই, কোনও কিছুই তাঁর কাছে বিস্বাদ লাগে না, সবই তাঁর কাছে অমৃত। সংসারের কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে তিনি অমৃত আস্বাদন করেন। রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, কলা, শিক্ষা, দীক্ষা, খেলা-ধূলা সবই তাঁর কাছে অমৃত। তিনি সবেতেই আছেন, কোনটী তাঁর কাছে বাদ পড়ে না। সবেতেই তিনি অমৃত আস্বাদন করেন, সব নিয়েই তিনি অমৃতের সঙ্গে অমৃত-খেলা খেলেন। অমৃতে তখন তিনি ভ'রপুর। তখন তিনি একাধারে পূর্ণজ্ঞানী, আদর্শ প্রেমিক, উৎকৃষ্ট কর্ম্মী। তখন তিনি সমাজবদ্ধ জীবের অতি নিকটে, তাঁর জীবনের সঙ্গে সাংসারিক মানুষের জীবনের অনেকটা মিল আছে। সাংসারিক মানুষ তখন এমন এক আদর্শ পায় যাহা ধ'রে সে চলতে পারে। সাধক তখন সংসারে বিচরণ করেন, আর সংসারকে প্রতিনিয়ত ঊর্দ্ধলোকের দিকে আকর্ষণ করেন। *

দয়ানন্দ ধর্ম্মকে সরল, বর্ত্তমান যুগের মানুষের সহজসাধ্য ক'রে দিলেন। ধর্ম্ম মানুষের প্রাণের বস্তু, জ্বলন্ত জীবন্ত সত্য বস্তু। ধর্ম্ম বন্ধন নয়, মুক্তি। এ ধর্ম্ম মানুষ পালন করবে —দিন ক্ষণ পাঁজিপুঁথি দেখে নয়; জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে

* "নবযুগ ও অরুণাচল" বইতে এই অমৃততত্ত্ব বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ধর্ম্ম প্রকাশ পাবে—মানুষের চিন্তায়, বাক্যে, তাহার প্রত্যেক আচরণে, দৈনন্দিন প্রতি কার্য্যে, মানুষের সহিত মানুষের ব্যবহারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে।

দয়ানন্দ তাঁর ভক্তদিগকে যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে সুরু ক'রলেন তাহা অরণ্যের ধর্ম্ম নয়, তাহা লোক-সমাজের ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই আছে। এ ধর্ম্ম থেকে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি কিছুই বাদ যায় না। এতে সবই আছে, কিন্তু প্রত্যেকটিই ভগবৎ ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সবই ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে। শুধু বাদ দিয়ে নয়, বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতিক, অর্থনীতিক এবং সামাজিক বিধিব্যবস্থাগুলি প্রতিপদে শ্রীভগবানের পিতৃত্বকে অস্বীকার ক'রে, প্রতি পদে ধর্ম্মকে লঙ্ঘন ক'রে চলেছে। শ্রীভগবানের পিতৃত্ব এবং মহামানবের ভ্রাতৃত্বের ভিত্তির উপর দয়ানন্দ এক নূতন রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি গ'ড়ে তুলেছেন। তাঁর শিক্ষা জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই ধর্ম্মকার্য্য এই জ্ঞান প্রাণে সর্ব্বদা জাগরূক রাখা। প্রত্যেক কার্য্যের দ্বারাই মানুষ শ্রীভগবানের আরাধনা ক'রবে, প্রত্যেক কাজের ভিতর দিয়েই তাঁর সঙ্গে যোগ রক্ষা ক'রবে। এক মহাভাবে দয়ানন্দ তাঁর ভক্তদিগকে অনুপ্রাণিত ক'রলেন, বিরাট কল্পনা, বিরাট চিন্তা তাদের ভিতর জাগিয়ে তুল্লেন। এক বিপুল কর্ম্মপ্রেরণা, এক মহামুক্তির সন্ধান, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের আস্বাদন তাদের দিলেন।

ভগবান এক, ধর্ম্ম এক

দয়ানন্দ বললেন ভগবান এক, ধর্ম্মও এক। মানুষ দেশ

কাল পাত্রভেদে, মানুষের প্রকৃতি ভেদে, রুচিভেদে ভগবানকে পাবার জন্য বিভিন্ন সাধনপ্রণালী অবলম্বন করে করুক। কিন্তু মানুষ যদি প্রকৃতই ভগবানকে চায়, ভগবানকেই বড় ক'রে দেখে, তা হলে মত ও পথ ছোট হ'য়ে যায়। তখন মত ও পথ নিয়ে অপরের সঙ্গে তার বিবাদ করার প্রয়োজন হয় না। ভগবানের প্রতি তার দৃষ্টি গেলে, মতের ও পথের পার্থক্যের দিকে তার দৃষ্টি পড়ে না, প'ড়লেও তাহা সে বড় করে দেখে না। মানুষ তখন পরস্পরের সঙ্গে একটি বড় মিল খুঁজে পায়, ছোট জিনিষের অমিল তখন তার সংস্কারকে আঘাত করে না। এই মত ও পথ নিয়ে জগতে বহু অশান্তি এবং উপদ্রবের সৃষ্টি হ'য়েছে। এর কারণ মানুষ প্রকৃতভাবে ভগবানকে চায় নাই। এক ধর্ম্মের লোক অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে তার নিজের ধর্ম্মে আনতে চায়। এ তো ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা নয়, এ মানুষের আত্ম-প্রতিষ্ঠা। ধর্ম্মের নামে, ভগবানের নামে সে তার আমিত্বকেই অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চায়। মানুষের ভিতর যে প্রবল আমিত্ব রয়েছে ধর্ম্মকে উপলক্ষ্য ক'রে তাহাই আত্মপ্রকাশ ক'রছে। মানুষ তো গরু নয় যে তাকে এক গোয়াল থেকে আর এক গোয়ালে পুরতে হবে! এ তো ধর্ম্মহীনকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া নয়—এ তো ভগবানকে যে জানে না, চিনে না, তাকে ভগবানকে জানিয়ে দেওয়া, চিনিয়ে দেওয়া নয়। এক কোটি হিন্দু যদি মুসলমান বা খৃষ্টান হ'য়ে যায়, বা মুসলমান হিন্দু হ'য়ে যায়, তাতে জগতের কি যাবে আসবে? তাতে মানব-জাতির লাভ বা ক্ষতি কি? মানুষের জীবন তাতে কতখানি উন্নত হবে? মানুষের সুখ তাতে কতখানি বাড়বে? মানুষের

তাঁতে কি আনন্দ লাভ হবে? এ খেলা জগতে 'অনেক দিন ধ'রে অনেক ভাবে হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু একটী মানুষ ও যদি প্রকৃত ধার্ম্মিক হয়, তা'হলে সেই একটী মানুষের জীবনই সমস্ত মানবজাতির কাছে মহা মূল্যবান। সেই একটী মানুষের জীবন হ'তেই মানবজাতি পরম উপকৃত হবে। জগতের আজ প্রয়োজন বৈষম্যের উচ্ছেদ নয়, সমস্ত বৈষম্যের ভিতর একত্ব প্রতিষ্ঠা। আজ জগতের লোককে এই কথাটাই বুঝিয়ে দিতে হবে যে, হিন্দুও যাকে চায় মুসলমানও তাকেই চায়, খৃষ্টানও ভিন্ন পথে তাকেই খুঁজছে। আজ মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তাদের বৈষম্যটাই বড় নয়, তাদের এই এক বস্তুকে চাওয়াটাই বড়। এইখানে তাদের এক বড় মিলনের ক্ষেত্র রয়েছে। আজ জগতকে দেখিয়ে দিতে হবে কি ভাবে মানুষ সহজে ভগবানকে ধ'রতে পারে, কি ভাবে সহজে সে ভগবানের সঙ্গে যোগ স্থাপন ক'রতে পারে। আজ প্রয়োজন হ'য়েছে মানুষের হৃদয়-মনের সংস্কারের, ছোট ভাবকে দূর ক'রে তার প্রাণে বড় ভাবকে জাগ্রত ক'রে দেওয়ার। আজ জগতের প্রয়োজন হয়েছে খৃষ্টান ধর্ম্মের নয়, হিন্দু ধর্ম্মের নয়, মুসলমান ধর্ম্মের নয়। আজ জগতের প্রয়োজন হয়েছে ধর্ম্মের, সেই সত্য অনাবিল ধর্ম্মের, যিনি চরাচর সমস্ত বিশ্বলোককে ধারণ করে রয়েছেন। হিন্দু ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম জগতে থাকলেই বা কি? আর গেলেই বা কি? কিন্তু আজ মানুষের প্রাণে ধর্ম্ম না থাকায় জগৎ অশান্তি, নিরানন্দ, ভেদ, বিসম্বাদে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। আজ মানুষের প্রাণে ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা না হ'লে মনুষ্যজাতি এই অশান্তির অনলে দগ্ধ হ'য়ে

যাবে। তাই দয়ানন্দ চাইলেন জগতে ধর্ম্মস্থাপন করতে—হিন্দু-ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম নয়—সেই ধর্ম্ম, যে ধর্ম্মের প্রেরণায় মানুষ মানুষকে একই পিতার সন্তান জেনে ভালবাসবে শ্রদ্ধা করবে, এবং পরস্পরের সহযোগিতায় সমস্ত মানবজাতির সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ক'রবে।

মহামানবের ভ্রাতৃত্ব—জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদ

দয়ানন্দ তাঁর ভক্তদের প্রাণে এক মহা মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুল্লেন। তিনি বল্লেন, "আমি চোখে চোখে দেখিতেছি, একমাত্র উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্ম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনভূমি হইবে, সমগ্র জগতে অচিরেই এক মহাভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে; গঙ্গার তীরে তীরে, হিমালয়ের শিখরে শিখরে আবার ঋষিদের আশ্রম বসিবে, ঘরে ঘরে মহাপ্রভাবা নারীকুল জন্মিবেন, মানুষের মধ্যে আবার মহাশক্তি জাগ্রত হইবে।"

তিনি বল্লেন একমাত্র উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্মই হবে সেই মিলনের ভিত্তি। হিন্দুকে তার হিন্দু সাধনা ত্যাগ করিয়ে নয়, মুসলমানকে ইসলামের মহাভ্রাতৃত্ব থেকে চ্যুত ক'রে নয়, খৃষ্টানকে খৃষ্টের অমূল্য উপদেশ থেকে বঞ্চিত ক'রে নয়। বিভিন্ন ধর্ম্মের সাধন-ধারা ত্যাগ করার প্রয়োজন নাই। সকল ধর্ম্মসাধনার ভিতরেই যে বিরাট সত্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তাকেই

ফুটিয়ে তুলতে হবে। এই বিরাট সত্য শ্রীভগবানের পিতৃত্ব এবং মহামানবের ভ্রাতৃত্ব। সকল ধর্ম্মের বড় ধর্ম্ম শ্রীভগবানের পিতৃত্ব স্বীকার ক'রে, চিন্তা, বাক্য এবং কার্য্যে সেই সত্য ফুটিয়ে তোলা।

এত কাল হিন্দু সমাজ যাহাদিগকে নীচে ফেলে রেখেছিল, যাহারা বিশাল হিন্দু সমাজে হেয়, ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য হ'য়ে ছিল, তিনি তাহাদিগকেও তাঁহার বক্ষে স্থান দিলেন, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের সঙ্গে তাহাদিগকেও সমান অধিকার দিলেন। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতা, ছুৎমার্গ উঠিয়ে দিয়ে এক বিশাল একতায় সকলকে এক ক'রে দিলেন। তিনি বল্লেন, তোমরা ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র, ইহা পরের কথা, তার চেয়ে বড় কথা—তোমরা সকলে এক পিতার সন্তান, তোমরা ভাই ভাই। তিনি ধীরে ধীরে তাদের প্রাণ থেকে বর্ণগত এবং জাতিগত বৈষম্য মুছে দিলেন। তিনি মুসলমানকেও দীক্ষা দিয়ে, "আনন্দ" উপাধি দিয়ে আশ্রম-নাম দিলেন। মুসলমানকে শুদ্ধির দ্বারা হিন্দু ক'রে নয়, মুসলমানকে মুসলমান রেখে। তিনি মুসলমান অনুরাগীর প্রাণ-মনের সংস্কার ক'রে তাকে ভগবদ্ভক্ত ক'রে তুল্লেন। ব্রাহ্ম ভক্তকে তিনি বহু সম্মান সহকারে গ্রহণ ক'রলেন, ইহুদী ভক্তকে তিনি আলিঙ্গন দিলেন। তাঁর উদারতা, তাঁর সার্ব্বজনীনতা ভক্তদের প্রাণে এক নূতন সমন্বয়ের বাণী এনে দিল।

সঙ্কীর্ত্তন

ব্যক্তিগত ও সমবেত সাধন

দয়ানন্দ তাঁহার ভক্তদের সাধনপ্রণালী দিলেন,—ব্যক্তিগতভাবে

নামজপ; সমবেতভাবে সঙ্কীর্ত্তন,—সহজ, সরল, সর্ব্বজনসাধ্য। আসন দিলেন—সুখাসন। চুরাশি কিংবা ততোধিক প্রকারের আসনের মধ্যে যে আসনে তুমি সহজ সরল ভাবে স্থির হয়ে বেশীক্ষণ ব'সে থাকতে পারবে, তাহাই তোমার আসন। প্রাণায়াম দিলেন —সহজ, সরল, স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস। চেষ্টা ক'রে রেচক পূরক কুম্ভকের প্রয়োজন নাই। এই ভাবে আপনা হতেই বিভিন্ন প্রকার প্রাণায়ামের ক্রিয়া আসবে।

অতীত যুগের পুরাতন সাধনপ্রণালী এ যুগের মানুষের ঠিক উপযোগী নয়। এ যুগে মানুষের শরীর-মনের, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার, তার জীবনযাত্রার বহু পরিবর্ত্তন হয়েছে। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার সাধনপ্রণালীরও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

এ যুগে মানুষের জীবনযাত্রা পূর্ব্বের মত সহজ, সরল, সাদাসিধা নয়। অতীতে, মানুষ ধর্ম্মসাধনে জীবনের অনেকখানি দিতে পারতো। এ যুগে অন্নবস্ত্রসমস্যা প্রবল,—অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য মানুষের জীবনের প্রায় সবখানি দখল ক'রে বসেছে। এ যুগের মানুষের জীবনে ধর্ম্মের স্থান খুব অল্প, নাই বললেই হয়। ধর্ম্ম এ যুগে কোণঠেসা। এ যুগের মানুষ স্থূলজগতকেই সব মনে করে। অর্থই তাহার কাম্য। যাহা প্রত্যক্ষ নয়, তার মূল্য তার কাছে কম। অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা, বাণিজ্য—এ সবে মন দিলে তার লাভ আছে। ধর্ম্মকে সে সহজেই ফাঁকি দিতে পারে। যে লোকসান তার চোখে পড়ে না, তার জন্য সে ব্যস্ত নয়।

এ যুগ কর্ম্মের যুগ, এ যুগের মানুষকে বহু কর্ম্ম করতে হয়,

বহু দিকে মন দিতে হয়। অধিকদিন ধ'রে দীর্ঘপ্রণালীতে সাধন করা এ যুগের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সে ধৈর্য্যও তাহার নাই। এ যুগে মানুষ ক্ষুদ্র পরিসর স্থানে আবদ্ধ নয়। বিজ্ঞান আজ দূরকে নিকট ক'রে দিয়েছে। পৃথিবীর সব দেশগুলি আজ একদেশে পরিণত হয়েছে, মানবজাতি এক পরিবার হয়ে গিয়েছে। মানুষের কর্ম্মক্ষেত্রও দেশের সীমা ছাড়িয়ে পৃথিবীময় বিস্তৃত হয়েছে। মানুষকে আজ দেশ বিদেশে ভ্রমণ ক'রে বেড়াতে হয়। বিভিন্ন ভাবের বিভিন্ন ধর্ম্মের নরনারীর পরস্পর দেখাশুনা, মেলামেশা হচ্ছে।

এ যুগের মানুষের জীবনযাত্রা কঠিন হয়েছে, তার ভাবনা চিন্তা অত্যন্ত বেশী হয়েছে। বহু ঘাত-প্রতিঘাত তার উপর এসে পড়ছে। এ যুগে মানুষের জীবনধারণের বস্তু ব্যক্তিগত লাভের পণ্যে পরিণত হয়েছে। বিশুদ্ধ আহার মানুষ পায় না। এ যুগে মানুষের দেহ ক্ষীণ, স্বাস্থ্য ক্ষণভঙ্গুর, পরমায়ু অল্প।

সর্ব্বোপরি, এ যুগের মানুষের হৃদয়মনের পরিবর্ত্তন হয়েছে। পার্থিব বস্তুর জ্ঞান মানুষ বহু পরিমাণে আয়ত্ত করেছে। তার মনের পরিসর বিস্তৃত হয়েছে, মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে, তার মন সর্ব্বতোমুখী, তীক্ষ্ণ, বিচারশীল হয়েছে। এ যুগে শিক্ষার বহু বিস্তার হয়েছে, জ্ঞান বহু মানবের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছে। জনসাধারণের চিন্তা করবার, বোঝবার শক্তি জন্মেছে। সমস্ত মানবজাতির মনের উৎকর্ষ হয়েছে, আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সাধনপ্রণালীরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এ যুগের সাধনপ্রণালী কঠিন, আড়ম্বর-

পূর্ণ হ'লে চলবে না। এ যুগে মানুষের সাধনাকে সহজ, সরল, অনায়াসসাধ্য ক'রে দিতে হবে। এ যুগের সাধন প্রণালী মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাওয়া চাই, যাতে জীবনের সমস্ত কর্ম্মের সঙ্গে সাধনও চলতে পারে, কোনও কর্ম্ম বাদ না পড়ে, সাধনও বাদ না যায়। এ যুগের সাধন-প্রণালী এমন হওয়া চাই যাতে মানুষ অতি অল্প সময়েই পরিবর্ত্তন বুঝতে পারে। এ যুগের সাধনপ্রণালী সার্ব্বজনীন হওয়া চাই, যাতে যে কোনও ধর্ম্মের লোক, ইচ্ছা করলে, এই প্রণালী ধ'রে চলে ধর্ম্মলাভ করতে পারে। অতীত যুগে ধর্ম্ম ছিল আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম, নিয়মনিষ্ঠা, কঠোরতার ধর্ম্ম। সাধারণ লোকের তাতে অধিকার ছিল না। ধর্ম্ম উচ্চশ্রেণীর ভিতর আবদ্ধ ছিল। সাধারণ লোকের ধর্ম্মশিক্ষা হত উচ্চশ্রেণীর লোকেদের দেখে শুনে, অনুকরণ ক'রে। তাদের স্থান ছিল নীচে, সমাজ-জীবনের উপর তাদের কোনও প্রভাব ছিল না, উচ্চ শ্রেণীর প্রভাবই তাদের উপর এসে পড়তো। তাদের জীবনের মূল্য বড় ছিল না। তাদের ধর্ম্মজীবন গ'ড়ে তোলবার জন্য সমাজ মোটেই ব্যস্ত ছিল না। সাধনভজনে তাদের অধিকার ছিল না। তাদের জীবন ফুটে উঠতে পে'ত না, তাদের শক্তির বিকাশ হ'ত না, তারা ছিল পঙ্গু হয়ে। সমাজের চিন্তাধারা, ভাবধারা, কর্ম্মধারাতে তাদের দেবার কিছু ছিল না। তার জন্য সমাজই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

এ যুগ জনসাধারণের উত্থানের (mass elevation) যুগ। এ যুগের মানব সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির (social unit) শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, চরম উৎকর্ষ সাধন

করতে হবে। প্রত্যেক জীবনকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে। প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের পথ মুক্ত ক'রে দিতে হবে। এ যুগের সাধনপ্রণালীও এমন সহজ ক'রে দিতে হবে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই সাধন করতে পারে। এ যুগে সমস্ত মানবজাতির ধর্ম্মজীবন লাভের পথ সুগম ক'রে দিতে হবে।

এ যুগের মানুষ সাধন আরম্ভ করবে বাহির থেকে নয়, ভিতর থেকে,—অন্নশুদ্ধি থেকে নয়, স্থানাস্থান, কালাকাল বিচার ক'রে নয়। এ যুগের মানুষের মনকে বলিষ্ঠ ক'রতে হবে। সে সাধন আরম্ভ করবে মন থেকে, মনকে নিয়ে। বাহিরের কোনও উপকরণ তার প্রয়োজন নাই। কোনও আচার, কোনও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আবশ্যক নাই। এ সাধনায় তার একমাত্র অনুষ্ঠান 'মনন'। সে মনকে ছুটিয়ে দেবে ভগবানের দিকে, অনুক্ষণ স্মরণ করবে ভগবানকে। সকল কাজের ভিতর তার মন তাঁহারই সঙ্গ করবে। মানুষের মন বড় চঞ্চল, সে সহজে বশ মানতে চায় না। তাকে বশ করবার সহজ এবং উৎকৃষ্ট পন্থা নামজপ। মানুষ যখন তখন, যে কোনও অবস্থায় তাহা করতে পারে, আহারে, বিহারে, শয়নে, সমস্ত কাজের ভিতর। ইহার সময় অসময় নাই, শুচিতা অশুচিতা নাই। নাম-নামী অভেদ। নাম নামীরই স্বরূপ, নামীরই ছবি। প্রতি নামে নামীর সঙ্গেই যোগ হয়। শ্রীভগবানের কৃপায় মানুষের প্রাণে সাধনের ইচ্ছা জাগলে, ভগবানের যে কোনও নাম তার ভাল লাগে, সে সজ্ঞানে জপ করতে পারে। ক্রমে এই সাধন তার সহজ হয়ে যায়। তার প্রাণের ময়লা ধুয়ে গেলে সে দেখতে পায় শ্রীভগবানের সঙ্গে তার নিত্যযোগ রয়েছে, সর্ব্বকার্য্যে,

সর্ব্বাবস্থায়, অন্তঃসলিলা ফল্গুর স্রোতের ন্যায়, তার প্রাণের ভিতর দিয়ে এক ভাগবত স্রোত বয়ে যাচ্চে।

সাধনার সকাম নিষ্কাম আছে। মানুষের কামনা আছে। এই কামনা সে ছাড়তে পারে না, ছাড়ার প্রয়োজনও নাই। সে কিছু চায়। এই চাওয়া তার ভিতর থেকে আসে। শুধু যে বাহিরের সুখসুবিধা আরাম সে চায়, তাহা নয়, সে প্রাণের সুখ চায়, শান্তি চায়, আনন্দ চায়, সে শক্তিও চায়। এই চাওয়া কোনও দোষের নয়। ইহা খুব শুভ লক্ষণ। এই চাওয়া থেকেই তার আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাত হয়। প্রথমে সে নিজের জন্য চায়। সাধন জীবনে যত সে অগ্রসর হয়, তত সে দশজনের জন্য, দেশের জন্য, মানবজাতির জন্য চায়। যে মুহূর্ত্ত হতে সে ছোট জিনিষ ছেড়ে বড় জিনিষের কামনা ক'রল সেই মুহূর্ত্ত হতেই তার ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ। মানুষের মনের জড় অবস্থাই ভয়ের কারণ। এই সকাম সাধনাই নিষ্কাম সাধনার ভিত্তি, একতলার উপরই দোতালা উঠে। ক্রমে শ্রীভগবান কৃপা ক'রে তার সর্ব্বল আকাঙ্ক্ষার স্থান নিজে গ্রহণ করেন। সাধক তখন একমাত্র তাঁকেই চায়। সাধক যখন শ্রীভগবানের চরণে নিঃশেষে আত্মনিবেদন ক'রে দেয় তখন শ্রীভগবান স্বয়ং তার সকল ভার গ্রহণ করেন, তখন তাকে যন্ত্র ক'রে তিনিই কাজ করেন। সাধক তখন শক্তি চায় না, কিন্তু শক্তি তখন তার পিছে পিছে ফিরে, তারই আধার দিয়ে শক্তি প্রকাশ হতে চায়। সুখকেও সে চায় না, কিন্তু সুখ তখন তাহাতেই অবস্থান করে। জ্ঞানে তার লোভ থাকে না, কিন্তু জ্ঞান তার ভিতর দিয়েই ফুটে বাহির হতে চায়। সাধক তখন

সমস্ত কর্ম্মই করে, কিন্তু ক'রেও করে না। শ্বাস প্রশ্বাসের মত সহজভাবে প্রত্যেক কার্য্যই তাকে অবলম্বন ক'রে হয়ে যায়। সে তখন কিছুতেই আবদ্ধ নয়, কিছুতেই আসক্ত নয়, সে যন্ত্রমাত্র, সে তখন সাক্ষী, দ্রষ্টা মাত্র, লীলাময়ের লীলার সঙ্গী। সে তখন অনন্ত শক্তির আধার, অনন্ত জ্ঞানের আধার, সে তখন মহাবলে বলীয়ান্, জগতে অপরাজেয়।

আজ দেশের তরুণদের ভিতর কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। তারা দেশের সেবা করতে চায়। পুরাতনকে তারা ভেঙ্গে ফেলতে চায়। দেশের রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সমস্তই তারা নূতন ক'রে গড়'তে চায়। এই আকাঙ্ক্ষা তাদের ভিতর এল কি ক'রে? শ্রীভগবান ইচ্ছা করেছেন ভারতে এক দেবজাতির সৃষ্টি। তাই তরুণদের প্রাণে এই কামনা জেগেছে।

তরুণ আজ নূতন সৃষ্টির জন্য পাগল হয়েছে। কিন্তু সৃষ্টি কি শুধু ইচ্ছা থাকলেই হয়? সে জ্ঞান চাই, সে শক্তি চাই। কোথায় তোমার সে জ্ঞান? কোথায় তোমার সে শক্তি? অন্ধ তুমি, কি ক'রে জাতিকে চালিত কর'বে? শক্তিহীন তুমি নিজে, কি ক'রে জাতির জীবনে তুমি শক্তিসঞ্চার করবে? শুধু বক্তৃতার জোরে, বাহিরের উত্তেজনায়, হৈ হৈ ক'রে, হুজুগ ক'রে জাতির প্রাণ জাগবে? এ সব চেষ্টা অনেক হয়েছে কিন্তু তবুও জাতির প্রাণ জাগে নাই। সহস্র সহস্র লোক জেলে যাও, শত শত লোক অনশনে প্রাণত্যাগ কর, কিন্তু এ সব বাহিরের উত্তেজনায় জাতির প্রাণ জাগবে না। জাতির প্রাণকে জাগাবার পথই এ নয়।

আজ যে জাতির প্রয়োজন বিরাট পরিবর্ত্তনের, আমুল সংস্কারের। ভারতে আজ নূতন জাতি, নূতন ধর্ম্ম, নূতন কর্ম্ম, নূতন রাষ্ট্র, নূতন অর্থনীতি, নূতন সমাজ, সবই নূতন গঠন করতে হবে। আজ জাতির জীবনটাই একেবারে বদলে দিতে হবে। এত বড় সংস্কার একজন, দুজন, শতজনের দ্বারা, শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা হতে পারে না। এ কাজে দেশের আবাল-বৃদ্ধ, স্ত্রীপুরুষ, ইতর ভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই প্রয়োজন। এ কার্য্যে সমস্ত জাতির আত্মনিয়োগ চাই। এত বড় সংস্কার বাহির থেকে কেহ ক'রে দিতে পারবে না। এ সংস্কার হওয়া চাই জাতির প্রাণের ভিতর থেকে। জাতির সমস্ত নরনারীর প্রাণের ভিতর থেকে এই নূতন রাষ্ট্র, নূতন অর্থনীতিক সমাজ, নূতন কর্ম্ম ফুটে বাহির হবে। আজ সর্ব্বাগ্রে চাই জাতির প্রাণকে জাগ্রত করা, জাতির প্রাণশক্তিকে মুক্ত ক'রে দেওয়া।

এই প্রাণশক্তি আহরণ করতে হবে সমস্ত শক্তির যিনি উৎস সেই শ্রীভগবানের নিকট হ'তে। এখন তুমি যে শক্তিতে কাজ কর'ছ তাহাও তোমার নয়। তাহাও শ্রীভগবানের কাছ থেকে আসছে। কিন্তু তোমার আমিত্ব এত প্রবল, তুমি ভগবানকে দেখছ না, তুমি তোমাকেই দেখছ, তুমি ভগবানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছ; তোমার অশুদ্ধ আধারে এ শক্তি দাঁড়াচ্চে না, শক্তি তোমার কাছ থেকে ফিরে যাচ্চে। শক্তির এক কণা মাত্র তুমি পেয়েছ। ভগবানের দিকে মুখ ফিরালে, তাঁকে চাইলে, তাঁর কাছে তোমার আমিত্বকে সঁপে দিলে, তাঁর কাছে শক্তি চাইলে তুমি অনন্ত শক্তি পেতে

পার। তোমার শক্তি আজ ব্যর্থ হয়ে যাচ্চে, কেন না, তোমার লক্ষ্য স্থির হয় নাই। এখন তুমি শক্তি ব্যয় ক'রছ শ্রীভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য নয়, তোমার নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য। এখন তুমি চলেছ অন্ধ হয়ে। পদে পদে তুমি ভেঙ্গে পড়'ছ—আজ তুমি এক কথা বল, কাল আর এক কথা বল। আজ তুমি ঠিক বলে যে পথ গ্রহণ করেছ, কাল তাহা পরিত্যাগ ক'রে অন্যপথে চ'লছ। সময় স্রোতে তুমি ভেসে ভেসে চ'লছ। দৃঢ়পদে দাঁড়াতে পার এমন ভিত্তি তুমি পাও নাই। তুমি বারে বারে বাতি জ্বাল'ছ, আর বাতি নিভে যাচ্চে। তোমার প্রাণের বাতি জ্বলে নাই। তোমাকে অনুসরণ ক'রে দেশ ব্যর্থতার দুঃখভোগ করছে।

জাতির উত্থান-পতন, এ কি নেতাদের হাতে? না, এর ভিতর আর একজনের হাত আছে? জাতির ভাঙ্গা-গড়া এ কি নেতাদের ইচ্ছামত হ'তে পারে? আর একজনের হাত যদি এর ভিতর থাকে, তা'হলে আজ সমস্ত জাতিকে সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই শরণাপন্ন হ'তে হবে। আর এক জনের ইচ্ছাতেই যদি জাতির জীবনমরণ, জাতির উত্থান-পতন, তা'হলে সেই ইচ্ছাটী কি তাহা ভাল ক'রে জেনে সেই ইচ্ছানুযায়ী চললে তবেই না জাতির সাধনা সার্থক হবে? সেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে চললে দেশ পদে পদে ব্যর্থ হবে। সেই ইচ্ছার সঙ্গে নিজেদের ইচ্ছা যোগ ক'রে দিয়ে জাতির জীবন গ'ড়ে তুলতে হবে। তা'হলেই জাতির নরনারীর ভিতরে ভগবৎ-শক্তি অবতরণ ক'রে জাতিকে পরম সার্থকতার দিকে নিয়ে যাবে।

আজ জাতির প্রাণকে নাচিয়ে তুলতে হবে, তাদের হৃদয়

মন গলিয়ে দিতে হবে, ভাবের তরঙ্গে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জাতিগঠন, নূতনসৃষ্টি কি ক'রে হয়? সৃষ্টির গোড়ায় আছে আনন্দ। আনন্দ না থাকলে সৃষ্টি হয় না। আনন্দের চাঞ্চল্যই নূতন নূতন সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পায়। আনন্দস্বরূপ ভগবান জগৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁর আনন্দের চাঞ্চল্যে। আজ যদি সম্পূর্ণ এক নূতন জাতি গঠন করতে হয় তা'হলে জাতির নিরানন্দ দূর ক'রে দিয়ে সমস্ত জাতিকে আনন্দে মাতিয়ে তুলতে হবে। এই আনন্দ বাহিরের জিনিষ নয়। আনন্দের একমাত্র উৎস শ্রীভগবান। জাতিকে আনন্দ আহরণ করতে হবে শ্রীভগবানের নিকট হ'তে।

আজ সর্ব্বাগ্রে জাতিকে শ্রীভগবানের চরণে শরণ নিতে হবে। এ যুগ শুধু ব্যক্তিগত সাধনার যুগ নয়। এ যুগ সমবেত সাধনার যুগ। এ যুগে শুধু দুজন, দশজন, শতজন সহস্রজন ভগবানকে লাভ ক'রে ধন্য হবে না। এ যুগে দেশের সমস্ত নরনারীর জীবন ভাগবত জীবন ক'রে তুলতে হবে। এ যুগে এমনই এক সাধনার প্রবর্ত্তন করতে হবে যাতে একই সঙ্গে শত শত, সহস্র সহস্র লোকের সাধন বিনা আয়াসে হয়ে যায়। যাতে জাতির সমস্ত নরনারী, আবালবৃদ্ধ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যায়, তাদের ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, তাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়, তারা বড় জিনিষের আস্বাদ পায়, বড় জিনিষের ক্ষুধা তাদের প্রাণে জাগে। এ যুগে এমনই এক সাধনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করতে হবে যাতে মানুষের প্রাণে প্রেমের উদয় হয়, যাতে মানুষ পরস্পরের বড় দিক, ভাল দিক দেখতে পায় ও দেখতে চায়, যাতে জাতির সমস্ত

নরনারী প্রাণে প্রাণে মিলে যায়, একই ভাবে, একই চিন্তায় উদ্বোধিত হয়ে উঠে। সে সাধনপ্রণালী সঙ্কীর্ত্তন।

সংকীর্ত্তনে একজনের ভাবভক্তি সহজেই অন্যে সংক্রামিত হয়। যারা কীর্ত্তন করে তাদের কাজ হয়, যারা দেখে, যারা শুনে, যারা নিকটে থাকে, যারা দূরে থাকে, এমন কি যারা সংকীর্ত্তনের বিরোধী, ইহার রস গ্রহণে অক্ষম, তাদের পর্য্যন্ত কাজ হয়। যেখানে সংকীর্ত্তন হয়, সেখানে ইচ্ছায় হ'ক, অনিচ্ছায় হ'ক, সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়ে হ'ক, যোগ না দিয়ে হ'ক, সকলেরই অল্পাধিক সাধন হয়ে যায়। দশজনের সাধনে শতজনের সাধন হয়ে যায়। শতজনের আনন্দ সহস্রজনের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। মৃতদেহে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করবার একমাত্র উপায় সঙ্কীর্ত্তন। পতিত জাতির উদ্ধারের একমাত্র উপায় সঙ্কীর্ত্তন। মানুষের হৃদয়মনের সংস্কার ক'রে তাদের প্রাণের সকল অভাব দূর ক'রে, তাদের প্রাণকে আনন্দে ভরিয়ে দেবার একমাত্র উপায় সঙ্কীর্ত্তন। সঙ্কীর্ত্তন জগতে এক দেবজাতির সৃষ্টি করবে, হিংসাবিদ্বেষ অপ্রেম জগৎ হতে নির্ব্বাসিত ক'রে দিবে। সঙ্কীর্ত্তন পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করবে।

৪০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নবযুগের এই সাধনার বীজ বপন ক'রে গিয়েছেন। এতদিন ইহা বৈষ্ণব সমাজে এবং সাধারণ লোক সমাজে আবদ্ধ ছিল। শিক্ষিত লোকেরা ইহাতে যোগ দিত না। আজ মহামিলনের দিনে দয়ানন্দ তাঁর শিক্ষিত ভক্তমণ্ডলীকে সংকীর্ত্তনে দীক্ষিত করলেন। অরুণাচলে সংকীর্ত্তনের প্রবল স্রোত বহিল। আশ্রমের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বহু স্থান হ'তে লোক সমাগম হয়েছিল। সমাগত দর্শকদের একজন

২৫শে চৈত্রের "বসুমতী"তে (১৩১৭) একটি বিবরণী প্রকাশ করেন। তিনি লিখেছিলেন :—

"...কি দেখিলাম ? দেখিলাম জলে যেমন তরঙ্গ উঠে, তেমনি কীর্ত্তনে ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছে। শ্রীচৈতন্যের সংকীর্ত্তনে এরূপ তরঙ্গ উঠিত শুনিয়াছি, তবে ইহা একটা কথার কথা বলিয়া ধরিতাম কবির অতিরঞ্জিত বর্ণনা বলিয়া বুঝিতাম। এখন আমার সে ভ্রান্তি গিয়াছে। ভাবের তরঙ্গ আমি অনুভব করিয়াছি।...দেখিলাম শত শত লোকের ভাবাবেশে ধূলায় গড়াগড়ি, আনন্দে নৃত্য, অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি ভাবের বিকাশ।...আর দেখিলাম ভক্তবৃন্দের আনন্দ-নৃত্য। কীর্ত্তনের উচ্চরোল গগন মণ্ডল কম্পিত করিয়া তুলিল। তরুলতা ফুল ফলও যেন "প্রাণগৌর নিত্যানন্দ" বলিতে বলিতে অবিরল প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া নিত্যানন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।...আহা কি চমৎকার দৃশ্য ! সহসা দেখিলে মনে হয়ে যেন এক দল মাতাল তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, উন্মাদের মত এদিকে ওদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, ভাবে গড়াগড়ি দিতেছে, তাহাদের পদভরে মেদিনী যেন কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। "এস হে প্রাণের গৌর, প্রেমানন্দে হয়ে বিভোর, মাতাও জগতজনে নাম-কীর্ত্তনে" বলিতে বলিতে কেহ বা মাতিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে বেশ মনে হইল—

"আমার গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
নামেতে পাষণ্ড দলন, ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়॥"

আশ্রমবাসী বা দর্শক, প্রত্যেকেই নাম-কীর্ত্তনে বা শ্রবণে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছে।...আজ আবার বহুদিনের কথা মনে পড়িল :—

"শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।"..."

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ্বমিলনী স্কীম

দেশে তখন জাতীয়তার প্রবল বন্যা এসেছে। বাঙ্গালীর প্রাণ সে দিন দেশাত্মবোধে ভ'রে উঠেছে। স্বদেশ সেদিন বাঙ্গালীর কাছে স্বর্গ, "আমার দেশ" সেদিন বাঙালীর সাধনা। দয়ানন্দ তাঁহার ভক্তদের এই জাতীয় ভাবকে ফিরাইলেন বিশ্বমানবতার দিকে। তিনি তাদের প্রাণকে দেশের সীমার ভিতরে আবদ্ধ ক'রে রাখতে চাইলেন না। তিনি তাদের শিখাইলেন সেই পুরাতন মন্ত্র :—

মাতা চ পার্ব্বতী গৌরী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ
ভ্রাতরো মানবাঃ সর্ব্বে স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।

ইহাই হ'ল ভারতের সনাতন সাধনার ধারা। ভারতের সাধক চিরদিন তার প্রাণকে ছুটিয়ে দিয়েছে অসীমের দিকে। সীমাকে সে কোন ও দিন বড় ক'রে, সত্য ব'লে স্বীকার করে নাই। যে ক্ষুদ্র পরিসর স্থানে তাহার বাস সেই বাসস্থানের চতুঃসীমাকেই সে তার প্রাণের সীমা ব'লে গ্রহণ করে নাই। ভারতের সাধক যে দেবীর আরাধনা করেছে তিনি 'দেশ-জননী' নন, তিনি 'জগজ্জননী', 'জগন্মাতা', তিনি 'জগদ্ধাত্রী'। ভারতের সাধক তার প্রাণকে কোনও দিন খাঁচার পাখী ক'রে রেখে তৃপ্তিলাভ ক'রতে চায় নাই। তার প্রাণ চিরদিন চেয়েছে

বিশ্বাত্মা ভগবানের সঙ্গে এক হতে। "ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি" ইহাই তাহার মূলমন্ত্র। বিশ্বকেই তার প্রাণ আঁকড়ে ধরেছে। বিশ্বই তাহার স্বদেশ, বিশ্বই তাহার সাধনা, বিশ্বের সমস্ত নরনারীই তাহার ভাই বোন।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ কোন পথে চলেছে? কোন্ ভাব সাধনা সে করছে? মানুষ যখন বন্য পশুর সঙ্গে বনে বনে বিচরণ করত তখন তার দেহকেই আপনার মনে করত। ক্রমে আত্মবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে পরিবারকে, আত্মীয়স্বজনকে, গ্রামকে, পরে দেশকে আপনার বলতে শিখেছে। ছোট ভাব থেকে ক্রমে সে বড় ভাবে এসেছে। সৃষ্টির আদি কাল থেকে সে এই ভাবসাধনা করছে, সীমা থেকে তার প্রাণ অসীমের দিকে চলেছে। তার প্রাণের পরিধি বৃহৎ হতে বৃহত্তর হচ্ছে।

আজ কি তাহার সাধনা এইখানেই শেষ হয়ে যাবে? অসীমের যাত্রী সে, আজ মধ্য পথেই তার গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে? দেশের সীমার ভিতরেই সে তার প্রাণকে হারিয়ে ফেলবে? তার যে এখনও অনেক পথ যাবার বাকী রয়েছে। যে নদী চলেছে সাগরসঙ্গমে দেশের মরুভূমির ভিতরেই তাহা শুষ্ক হয়ে যাবে? তাকে যে পূর্ণ আত্মোপলব্ধি করতে হবে। আজ সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাবে? দেশাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়েই তার প্রাণ তৃপ্ত হবে? তা কিছুতেই হতে পারে না। বিশ্বাত্মা ভগবানই তাহার লক্ষ্য। তাঁহারই সঙ্গে তার প্রাণ মিলিত হবে। দেশের বাহিরেও যে তিনি রয়েছেন। বিশ্বের নরনারীর রূপ ধ'রে তাহার দেবতা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তার প্রাণ আজ ছুটে গিয়ে তাঁহারই চরণে লুণ্ঠিত হবে। তারা যে তাহারই ভাই বোন।

সকলকেই সে হৃদয়ে গ্রহণ করবে। তার প্রাণ আজ তৃষ্ণার্ত্ত হয়েছে, সপ্তসিন্ধু পান না ক'রে তার প্রাণ তৃপ্ত হবে না। তার প্রাণ আজ ক্ষুধার্ত্ত। সমস্ত বিশ্বকে গ্রাস না ক'রে তার ক্ষুধা মিটবে না।

দয়ানন্দ তাঁহার ভক্তদের প্রাণে এই বিশ্বাত্মবোধের উন্মেষ করলেন। তিনি শিখাইলেন তাদের সমস্ত বিশ্বের মাঝে দাঁড়িয়ে, বিশ্বের সঙ্গে নিজকে এক ক'রে দেখতে—তিনি শিখাইলেন তাদের আপনাকে সত্যরূপে, পূর্ণরূপে পেতে। অরুণাচলের সেবিকা, বাঙালীর ঘরের এক নিরক্ষরা বধূ বিশ্বের জন্য কাঁদিলেন। বিশ্বের নরনারীর প্রাণের বেদনা তাঁর প্রাণে এসে বেজেছিল। সাতদিন তিনি অনবরত কেঁদেছিলেন আর প্রার্থনা করেছিলেন। ঠাকুর তাঁর নাম দিলেন "বিশ্বরমা"। জগৎসীর দোলগোবিন্দ আশ্রমে পুলিশ এসে নাম মহাযজ্ঞ ভেঙ্গে দিল, গুলি চালিয়ে ভক্তদের আহত করল। সে দিন ঋষি যুগানন্দ মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে ঠাকুরের পায়ে বুকের রক্ত দিয়ে এই প্রার্থনা করলেন, "এবার বিশ্বের ধূলিকণা পর্য্যন্ত যেন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ করে"। দয়ানন্দের অনন্ত প্রেমের এক এক কণা পেয়ে ভক্তরা ধন্য হয়ে গেল।

সমস্ত মানব জাতি একটী যৌথ-পরিবার

দেশে যখন "স্বদেশীর" হাওয়া প্রবল বেগে বইতে আরম্ভ করেছে, নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা চলেছে, যখন ভারতকে শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্যে দ্বিতীয় জাপান বা ইংলণ্ড বা ফ্রান্স গ'ড়ে তোলবার কল্পনা দেশ প্রেমিকদের

প্রাণে জেগে উঠেছে, দয়ানন্দ তখন তাতেও সায় দিলেন না।
তিনি ভক্তদের বল্লেন, "শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়ে দেশে অজস্র ধনাগম হউক, গ্রামে গ্রামে শিক্ষার বন্দোবস্ত হউক, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অকাতরে অর্থব্যয় কর, কিন্তু সমাজের উন্নতি হইতেছে কিছুতেই তাহা প্রমাণ হইবে না। **সমাজের দশজনের সুখের মাত্রা বাড়িতেছে কি না, প্রত্যেক কার্য্যের সফলতা ইহারই আলোকে বিচার করিতে হইবে।"**

ভাবের নেশায় মেতে উঠে সেদিন দেশের লোক দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করবার জন্য, দেশের ধনবৃদ্ধি করবার জন্য বড় বড় কলকারখানা, নূতন নূতন কোম্পানী, বড় বড় জাহাজ ইত্যাদির চিন্তা করছিল—সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের ধনী-নির্ধনের বিষম দ্বন্দ্বকে এ দেশে আহ্বান ক'রে আনবার পথ প্রশস্ত করছিল, দয়ানন্দ তখন তা'তেও সায় দিলেন না। তাঁর কথা, **"একেবারে গোড়ায় যাও"**। তিনি চাইলেন জগতের অর্থনীতিক বিধিব্যবস্থাকে একেবারে উল্টে দিয়ে সমগ্র মানবসমাজকে এক বৃহৎ যৌথ-পরিবারে (one Commonwealth) পরিণত ক'রতে।

আশ্রমে যৌথ-পরিবার প্রতিষ্ঠা

বড় জিনিষ গড়বার আগে শিল্পী যেমন ছোট ক'রে একটী নমুনা গ'ড়ে নেয়, দয়ানন্দ তেমনি একটী নমুনা গ'ড়ে নিলেন তাঁর আশ্রমে। আশ্রম হ'ল একটী যৌথ-পরিবার। তাঁর ভক্তদের মধ্যে যাঁরা আশ্রমবাসী হলেন, তাঁদের ব্যক্তিগত

সম্পত্তি ব'লে কিছু রইল না। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন গরিব। তা হলেও যাঁর যা ছিল, আশ্রম ভাণ্ডারে তাহা দিয়ে তিনি সকলের সঙ্গে সমান হলেন। যাঁর অর্থ ছিল, তিনি দিলেন অর্থ, যাঁর অর্থ ছিল না, শারীরিক সামর্থ্য ছিল, তিনি তাই দিয়েই আশ্রমের সেবা ক'রতে লাগলেন। যাঁর দুয়ের কিছুই ছিল না, শুধু ছিল অধীত বিদ্যা, তিনি তাই দিয়েই আশ্রমের সেবা ক'রতে চাইলেন। যাঁর কিছুই ছিল না, তিনি ও আশ্রমে স্থান পেলেন। কি বা কতখানি দেওয়া হ'ল তা' নয়, আসল কথা আত্মনিবেদন। আশ্রমবাসীরা, যিনি যে কার্য্যের উপযুক্ত, আশ্রম-প্রেসিডেন্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ী—তিনি সেই কার্য্যে নিযুক্ত হ'লেন। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই কার্য্য সাধন করাই হ'ল তাঁর ধর্ম্মসাধন। তাঁর অন্নবস্ত্র যোগান দিবে আশ্রমভাণ্ডার। আশ্রমবাসীরা বাহিরে গিয়ে অর্থোপার্জ্জন করেন না। কিন্তু এতগুলি লোক নিয়ে আশ্রম চলে কি প্রকারে? আশ্রমের বৃত্তি কি?

আশ্রমের বৃত্তি হ'ল অমৃতবৃত্তি।

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

দয়ানন্দ তাঁর শিষ্যদিগকে গীতার সেই বাণী—কার্য্যতঃ শিক্ষা দিলেন। মিশনের যে কার্য্য, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা—তাহা শ্রীভগবানের কার্য্য। তাঁর ইচ্ছা হয়েছে—এই যুগে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। মানব ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকে মানবজাতিকে তিনি ক্রম-বিকাশের পথ দিয়ে এই দিকেই নিয়ে এসেছেন। তিনি যন্ত্রী, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা কার্য্যে তিনিই নেতা, তিনিই

চালক। আশ্রমবাসীরা তাঁরই চরণে আত্মনিবেদন ক'রে, তাঁরই উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর ক'রে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে নিজ নিজ কাজ ক'রে যাবেন। খাওয়াতে হ'লে তিনি খাওয়াবেন, না খেয়ে থাকা যদি প্রয়োজন হয়, তিনি সেইরূপ ব্যবস্থা করবেন, পরা'তে হলে তিনিই পরাবেন। না হ'লে তাঁরা নগ্নই থাকবেন, এই হ'ল আশ্রমবাসীদের সঙ্কল্প। প্রয়োজন-বিচার শ্রীভগবানের হাতে। মানুষের কখন কোন্‌টী প্রয়োজন, তার নিজের চেয়ে শ্রীভগবানই ভাল বুঝেন এবং সেই মতই তিনি ব্যবস্থা করেন। আজ ১৫ বৎসর (প্রথম ৫ বৎসর ভক্তদিগকে নিরভিমানতা শিক্ষা দিবার জন্য দয়ানন্দ মুষ্টিভিক্ষার প্রথা রেখেছিলেন) যাবৎ অরুণাচল মিশন এই ভাবেই চলে আস্‌ছে। ভিক্ষা করা আশ্রমবাসীদের নিষিদ্ধ। তাঁর উপর নির্ভর ক'রে তাঁর বিধান সর্ব্বান্তঃকরণে মেনে চলাই আশ্রমের শিক্ষা। যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যাহা দেন তাহা শ্রীভগবানেরই দানরূপে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কাহারও কাছে হাত পাতা হয় না। মিশনের সঞ্চয় নাই, কোনও ফণ্ড নাই। মিশনের উদ্দেশ্য বিরাট, কার্য্য বৃহৎ, যাহা আয় হয় তাহা অতি অল্প সময়েই ব্যয় হয়ে যায়—স্থিতি নাই, অপচয়ও নাই। এতগুলি লোক, স্ত্রী, পুরুষ, শিশু যুবা, বৃদ্ধ, এত বড় কাজে, কোনও সংস্থান না নিয়ে, জনসমাজের কাছে কোনও চাঁদা না চেয়ে কি ভাবে চলতে পারে, তাহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মিশনের লৌকিক কার্য্য দিন দিন বেড়ে চলেছে। সময়ে হাজার হাজার টাকা এসে উপস্থিত হয়েছে। আবার কখনও দুটী টাকাও আসে না। ভক্তরা স্ত্রী পুরুষ, শিশু ,যুবা বৃদ্ধ সকলে দিনের পর দিন অনশনে,

অর্দ্ধাশনে, শ্রীভগবানেরই দানরূপে এই অবস্থাকে গ্রহণ ক'রে পরমানন্দে থাকেন। এই সব অবস্থার ভিতরেই শ্রীভগবানের কৃপা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। সত্যের পরীক্ষা এইখানে। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে অরুণাচল এই কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়ে চলেছে। শ্রীভগবানই কৃপা ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন। এই শিক্ষার ভিতর দিয়েই দয়ানন্দ তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে গ'ড়ে তুলছেন।

এই হ'ল আশ্রমের ধর্ম্মসাধন। এই হ'ল দয়ানন্দের ধর্ম্মশিক্ষা। নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের দিন তিনি শিক্ষা দিলেন তাঁর ভক্তদিগকে বিশ্বাত্মবোধ। দেশপ্রেমের যখন বান ডেকেছে, দয়ানন্দ তখন তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে সেই প্রেমের আস্বাদ দিলেন, *যাহা দেশের সীমা ছাড়িয়ে সমস্ত বিশ্বমানবের কাছে নিজকে বিলিয়ে দেয়, যাহা নিজের ব'লে কিছু রাখে না, যাহা সমগ্র* বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞান করে। এই বিশ্বের সন্ধানে দয়ানন্দ-শিষ্যরা ছুটিলেন। বিশ্বাত্মা ভগবানের হাতের যন্ত্ররূপে, তাঁহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে। বিশ্বের কল্যানসাধনের জন্য অরুণাচল নিজকে উৎসর্গ কর'ল।

বিশ্বহিত-মহাযজ্ঞ

দুই বৎসর এই ভাবে আশ্রমে শিক্ষাকার্য্য চলতে লাগলো। দয়ানন্দের শিষ্যরা পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে এবং আসামের বহুস্থানে সঙ্কীর্ত্তন নিয়ে প্রচার করলেন। ১৩১৮ সালের ফাল্গুন মাসে, দোল পূর্ণিমায়, আসামের মৌলবীবাজার সবডিবিসনে, জগৎসী গ্রামে আর একটী আশ্রম স্থাপিত হ'ল। আশ্রম স্থাপনের সঙ্গে

সঙ্গে একটী মহাসঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ আরম্ভ হ'ল। আশ্রমভক্তেরা দিনরাত্রব্যাপী অবিশ্রান্ত সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন।

"যাবৎ সমগ্র জগতে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম পতাকা না উড়ে, প্রেমিক ভক্তের অশ্রুজলে বিধৌত হইয়া নবীন প্রেমযুগের পূর্ণাভিষেক না হয়, প্রভু করুন ততদিন যেন এ যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাপিত না হয়। আর ইহা যদি তাঁহার অভিপ্রেত না হয় তবে আশ্রমের পুণ্য ধূলিতেই যেন আমাদের দেহ মিশিয়া যায়।"

এই সঙ্কল্প নিয়ে আশ্রমবাসীরা এই নাম-মহাযজ্ঞ আরম্ভ করলেন। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে তাঁহারা এই মহাযজ্ঞে যোগদান করবার জন্য আহ্বান করলেন। বহু নরনারী যোগ দিলেন। দীর্ঘ চার মাস কাল সংকীর্ত্তন চললো।

নামের শক্তিতে, ব্রহ্মবলের উদ্বোধন ক'রে, ব্রহ্মবলের দ্বারা অরুণাচল জগতের পাপতাপ দূর ক'রে দিয়ে, ভাবরাজ্যে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে, বিশ্বমানবের ভাবের ধারাকে পরিবর্ত্তন ক'রে, সমস্ত জগতকে এক মহাভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে, জগত থেকে যুদ্ধবিগ্রহ দূর ক'রে দিয়ে জগদ্ব্যাপী এক অখণ্ড প্রেমরাজ্য স্থাপন ক'রতে উদ্যত হ'ল। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন", এই হ'ল তাহার পণ।

দয়ানন্দ জগতে অঘটন ঘটাতে চাইলেন। যাহা কখনও হয় নাই, যাহা কবির কল্পনায় ছিল, তিনি তাহাই বাস্তবে পরিণত ক'রতে চাইলেন। এখনকার রাষ্ট্রসঙ্ঘের (League of Nations) দিনে, যখন চারিদিকে রব উঠেছে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে, পৃথিবী থেকে যুদ্ধ উঠিয়ে দিতে

হবে, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র বিসর্জ্জন দিতে হবে, আজকার দিনেও পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই ধারণা ক'রতে পারছে না পৃথিবীতে শান্তি হতে পারে কি না, মানুষ বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছে না কি ক'রে পৃথিবীর দুর্দ্ধর্ষ ক্ষাত্রশক্তিসকলের হৃদয়মনের এতবড় পরিবর্ত্তন হ'তে পারে যাতে তারা তাদের যুগ যুগ ব্যাপী আচরিত যুদ্ধ কলহ পরিত্যাগ ক'রে পরস্পরকে ভালবাসবে, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতায় এক শান্তিরাজ্য গ'ড়ে তুলবে। কিন্তু তখনকার দিনে যখন পররাজ্যলোলুপ মূঢ় জাতিসকল পরস্পরকে হনন কর'তে উদ্যত, যখন হিংসাবিদ্বেষ চরমসীমায় এসে পৌঁছেচে—তখনকার দিনে এই মহাভাবুক জগতের অবস্থা দেখে একটুও ভীত হলেন না। জগতের সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে, অমানিশার অন্ধকার যখন চারিদিক ঘিরে ছিল, এই মহাতাপস তখন চাইলেন ধরাতলে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর'তে।

দয়ানন্দ-ভক্তরা গাইলেন :—

মোর শ্রীকৃষ্ণের চরণ হইতে
ছুটিয়া হরষে,
অই আসে এক অমৃত-বন্যা
ভারতবরষে।
হের কোটি কোটি সগর-সন্তান
উঠিছে জাগিয়া,
দীনতা হীনতা ঘুচে গেছে আজ
অমিয়া লাগিয়া।
ওগো বিশ্ববাসী, আসিতেছি মোরা
ভয় নাহি আর,

জগতের মাঝে করিব মহান্
সত্যের প্রচার।
শান্তির সলিলে দিবরে ধুইয়া
রক্ত-রণস্থল,
প্রেম-মন্দাকিনী বহাব জগতে
পুলকে চঞ্চল।
সুপ্ত নারায়ণ জাগিছেন আজ
প্রতি হিয়া মাঝে,
লুপ্ত হয়ে যাবে ভেদ বিসম্বাদ
মানব-সমাজে।

লক্ষ লোকের অবিশ্বাসের চেয়ে একজন বিশ্বাসীর বিশ্বাসের মূল্য ঢের বেশী। একটী মানুষের প্রাণে যদি মহাভাব নেমে আসে তা'হলে কোটি কোটি লোকের অ-ভাবকে তাহা পূরণ ক'রে দেয়। একজন মানুষের প্রাণেও যদি প্রকৃত জগৎ-কল্যাণকর বুদ্ধির উদয় হয়, তা'হ'লে সময়ে পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর প্রাণে সেই বুদ্ধির উদয় হবেই। বিশ্বের কল্যাণকামী একটী মহাপ্রাণের চিন্তা সমস্ত চিন্তাজগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে, জগতের চিন্তাধারাকে বদলে দেয়, জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা-গুলিকে ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধে নিয়ে যায়, ক্ষুদ্রকে বৃহতের সহিত সংযুক্ত ক'রে, এক মহান্ চিন্তায় সমস্ত জগতকে চিন্তিত ক'রে তোলে। একটী মানুষেরও প্রাণে যদি ঘন নির্ম্মল আনন্দের উদয় হয় তাহা এমনই এক আনন্দের সৃষ্টি করে যাহা বহুলোকের নিরানন্দ দূর ক'রে সকলকে আনন্দাভিষিক্ত ক'রে দেয়।

জগতে কল্পনার চেয়ে বাস্তবের মূল্য ঢের বেশী, বাক্যের চেয়ে কার্য্যের শক্তি বড়।

দয়ানন্দের প্রাণে এল এক নূতন জগৎ সৃষ্টির কল্পনা, সমস্ত জগদ্ব্যাপী এক মহাভ্রাতৃরাজ্য গঠন করার চিন্তা, জগতের রাষ্ট্রীয়, অর্থনীতিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থাকে উল্টে দিয়ে ভগবৎ-বিশ্বাসকে, শ্রীভগবানের পিতৃত্বকে ভিত্তি ক'রে তিনি চাইলেন জগদ্ব্যাপী এক নূতন রাষ্ট্র, এক নূতন অর্থনীতিক সঙ্ঘ, নূতন সামাজিক বিধিব্যবস্থা গঠন কর'তে। দয়ানন্দের যে কথা সেই কার্য্য। তিনি এই জাগতিক নূতন মানব-সমাজের প্রবর্ত্তন করলেন তাঁহার আশ্রমগুলিতে। তিনি শুধু আদর্শ দিয়েই নিশ্চিন্ত হলেন না, তিনি আদর্শানুযায়ী নমুনা দাঁড় করালেন তাঁহার আশ্রমগুলিতে। তখনকার দিনে দূরাগত সেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মূল্য কতখানি তাহা আজও হয়ত লোকে সম্যক্ ধারণা কর'তে পারবে না। কিন্তু দয়ানন্দ এই ভাবেই তাঁহার কার্য্য আরম্ভ করলেন।

লীলার জগতে বিরুদ্ধ শক্তির খেলা। দেবাসুরের যুদ্ধ প্রতি-নিয়ত চলছে, অসুর চায় দেবতাকে স্বর্গচ্যুত কর'তে, দেবতা চান অসুরকে পরাভূত ক'রে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে, অসুরকে তার ক্ষুদ্রসীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে। প্রতি মানুষের ভিতরে যেমন, মানবসমাজেও তেমনি। এই নামকীর্ত্তন-যজ্ঞে, নামের শক্তিতে দয়ানন্দ চাইলেন মানুষের ভিতর যে দেবতা আছেন, তাঁকে প্রবুদ্ধ কর'তে। সঙ্গে সঙ্গে অসুরও জাগ্রত হ'ল, এই মহাযজ্ঞ পণ্ড করাই হ'ল তার চেষ্টা। এই চেষ্টার সূত্রপাত মিশনের প্রতিষ্ঠাবধি। দলে দলে মানুষ আকৃষ্ট হয়ে কীর্ত্তনে

যোগ দিল। সঙ্গে সঙ্গে বহুলোক বিরুদ্ধবাদী ও বিরুদ্ধাচারী হয়ে উঠ্‌ল। হিন্দুসমাজের একদল লোকের প্ররোচনায় রাজশক্তি প্রতি পদে বিঘ্ন ঘটাতে লাগলো। ইং ১৯১২, ৩০শে জুন দয়ানন্দ ঘোষণা করলেন।

"* অদ্য ৪ বৎসর যাবৎ অরুণাচল দেশবাসীর সম্মুখে দণ্ডায়মান। এতাবৎকাল অরুণাচল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অযথা দারুণ অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আসিতেছে। প্রতি পদে শাসনবিভাগ কর্ত্তৃক সম্রাটের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতেছে। অযথা ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপে সেবক-সেবিকা বার বার ভারতের শাসন বিভাগের প্রতিনিধিকে তারযোগে জানাইয়াছেন। ফলে মাত্রা ক্রমশঃ এমন ভাব ধারণ করিয়াছে যে বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা অতীব দুঃখের সহিত বে-আইনী শাসন অমান্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। প্রজার ধর্ম্ম বিষয়ে সহায় হওয়া রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। রাজা সে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হওয়ায় ও পুনঃপুনঃ সংশোধনার্থ অনুরোধ উপেক্ষা করায়, কেবল মাত্র ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া রাজা-প্রজা সম্বন্ধ রহিত করিলাম। ভারত চিরদিন ধর্ম্মক্ষেত্র; ধর্ম্মোপার্জ্জনে এভাবে রাজশক্তি কর্ত্তৃক বাধা পাওয়া অপেক্ষা অরুণাচল অন্য যে কোনও পরিণাম সুখকর মনে করিবে।

দয়ানন্দ"

হিংস্র রাজশক্তি কামান বন্দুক নিয়ে কীর্ত্তনস্থল আক্রমন ক'রল, বন্দুকের গুলি চালিয়ে, কীর্ত্তনস্থল রক্ত-রঞ্জিত ক'রে, সেবক সেবিকা, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের উপর অশেষ নির্য্যাতন

* District Sylhet, Case No. $\frac{9}{7}$ of 1912, Ext. No. 5

ক'রে, গৌরাঙ্গবিগ্রহ খণ্ড খণ্ড ক'রে এই যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাপিত কর'ল। সে সব কথার পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। দ্বাদশজন ভক্তসহ দয়ানন্দ কারাবদ্ধ হলেন। ঋষি যুগানন্দ বুলেটের আঘাতে সিলেট হাঁস্‌পাতালে প্রাণত্যাগ ক'রলেন। ভক্তদের মধ্যে যাঁরা জেলের বাহিরে রইলেন, তাঁরা চুপ ক'রে বসে রইলেন না। বাংলাদেশের বহুস্থানে তাঁরা কীর্ত্তন ক'রে বেড়াতে লাগলেন।

জেল থেকে বাহির হয়ে দয়ানন্দ নূতন উদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করলেন। দিনাজপুর সহরে গৌরীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপন ক'রে আর একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রেমের সহিত শক্তির এই নূতন সংমিশ্রণে গোঁড়ার দল আবার বিরক্ত হ'ল। আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কয়েকদিন ব্যাপী তুমুল কীর্ত্তন হ'ল। উৎসবের শেষদিনে যে নগরকীর্ত্তন হয়, দিনাজপুরবাসীরা এখনও তাহা ভুলতে পারেন নাই। ইং ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

ইং ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে ইয়োরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। জগতের ক্ষাত্রশক্তিগুলি নিজে নিজে কাটাকাটি ক'রে ধ্বংস হ'তে লাগলো। পৃথিবীতে রক্তের স্রোত বহিল, বহুদেশ, বহু সমৃদ্ধিশালী নগর ধ্বংসাবশেষে পরিণত হ'ল। হিংসা-বিদ্বেষে জগতের হাওয়া দূষিত হয়ে উঠলো। প্রতিদিন সহস্র সহস্র মানুষ মরতে লাগলো। লক্ষ লক্ষ নরনারীর ক্রন্দনের রোল উঠলো। আর্ত্তের আর্ত্তনাদে, ব্যথিতের বেদনায় ভাবুকের প্রাণ ব্যথিত হয়ে উঠলো। অরুণাচলের সাধক তাঁর প্রাণের ভিতর এই ক্রন্দন, এই আর্ত্তনাদ শুনতে পেলেন। তাঁর

প্রাণ আকুল হয়ে উঠলো। দয়ানন্দ-শিষ্য স্বামী অভয়ানন্দ মহাযুদ্ধের শান্তি কামনায় ইং ১৯১৫ সালের ১৪ই জানুয়ারী বড় লাটের নিকট নিম্নলিখিত তার পাঠালেন :

"আজ অরুণাচলের ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব, কিন্তু আমার প্রাণ আজ ইয়োরোপীয় মহাসমরের অবস্থা চিন্তা করিয়া কত ভাবেই না অভিভূত। উৎসব মহা আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু ইয়োরোপে কি ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে! দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, কোটী কোটী নরনারী হিংসাবিদ্বেষে জর্জ্জরিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের উচ্ছেদ সাধনে নিযুক্ত! ঘরে ঘরে কি ভয়ঙ্কর হাহাকার ও আর্ত্তনাদ, কি মর্ম্মভেদী ক্রন্দনরোল! কত রক্তস্রোত ও নরহত্যা! কত ধর্ম্মসমাজ ও দেবমন্দির কত ঘরবাড়ী, জনপদ বিধ্বস্ত ও মহাশ্মশানে পরিণত! এই মহাসমরাগ্নি হইতে উত্থিত দুঃখ, দৈন্য ও বিষাদধূম কোন না কোন আকারে পৃথিবীর সমুদয় দেশ ও জাতিকেই কালিমাময় করিয়া তুলিয়াছে এবং ক্রমেই এই কালিমা বৃদ্ধি পাইতেছে। পৃথিবীর এই ঘোর দুঃখ দুর্দ্দশার অবস্থায় আজ কি করিয়া আমার প্রাণ উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিতে পারে?

"আমি পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি, একমাত্র শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন মানবীয় কোন চেষ্টাই এই মহা দুঃখের অবসান করিয়া পরম শান্তি সংস্থাপনে সমর্থ হইবে না। তাই আমার প্রাণে এই প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত ও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, আমি সমুদয় বিরুদ্ধ শক্তি সমূহের ভয়াবহ কামান, গুলি গোলা ও অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যস্থলে এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল এই মহাধ্বংসের পুরোভাগে রিক্তহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বশক্তির আধার

শ্রীভগবানের নিকট মহাশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাতর কণ্ঠে একবার প্রার্থনা করি। আপনি দয়া করিয়া আমার এই অভিলাষ যাহাতে পূর্ণ হইতে পারে, এই সম্বন্ধে আমাকে যথাবিহিত আদেশ ও অনুমতি প্রদান করুন, এই আপনার নিকট আমার সানুনয় প্রার্থনা।"

এই তারের উত্তরে আসামের চিফ্ কমিশনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে পাঠালেন।

অরুণাচলের সাধক বিশ্বের কল্যাণকামনায় মা আনন্দময়ীর চরণে নিয়ত প্রার্থনা কর'তে লাগলেন। দয়ানন্দ সময়ের প্রতীক্ষায় রইলেন।

ইং ১৯১৮ সালের প্রথমভাগে শ্রীহট্টের বামৈ গ্রামে নূতন আর একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হ'ল। আশ্রমের নাম হ'ল "অমৃত মন্দির"।

বিশ্বমিলনী স্কীম

ইয়োরোপীয় মহাসমরাগ্নি নির্ব্বাপিত হ'য়ে এল। ১১ই নভেম্বর যুদ্ধ বন্ধ হ'ল। প্যারিসে শান্তিসভা আহূত হ'ল। কেহ বুঝিল, কেহ বুঝিল না, পৃথিবীব্যাপী এই মহা সমরাগ্নিতে পুরাতন জগৎ ভস্মীভূত হয়ে গেল। নূতন জগতের সৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। দয়ানন্দ যে শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করছিলেন তাহা উপস্থিত হ'ল। ইং ১৯১৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তিনি তাঁর সঙ্কল্পিত নূতন জগতের একটী ছবি এঁকে শান্তিসভায় পাঠিয়ে দিলেন। শান্তিসভার সভাপতি, ও সভ্যদের মধ্যে Clemenceau (ক্লেমেন্‌সো), Wilson (উইলসন্), Lloyd

George (লয়েড জর্জ্জ), Signor Orlando (সিনর অরল্যাণ্ডো) এবং Sir S. P. Sinha (স্যার এস পি সিংহের) নিকট cable (তার) ক'রে তিনি তাঁর বিশ্বশান্তি প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলেন। পরে পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজ্যাধিপতিদের নিকট, রাজ-নীতিকদের নিকট প্রধান প্রধান সংবাদপত্র-সম্পাদকদের নিকট এবং বহু চিন্তাশীল লোকের নিকট এই স্কীম পাঠানো হ'ল। এতদিন দয়ানন্দ যে চিন্তা পোষণ ক'রে এসেছেন, যে ভাবে তিনি তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে অনুপ্রাণিত করেছেন, যে নমুনায় তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন, আজ তিনি তাহা স্থূলতঃ বহির্জগতের সামনে ধ'রে দিলেন। নূতন জগৎ সৃষ্টির প্রাক্কালে তিনি পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করার এক বিরাট আদর্শ বিশ্ববাসীর সামনে স্থাপন করলেন। বিশ্বের কল্যাণ কামনায় নিজকে "সন্ন্যাসী ও বিশ্বসুহৃদ" এই পরিচয় দিয়ে দয়ানন্দ সমস্ত মানব জাতিকে নিয়ে কি ভাবে এই প্রেমরাজ্য গ'ড়তে হবে তার একটী স্কীম পাঠিয়ে দিলেন। স্কীমটী এই :—

AN APPEAL

TO THE

MEMBERS OF THE PEACE CONFERENCE

From a Sannyasin, a Friend of the World.

With the end of the great war, a New Era of Peace and progress has dawned upon the world. Statesmen and philosophers

of all countries are striving to find out how best to bring about peace and harmony, and some of them have come forward with definite suggestions of their own; but none, to my mind, are calculated to bring about the desired end. I also have worked out a scheme and I venture to place it before the Conference, but before doing so I wish to make a few observations:

One side has achieved victory in the war and is jubilant, the other is defeated and thinks itself helpless—one side is supremely happy, the other is sullen and dejected. The Central Powers have accepted the terms of armistice because they could not do otherwise. If at the conclusion of peace severe terms, even if they be just and equitable, are imposed upon the Central Nations, they will have to accept them only as a way out of the difficult position in which they find themselves, while at the same time they will be smarting under a sense of grievous wrong, and will always be on the look-out for an opportunity to break away from the compact. Thus there will be peace in appearance but not a real and lasting peace, which the world

is longing for. A serious attempt should therefore be made to establish peace on the basis of universal brotherhood of man, knit mankind in one bond of love and union.

With all respect and humility, I, therefore, make an earnest appeal to every member of the Peace Conference to make such an attempt. Let all who take part in the deliberations of this momentous conference be filled with a deep sense of responsibility, the like of which never rested on any man before. A most sacred task has been entrusted to them and in order to fulfil it, they must rise above the petty prejudices of one country against another and be even prepared to sacrifice, if need be, the interests of one nation before the greater interests of all humanity.

The proper question before the members of the Peace Conference should be, not to gain the best advantage over the enemy, but to adopt measures which will make all future wars not merely impossible but *unnecessary*. Now let me present my scheme which, I hope and trust, will bring about the desired end :

Let the people of each country elect for a definite number of years one amongst themselves as President, who, with the help of a Council, will guide their destinies. And let the Presidents of the different countries, in turn, elect one among themselves as the Chief President who, with a Council of Ministers sent by the different countries (each forming a component part of the Commonwealth of the World) will form a Government separate from the Government of each country and at the same time be watching over and looking into the workings of each, as well as co-ordinating the actions and activities of the different countries in matters of international affairs so that all will grow and develop alike and none will take advantage over the other.

All the Presidents and the Chief President are to think themselves to be the vicegerents and servants of God, the common Father of all, and at the same time to look

upon all the people of all the countries as their brothers, and they must hold themselves responsible before God and man for the peace, happiness and progress, both spiritual and material, of the world.

If this scheme of mine is accepted and given shape to, it will remove the feeling of rivalry and ill-will,—it will do away with all differences between Labour and Capital and all other internal differences of each particular country as also the differences between one country and another. The people of one particular country will have nothing to lose, but everything to gain—they will enjoy the fruits of the labour and culture of every other nation without ceasing to enjoy the peculiar blessings of their own. Under the scheme, there will be no room for superiority and inferiority—no sense of shame which attaches to a subject nation and consequently no ground for jealousy and least of all, will there be the *need* for Militarism. I have felt it within myself that this is the *only* way to bring about a solution of all the troubles of the world and that there is no other.

True, the difficulties in the path of this ideal are great and numerous; nevertheless, this idea will have to be worked out before there can be peace and harmony on earth. I have put my scheme in a crude form but I am prepared to work it out in detail and to meet all arguments against it. The nations of the world may come to an arrangement amongst some of themselves and may call it peace, but true peace cannot come unless and until this ideal is accepted and given effect to. In fact, the federation of all nations will be the logical sequence of the great world-war.

Let the members of the Peace Conference cast aside all sense of national pride and prejudice, and they will at once see that this is the highest consummation that they can look for. The world has arrived at a stage when this cannot be delayed any more—the time is most propitious and serious attempts should be made in this direction. I only hope that the members of the Peace Conference will not fail to do so. May the God of all

nations give them courage and strength to bring down the Kingdom of Heaven on earth.

THAKUR DAYANANDA,
Arunachal Mission,
Amrit Mandir.

BAMAI P. O. (DT. SYLHET),
T. O.: FANDAUK,
INDIA.
Dated the 17th Dec., 1918.

স্কীমের অনুবাদ

শান্তিসভার সদস্যগণের প্রতি সন্ন্যাসী ও বিশ্বসুহৃদ ঠাকুর দয়ানন্দের নিবেদন।

মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জগতে উন্নতি ও শান্তির এক নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছে। এই সময়ে দার্শনিক ও রাজ-নৈতিক পণ্ডিতগণ বিশ্বব্যাপী শান্তি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এতৎ সম্বন্ধে মন্তব্য এবং অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহার কোনটিই লক্ষ্য সাধনের যথার্থ পন্থা নহে। আমি একটি প্রস্তাব লইয়া শান্তি সভার সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি, কিন্তু তৎপূর্ব্বে কয়েকটি কথা বলিয়া লওয়া আবশ্যক।

যুদ্ধে এক পক্ষ জয়ী হইয়া আনন্দে উল্লসিত হইয়াছেন, অপর পক্ষ পরাজিত হইয়া আপনাকে নিঃসহায়জ্ঞানে নিরাশ ও বিষণ্ণ বোধ করিতেছেন। পরাজিত দেশগুলি অনন্যোপায়

হইয়াই প্রারম্ভিক সন্ধি-সর্ত্ত অঙ্গীকার করিয়াছেন। শান্তি সভার মীমাংসাকালে ন্যায়ানুমোদিত হইলেও যদি কঠোর সর্ত্ত সকল প্রস্তাবিত হয়, তাহা হইলে বিপদের হাত হইতে আপাততঃ রক্ষা পাওয়ার প্রত্যাশায় তাঁহারা বাধ্য হইয়া তাহা গ্রহণ করিবেন; কিন্তু ইহাকে তাঁহাদের প্রতি অন্যায় উৎপীড়ন বলিয়া মনে করিবেন এবং চিরদিন একটা বিরুদ্ধভাব পোষণ করিবেন এবং প্রতিনিয়ত এই সন্ধি ভঙ্গ করিবার সুযোগ অন্বেষণেই থাকিবেন। সুতরাং এই প্রকার সন্ধি দ্বারা আপাততঃ এক প্রকার শান্তির প্রতিষ্ঠা হইলেও সমগ্র জগতের আকাঙ্ক্ষিত যথার্থ ও স্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা কদাচ হইবে না। অথচ সময় উপস্থিত, যখন 'বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব'কে মূলমন্ত্র করিয়া সমস্ত মানব জাতিকে প্রেম ও মিলনসূত্রে বদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক।

এই জন্য আমি সসম্মানে ও বিনীতভাবে শান্তি-সভার প্রত্যেক সদস্যকে এইরূপ চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতেছি। শান্তি সভার আলোচনায় যাঁহারা যোগদান করিবেন, তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন যে, এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার পূর্ব্বে কাহারও উপর কখনও অর্পিত হয় নাই। তাঁহাদের সম্মুখে অতি মহান ও পবিত্র কার্য্য; তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে জাতিগত সর্ব্বপ্রকার বিরোধ ও ক্ষুদ্রতা বিস্মৃত হইতে হইবে, এমন কি, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য যদি জাতিবিশেষের ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দেওয়া প্রয়োজন হয়, তবে তাহাও অকুণ্ঠিত চিত্তে করিতে হইবে।

শত্রুপক্ষকে বিপন্ন অবস্থায় পতিত দেখিয়া তাহাদের উপর

প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা না করিয়া, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে ভবিষ্যতে যুদ্ধবিগ্রহ কেবল অসম্ভব নয়, অনাবশ্যক হইয়া পড়িবে, এই আলোচনাই শান্তি সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আমার বিশ্বাস আমার প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে উক্ত উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে সাধিত হইবে।

প্রস্তাবটি এই :—

প্রতি দেশের বা প্রতি রাষ্ট্রের জনসাধারণ কোনও এক নির্দ্দিষ্টকালের জন্য, আপনাদের মধ্য হইতে একজনকে আপন রাষ্ট্রপতি (প্রেসিডেণ্ট) নির্ব্বাচন করুন, তিনি একটি মন্ত্রণাসভার সাহায্যে স্ব-রাষ্ট্র সংক্রান্ত সকল কার্য্য পরিচালনা করিবেন। তার পর সমুদয় রাষ্ট্রপতিগণ সমগ্র পৃথিবীকে এক অখণ্ড মহারাষ্ট্রে পরিণত করিয়া এবং প্রতি দেশ ও প্রদেশকে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বীকার করিয়া, তাহার জন্য আপনাদের মধ্য হইতে বিশিষ্ট কোন একজনকে নির্দ্দিষ্টকালের জন্য, মহারাষ্ট্রপতি মনোনীত করিবেন। মহারাষ্ট্রপতি প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-দিগকে লইয়া এক মহাসভা সংগঠন পূর্ব্বক তাহার সাহায্যে, একদিকে প্রত্যেক রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন কার্য্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখিবেন, অন্যদিকে রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া সকলের কার্য্যের সামঞ্জস্য ও যোগ রক্ষা করিবেন এবং পৃথিবীর সকল দেশ যাহাতে ঠিক সমান-ভাবে উন্নতির পথে চলিতে পারে ও এক দেশ অপর দেশের প্রতি কোন প্রকার অন্যায় আচরণ করিতে না পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। রাষ্ট্রপতিগণ ও মহারাষ্ট্রপতি প্রত্যেকেই আপনাকে বিশ্বপিতা শ্রীভগবানের প্রতিনিধি ও সেবক বলিয়া জানিবেন,

সকল দেশের সকল নরনারীকে ভ্রাতা ও ভগ্নী জ্ঞান করিবেন এবং জগতের শান্তি, সুখ এবং পার্থিব ও পারমার্থিক সকল প্রকার উন্নতির জন্য আপনাকে দায়ী মনে করিবেন।

আমার এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে জগৎ হইতে যাবতীয় হিংসা বিদ্বেষ ও অপ্রেম দূরীভূত হইবে এবং ধনিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব ও অন্যান্য সকল প্রকার বিরোধের মীমাংসা হইবে। এজন্য কোন জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত বা কিছু ত্যাগ করিতে হইবে না, বরং প্রত্যেকেই ক্ষুদ্রকে পরিহার করিয়া বৃহৎকে প্রাপ্ত হইবেন; এক দেশের পরিশ্রম ও সাধনার ফল অপর দেশ অবাধে ভোগ করিতে পারিবেন; সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক সুখ ও স্বার্থ সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকিবে। এই প্রস্তাবানুযায়ী ব্যবস্থা হইলে জাতিগত, উচ্চনীচ, বা জেতা ও বিজিতের পার্থক্য থাকিবে না, সুতরাং কোন জাতির প্রাণে কোন প্রকার ক্ষোভ বা ঈর্ষা থাকিবে না এবং বিপুল অর্থব্যয়ে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিবারও কোন প্রয়োজন থাকিবে না। আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছি যে, বর্ত্তমান জগতের সমস্ত সমস্যা মীমাংসার এবং সকল দুঃখ কষ্ট অবসানের ইহাই একমাত্র পন্থা—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে নানা বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া নিতান্তই সম্ভব কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত জগতে যথার্থ শান্তির প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব। বলা বাহুল্য, আমি অতি সাধারণ ও সংক্ষিপ্তভাবে প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়াছি, প্রয়োজন হইলে, আমি ইহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে এবং

ইহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত যে কোন যুক্তি তর্ক খণ্ডন করিতে প্রস্তুত আছি।

জগতের কয়েকটি জাতি মিলিত হইয়া আপনাদের মধ্যে কোনও রূপ একটা মিটমাট করিয়া লইয়া তাহাকে শান্তি আখ্যা দিতে পারেন, কিন্তু উহা কখনই যথার্থ শান্তি হইবে না, কারণ এই উচ্চ আদর্শ গৃহীত ও কার্য্যে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত কখনই প্রকৃত শান্তি সম্ভব নহে। পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে মিলিত করিয়া একটি বিশ্বব্যাপী মহারাষ্ট্র গঠনই এই মহাযুদ্ধের স্বাভাবিক পরিণতি।

সকল প্রকার সংস্কার ও অভিমান শূন্য হৃদয়ে বিচার করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে সমগ্র বিশ্বের পক্ষে সকল জাতি ও সকল রাষ্ট্র মিলিয়া এই মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আর হইতে পারে না—একমাত্র ইহাতেই সমগ্র মানবজাতির সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ পরিতৃপ্তি সম্ভব। সময় অনুকূল, ঘটনা চক্রে পৃথিবী আজ এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে যে, এই মহান্ আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নয়। আমি আশা করি, শান্তি-সভার সদস্যগণ এই মহান্ কার্য্যে পশ্চাৎপদ হইবেন না। সকল জাতির বিধাতা পুরুষ তাঁহাদিগকে ধরাধামে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করিবার উপযুক্ত শক্তি ও সাহস প্রদান করুন।

বামৈ, শ্রীহট্ট।
টেলিঃ অঃ ফান্দাউক,
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯১৮।

ঠাকুর দয়ানন্দ
অরুণাচল মিশন,
অমৃত মন্দির।

স্কীমের গোড়ার কথা হচ্চে পৃথিবী থেকে যুদ্ধ উঠিয়ে দিতে হবে,—জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ, ধনী-নির্ধনের যুদ্ধ, শ্রমিক (Labour) ধনিকের (Capital) যুদ্ধ। পশুশক্তিকে জগৎ থেকে নির্ব্বাসিত করতে হবে। দ্বিতীয় কথা, পৃথিবীর ১৮০ কোটি মানবের স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের সুখ সুবিধার বিধান ক'রতে হবে, প্রত্যেকের জাগতিক এবং পারমার্থিক উন্নতির পথ খুলে দিতে হবে। প্রত্যেক মানুষ—প্রত্যেক স্ত্রী, প্রত্যেক পুরুষ স্বাধীন, প্রত্যেক জাতি স্বাধীন। রাষ্ট্রগুলি আর পরস্পর অসংলগ্ন ভাবে থাকলে চলবে না। ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বাধীনতাকে ভিত্তি ক'রে সব খণ্ড রাষ্ট্রগুলিকে মিলিয়ে জগদ্ব্যাপী এক মহারাষ্ট্র গঠন করতে হবে। খণ্ড রাষ্ট্রগুলির অধিবাসীরা নিজেদের ভিতর থেকে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য রাষ্ট্রনেতা নিযুক্ত করবে, আবার সব খণ্ড রাষ্ট্রগুলির নেতারা নিজেদের ভিতর থেকে একজনকে এই মহারাষ্ট্রের নেতা মনোনয়ন করবেন। প্রত্যেক খণ্ড-রাষ্ট্রনেতা দেশের অভিজ্ঞ বিচক্ষণ লোকদের নিয়ে তাঁহার কার্য্যকরী সভা গঠন ক'রে নেবেন। মহারাষ্ট্রের যিনি নেতা হবেন তিনি প্রত্যেক দেশ থেকে একজন দুইজন ক'রে উপযুক্ত লোক নিয়ে তাঁহার মন্ত্রণাসভা গঠন করবেন।

পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের, প্রত্যেক জাতির পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ক'রতে হবে। বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ক'রে, শ্রীভগবানকে সমাজের কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে, সকলে তাঁহার সন্তান, সকলে ভাই ভাই, ভাই ভগ্নী

এই জ্ঞানে এক নূতন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর সমস্ত ধন সম্পদ সমস্ত মানবজাতির, এই জ্ঞান প্রাণে জাগরূক রেখে জগদ্ব্যাপী এক নূতন অর্থনীতিক সমাজ (World Commonwealth) গ'ড়তে হবে। প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষের লক্ষ্য হবে অখণ্ড মানবসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন, সমাজের কার্য্য হবে প্রত্যেকের অন্নবস্ত্রের জোগান দেওয়া, প্রত্যেকের বাসের সুবিধা করা, প্রত্যেকের শিক্ষা, প্রত্যেকের চিকিৎসা, প্রত্যেককে আনন্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করা। বর্ত্তমান ব্যবসা, বাণিজ্য, লাভলোকসানের আদান প্রদান, মুদ্রা ব্যবস্থা (money system) তুলে দিয়ে সমস্ত দেশ গুলি নিজের নিজের উৎপন্ন দ্রব্য প্রয়োজনানুসারে পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করবে, এইরূপ ব্যবস্থা ক'রতে হবে।

এই হ'ল স্কীমের কথা। দয়ানন্দ তাঁহার চিন্তারাজি, তাঁহার মহাভাবকে এই আকার দিয়ে জগতের সামনে ধ'রে দিলেন। নূতন জগতের সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হ'ল।

তৃতীয় অধ্যায়

নবযুগ—সত্যযুগ

স্কীমের প্রথম কথা—নবযুগ এসেছে। "নবযুগ আসিয়াছে, সত্যযুগ আসিয়াছে, অমৃতের যুগ আসিয়াছে"—আজ বাইশ বৎসর ধ'রে দয়ানন্দ ও তাঁহার ভক্তগণ এই কথা প্রচার ক'রে এসেছেন। এই বাইশ বৎসর ধ'রে দয়ানন্দ নবযুগের শিক্ষা দিয়ে এসেছেন, নবযুগের নূতন ভাব, নূতন ধর্ম্ম, নূতন জ্ঞান, নূতন কর্ম্ম প্রচার ক'রে নবযুগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন।

বিশ্বের নরনারীকে স্কীম উপহার দিয়ে তিনি বলছেন, যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার শেষ হয়েছে, উষার নূতন আলোক দেখা দিয়েছে, জগতে নবযুগের আবির্ভাব হয়েছে। রাত্রিশেষে যখন দুর দূরান্তর হ'তে, বহুদিন পরে, কোনও পরমাত্মীয় এসে উপস্থিত হন, গৃহবাসীরা তখনও নিদ্রিত থাকে। যিনি জাগ্রত থাকেন তিনিই তাঁকে দুয়ার খুলে আবাহন করেন ও সকলকে ডেকে সংবাদ দেন। তখন গৃহের সকলে নবাগত এই পরমাত্মীয়ের কাছে ছুটে আসে। সকলের প্রাণ তখন এক নূতন আনন্দে ভ'রে যায়, সকলের চলাফেরায় এক নূতন চাঞ্চল্য ফুটে উঠে। সর্ব্বাগ্রে ছুটে আসে তারা যাদের প্রাণ নবীন ও সরস, আনন্দই যাদের সহজ অবস্থা, সেই শিশুরা। ধীরপাদক্ষেপে আসে তারা, যাদের শরীর

ও মন ভারাক্রান্ত, নিরানন্দ ভোগ ক'রতে ক'রতে, যারা রসবোধ হারিয়ে ফেলেছে, আনন্দে যারা নেচে উঠতে পারে না।

গৃহের একজন, দুজন ক'রে তখন সকলেই ব'লতে থাকে, আমাদের বন্ধু এসেছে। সকলেই তাকে দেখে, তাকে নিয়ে চলাফেরা করে, তার সঙ্গ উপভোগ করে। শুধু বাহিরে নয়, সকলের মনের ভিতরও সে স্থান গ্রহণ করে। ক্রমে বন্ধুর আসা সকলের কাছে সহজ হ'য়ে যায়, এবং তাহা প্রত্যেকের প্রাণ, মন, চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মের উপর এক প্রভাব বিস্তার করে। নবাগত বন্ধুটী অলক্ষ্যে প্রত্যেকের জীবনেই অল্পবিস্তর এক পরিবর্ত্তন এনে দেয়। সব চিন্তার ভিতর তার চিন্তা সকলকে করতে হয়, সব কথার ভিতর তার কথা বলতে হয়। সকলেরই বাক্যে, কার্য্যে, ভাবে, ভঙ্গীতে সে যে এসেছে, এ পরিচয় পাওয়া যায়।

বহুদিন পরে জগতে আজ বহু-আকাঙ্ক্ষিত বন্ধু নবযুগ এসেছে। সদাজাগ্রত পুরুষ দয়ানন্দ তাকে আবাহন ক'রে নিয়ে জগদ্বাসী সকলকে সংবাদ দিতেছেন, উঠ তোমরা, নবযুগ এসেছে। নবযুগকে আবাহন ক'রে আনা, তাকে জগতের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেওয়া, জগতের মাঝে তাকে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার জীবনের সাধনা। নবযুগকে পূর্ণ রূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তিনি জগতে এসেছেন। সারা জীবন ধ'রে তিনি নবযুগকে ডেকেছেন, তার জন্য তিনি অনেক কেঁদেছেন, অনেক দুঃখ, অনেক যন্ত্রণা, অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। তিনি অকাতরে সব সহ্য করেছেন তাঁর প্রিয়ধন নবযুগের জন্য।

তাই আজ অমানিশার গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়ে

যখন নবযুগ এসে দাঁড়ালো, তাঁহারই শাশ্বত চক্ষু প্রথম দেখিল নবযুগকে। তিনি দুবাহু প্রসারিত ক'রে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। জগতের নরনারীকে ডেকে তিনি বললেন, নবযুগ এসেছে, আজ হ'তে ছাড় তোমরা তোমাদের পুরাতন যুগের পুরাতন খেলা। পুরাতন খেলা তোমরা অনেক খেলেছ, আজ হ'তে নবযুগকে নিয়ে তোমাদের নূতন খেলা খেলতে হবে।

জগন্মাতার যাঁরা শিশুসন্তান, যাঁরা প্রেমিক, যাঁরা ভাবুক, যাঁরা তরুণ, তাঁরা প্রাণ দিয়ে দয়ানন্দের এই ডাক শুনেছেন, তাঁরা ছুটে এসেছেন নবযুগকে দেখতে। একজন, দুজন করে আজ জগতে বহুলোক ব'লছে, নবযুগ এসেছে। নবযুগের আগমন ক্রমে সকলের কাছে সহজ হ'য়ে উঠেছে। সকলেই নবযুগকে দেখছে, তার কথা শুনছে, তার সঙ্গ ক'রছে। নবযুগ আজ বিশ্বের সমস্ত নরনারীর প্রাণের ভিতর তার স্থান গ্রহণ করেছে। সকলের চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের ভিতর নবযুগের পরিচয় পাওয়া যাচ্চে। মুখে না বললেও, সকলের ভাবভঙ্গীর ভিতর দিয়ে, তাদের কার্য্যকলাপের ভিতর দিয়েও নবযুগ আসার পরিচয় ফুটে উঠছে।

এই নবযুগের এমনই মোহিনী শক্তি যে, প্রবীনতার ভাণ ক'রে, এ খেলাকে অবজ্ঞা ক'রে যারা দূরে ব'সে ব'সে তাদের পুরাতন যুগের পুরাতন খেলা খেলছিল, আর নবযুগের নূতন খেলার উচ্চরোলে এক একবার চকিত হয়ে উঠছিল, ক্রমে তারাও এসে নবযুগের এই খেলায় যোগ দিচ্ছে, কেহ জ্ঞাতসারে, কেহ অজ্ঞাতসারে, কেহ ইচ্ছায়, কেহ অনিচ্ছায়। কি ভাবে নবযুগের এই খেলা চলছে তাহা আমরা পরে দেখাব।

কি কার্য্য এই নবযুগের? কোন্ উপহার সে জগতকে দিচ্ছে? অখণ্ড শান্তি ও অনন্ত উন্নতি। এ যুগ শান্তির যুগ। মানব ইতিহাসের প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত যে যুগ গেল তাকে বলা যেতে পারে যুদ্ধের যুগ। হাজার হাজার বৎসর ধ'রে মানব জাতি পরস্পর পরস্পরকে হনন ক'রে এসেছে। শত শত সাধু, মহাপুরুষ, ধর্ম্মোপদেষ্টা এসে মানুষকে শান্তির পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মানুষ দুদিনেই তাঁদের শিক্ষা ভুলে গিয়েছে। তার অন্তরের দৈন্য, তার আদর্শের ক্ষুদ্রতা আবার আত্মপ্রকাশ করেছে। সে বৃহৎ হতে বৃহত্তর ক্ষেত্রে এসে পড়েছে কিন্তু যুদ্ধের যে মূল কারণ তাহা সর্ব্বদাই তার ভিতরে বাহিরে রয়ে গিয়েছে। যুদ্ধকেও সে তার সঙ্গে বৃহৎ হতে বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে। যুদ্ধের চরম উৎকর্ষ হয়েছে। যুদ্ধ আজ সমস্ত মানবজাতিকে ধ্বংস ক'রতে উদ্যত। আজ হয় যুদ্ধের শেষ, না হয় মানব জাতির শেষ হবে। এমন সময়ে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে দৃশ্য পরিবর্ত্তন হ'ল। মহানটরাজের অপূর্ব্ব কৌশলে যুদ্ধ-যুগের অবসান হ'ল। নবযুগ এসে উপস্থিত হ'ল। শান্তির যুগ এল। রক্ষা-কর্ত্তা মানবজাতিকে রক্ষা করলেন।

আজ অনন্ত উন্নতির দ্বার মানুষের সম্মুখে খুলে গেল। এতদিন তার প্রাণ 'আমিত্বে'র ঘূর্ণিপাকে প'ড়ে অতল তলে ডুবে যাচ্ছিল, আজ বৃহৎ 'আমি'র সঙ্গে তার যোগ হ'ল। এতদিন তার প্রাণ ক্ষুদ্র সীমার ভিতর আবদ্ধ ছিল। যেখানে সীমা, সেখানেই সংঘর্ষ। আজ তার প্রাণ সীমা ছাড়িয়ে অসীমে এল। তার সীমার দ্বন্দ্ব শেষ হ'ল। আজ তার প্রাণে

বিশ্বাত্মবোধ জাগ্রত হ'ল। আজ তার প্রাণের সকল অ-ভাব দূর হ'ল। আজ নবযুগের নবভাবে তার প্রাণ পূর্ণ হ'ল।

এতদিন ধ'রে ধ্বংসের খেলাতে মত্ত হ'য়ে সে তার সমস্ত শক্তি ব্যয় ক'রে দিচ্ছিল। আজ তার সমস্ত শক্তি সংহত হ'ল, নূতন জগৎ সৃষ্টি কার্য্যে তার শক্তি নিয়োজিত হ'ল। বিজ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার থেকে সে সামান্যই নিতে পেরেছে। তার নেবার শক্তিই ছিল সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞানের অফুরন্ত জ্ঞান-রাশি আজ সব তাহার। অনন্ত সুখসুবিধার উপায় আজ তাহার করায়ত্ত হ'ল। মানুষের সুখসুবিধা আনন্দের কতখানি সুবন্দোবস্ত হ'তে পারে অতীত যুগে তার নমুনা মাত্র দেখা গিয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর সুখসুবিধা বিধান করাই হ'ল এই নবযুগের আদর্শ।

আজ যুদ্ধের কবল থেকে মানুষের মন মুক্ত হ'ল। আজ শান্তি তাহার প্রাণের দেবতা, শান্তি তাহার এক মাত্র চিন্তার বিষয়, শান্তি তাহার লক্ষ্য, শান্তিবিধান তাহার জীবনের একমাত্র কার্য্য। আজ মানুষ নিশ্চিন্ত হ'য়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষায়. কর্ম্মে, তার সমস্ত মন দিতে পারবে। প্রত্যেক বিষয়ে সে উন্নতি করবার সুবিধা ও সুযোগ পেল। জগতে আজ অনন্ত উন্নতির যুগ এল।

এই যে নবযুগ তাহা কি? নবযুগ কেন আসে? কোথা হতে আসে?

জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। জগতে অহরহ পরিবর্ত্তন ঘটছে। এই পরিবর্ত্তন শুধু পৃথিবীতে নয়, তাহা চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদিতেও। এই পরিবর্ত্তন শুধু নরলোকে নয়, ইহা

সপ্তলোকব্যাপী। একই সঙ্গে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্ত্তন ঘটছে। সমগ্র বিশ্ব এক এবং অখণ্ড। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, আকাশ, পাতাল, পৃথিবী, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাদি, অনন্তনক্ষত্ররাজি, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ সমস্ত মিলিয়ে একই বিরাট দেহ। প্রত্যেক অঙ্গের সঙ্গে প্রত্যেক অঙ্গের যোগ রয়েছে। প্রত্যেকের উপর প্রত্যেকের প্রভাব পড়ছে। একের পরিবর্ত্তনে অন্যের পরিবর্ত্তন ঘটছে।

জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা ক'রলে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই, বহিঃপ্রকৃতিতে এবং মানবের অন্তর প্রকৃতিতে, ব্যষ্টি এবং সমষ্টিভাবে, সমস্ত মানব জাতির জীবনে যাহা কিছু ঘটছে, ক্ষুদ্র বৃহৎ মানুষের সমস্ত চিন্তা, ইচ্ছা, ও কার্য্যের উপর গ্রহাদির প্রভাব আছে। আর গ্রহাদি প্রতি মুহূর্ত্তে সেই শ্রীভগবানের বিরাট ইচ্ছানুসারে চলছে। সর্ব্বত্রই তাঁহার ইচ্ছা জয়যুক্ত হতেছে। এই নবযুগে পৃথিবীর বহু নরনারীর প্রাণে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মাবে, এই শাস্ত্রজ্ঞান তাঁদের ভিতর ফুটে উঠবে।

এই নবযুগে সৃষ্টির অত্যদ্ভুত রহস্যের দ্বার শ্রীভগবান মানুষের সম্মুখে খুলে দিচ্ছেন। তাঁহার বিরাট ইচ্ছাই স্থূলে সূক্ষ্মে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কার্য্য করছে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে তিনি মানবজাতিকে কোনও এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ'ড়ে তুলছেন। কোনও এক লক্ষ্যের দিকে মানবজাতিকে নিয়ে চলেছেন। সেই লক্ষ্য কি তাহা মানুষ জানে না। এই যুগে জানবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তাঁহার এক মহানাটকাভিনয় চ'লছে। এই মহানাটকের এক ক্ষুদ্র অংশ অভিনীত হচ্চে

এই পৃথিবীতে, পৃথিবীর নরনারীকে অবলম্বন ক'রে। অভিনয় সুন্দর হয় তখন যখন মূলের সঙ্গে যোগ রেখে, প্রত্যেকটী অংশ সেই মূল অভিনয়কে ফুটিয়ে তুলে। প্রত্যেকটী অংশ সুন্দর হয় তখন যখন প্রত্যেক অভিনেতা, মূল অভিনয়ের উদ্দেশ্যটি হৃদয়ঙ্গম ক'রে, সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে নিজের সত্তাকে, নিজের ব্যক্তিত্বকে মিশিয়ে দিয়ে, সহজ ভাবে, নিজের নিজের অংশ অভিনয় ক'রে যায়। মানবজাতির জীবনে যে অংশটী অভিনীত হচ্চে তাতে প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক নরনারীর এক একটী অংশ রয়েছে। এই অভিনয়ে কেহ বাদ নাই, সকলকে নিয়ে এই অভিনয়। প্রত্যেক নরনারীর জীবন ভিন্ন, কিন্তু প্রত্যেকের জীবন মানবীয় এই নাটকাভিনয়কে ফুটিয়ে তোলবার জন্য। এই নাটকাভিনয়ে কোন্ ব্যক্তি কোন্ অংশ গ্রহণ ক'রবে তাহা ব'লে দিচ্চে জ্যোতির্বিজ্ঞান।

নবযুগের মানুষ তার ভবিতব্য জেনে ম্রিয়মান হবে না। মানুষ ম্রিয়মান হয় তখন যখন বিপদ আপদের পশ্চাতে; দুঃখ দুর্ঘটনার পশ্চাতে সে শ্রীভগবানের মঙ্গলহস্ত দেখতে পায় না। যখন সে অজ্ঞান, যখন সে ভাবে সে জগতে একা, শক্তিহীন, আর অজ্ঞাত এক শক্তি তাকে অযথা পীড়ন ক'রতে উদ্যত। সে মৃত্যুভয়ে ভীত হয় তখন যখন মৃত্যুর পরপারে যে জ্যোতির্ম্ময় লোক আছে তার সন্ধান সে জানে না। মৃত্যুকে সে বিভীষিকা মনে করে তখন যখন অজ্ঞানতাবশতঃ, যে অমৃতময় পুরুষ মৃত্যুর দুয়ার দিয়ে তাকে অমৃতলোকে নিয়ে যান তাঁকে সে দেখতে পায় না। মানুষ মনে করে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার

সব শেষ হয়ে যাবে। এই নরজীবন যে তার অনন্ত জীবনের একটী মাত্র, মৃত্যু এক স্থান থেকে তাকে অন্যস্থানে নিতেছে মাত্র, এই জ্ঞান তার জাগ্রত নয়। মৃত্যুর পরপারে কি রয়েছে তাহা সে জানে না, তার কাছে তাহা অনিশ্চিত, অনির্দ্দিষ্ট, সম্পূর্ণ অজানা। নিশ্চিত ছেড়ে অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে তার মন চায় না, সম্পূর্ণ অজানা স্থানে যেতে তার মনে শঙ্কা জাগে।

এই নবযুগে প্রতি নরনারী শ্রীভগবানকে লাভ করবে, প্রতি নরনারীর ভিতর ব্রহ্মজ্ঞান ফুটে উঠবে, প্রতি নরনারী ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হবে। এই সত্যযুগে ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হবে। এই নবযুগে, শ্রীভগবানের ইচ্ছাতে, মানুষ মৃত্যুভয়কে জয় করবে, পরলোকের যবনিকা তার দৃষ্টির সম্মুখ হতে অপসারিত হয়ে যাবে, স্থূল এবং সূক্ষ্ম লোকের যোগ হবে, শরীরী এবং অশরীরীদের মিলন হবে, তাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হবে, অশরীরী মুক্তাত্মাদের উচ্চ জ্ঞান এবং শুভ বুদ্ধি মানুষ গ্রহণ ক'রে জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করবে।

অভিনয়ে মানুষ সুখভোগ করছে, দুঃখও ভোগ করছে, মানুষের মৃত্যুও ঘটছে। কিন্তু যারা অভিনয় করছে তারা জানে এ তাদের অভিনয় মাত্র। তারা জানে সুখ ও প্রকৃত তাদের সুখ নয়, দুঃখ ও প্রকৃত তাদের দুঃখ নয়, মৃত্যু ও তাদের প্রকৃত মৃত্যু নয়। বাহিরে সুখ ভোগের অভিনয় করলেও তারা ভিতরে স্থির থাকে, বাহিরে দুঃখ ভোগের অভিনয় দেখালেও তাদের অন্তর ম্রিয়মান হয় না। যে মৃত্যুর অভিনয় করে সে জানে এ তার মৃত্যু নয়, পরক্ষণেই অন্য দৃশ্যে অন্যভাবে সে অভিনয় করবে।

এই সত্যযুগে, শ্রীভগবানের ইচ্ছাতে এই অমৃতজ্ঞান ফুটে উঠছে। জীবের অমৃতআঁখি লাভ হচ্চে। তার 'আমিত্ব' সঙ্কুচিত ক'রে দেওয়া হচ্চে। ভিতরে, বাহিরে, লৌকিক, অলৌকিক, মানুষের দুঃখের কারণগুলি দূর ক'রে তাকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদানের ব্যবস্থা হচ্চে।

প্রাচ্যে হিন্দু মুনিঋষিরা ভগবৎ কৃপায় অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সাহায্যে গ্রহউপগ্রহ নক্ষত্রাদি পৃথিবীর উপর এবং পৃথিবীর নরনারীর জীবনের উপর, এমন কি পশুপক্ষী, লতাগুল্ম, শস্য খাদ্যাদি, ধাতুমনিমুক্তা দ্রব্যাদির উপরও কি প্রভাব বিস্তার করে তাহা জানতে পেরেছিলেন। আর প্রতীচ্যে, আর একদিক দিয়ে, বহু বৎসর ধ'রে পর্য্যবেক্ষণের ফলে পাশ্চাত্য জ্যোতিষীগণ প্রায় একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন। মানবজাতির উন্নতি, অবনতি, সুখদুঃখ চক্রাকারে ঘুরছে। এই চক্রকে হিন্দু মুনি-ঋষিরা চার ভাগে ভাগ করেছেন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। এক এক যুগে মানুষের এক এক শিক্ষা হচ্চে; প্রত্যেক শিক্ষাই তার প্রয়োজন। প্রত্যেকটিই তাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে চলেছে। কলির পর পুনরায় সত্য।

এই সত্যযুগ কবে আসবে মুনিঋষিরা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সাহায্যে তাহা জেনেছিলেন। এই সত্যযুগের কথা শুকদেব গোস্বামী বলে গিয়েছেন শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ সর্গের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, চতুর্ব্বিংশতি শ্লোকে :—

"যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা তিষ্য বৃহস্পতি
একরাশৌ সমেষ্যন্তি ভবিষ্যতি তদা কৃতম"।

চন্দ্র, সূর্য্য এবং পুষ্যা নক্ষত্রগত বৃহস্পতি যে দিন এক-

রাশিতে সমবেত হবেন সেইদিন পুনরায় সত্যযুগের উৎপত্তি হবে।

বাংলা ১৩২৬ সালের ১১ই শ্রাবণ, রবিবার, অমাবস্যার দিন (ইং ২৭শে জুলাই, ১৯১৯) এই যোগ * হয়েছিল।

পাশ্চাত্য জ্যোতিষীগণ এ যুগকে Aquarian Age (কুম্ভরাশির যুগ) বলেছেন। তাঁরা বলছেন সূর্য্য তাঁহার বক্রগতিতে (retrograde motion) মীন রাশি হতে কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করবেন। এই যুগে জগতে ভ্রাতৃভাব ফুটে উঠবে, সেবাকে মানুষ জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত বলে মনে করবে, এ যুগ স্ত্রীজাতির মুক্তির যুগ।

১৩২৬ সালের ১১ই শ্রাবণ অরুণাচল জগতে সত্যযুগের আবির্ভাব ঘোষণা ক'রল। দেশে বিদেশে পূর্ব্বে পশ্চিমে অরুণাচল সত্যযুগের আগমন বার্ত্তা প্রচার ক'রল। † মিশনের আশ্রমগুলিতে সেই দিন থেকে সত্যযুগের উৎপত্তির দিনে সেবকসেবিকারা উৎসব করে থাকেন। সত্যের বাহক তাঁরা, পরিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁরা সত্যযুগকে আবাহন ক'রে নিলেন।

এই সত্যযুগে ব্যষ্টি এবং সমষ্টিভাবে সমস্ত মানবজাতির জীবনের ধারার পরিবর্ত্তন হবে। অতীত চার যুগের শিক্ষাদীক্ষা,

---

* শ্রীধর স্বামী টীকাতে উল্লেখ করেছেন, প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এই যোগ হয়, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। (১) ১৩১৫, ১৩ই শ্রাবণ রবি চন্দ্র বৃহস্পতির এক রাশিতে যোগ হয়েছিল কিন্তু পুষ্যানক্ষত্রে নহে। (২) ১৩০৩ সালে ২৫শে শ্রাবণ এই যোগ হলেও পুষ্যানক্ষত্রে হয় নাই। (৩) ১২৯১ সালে এ যোগ আদৌ হয় নাই। (৪) ১২৭৮, ২রা শ্রাবণ এই যোগ হয়েছিল কিন্তু বৃহস্পতি তখন মিথুনরাশিতে, সুতরাং পুষ্যানক্ষত্রে নহে।

† The Master's World-Union Scheme, 1921.

জ্ঞান বিদ্যা সবই থাকবে, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে, সত্যের আলোকে আলোকিত হয়ে সব পূর্ণতা লাভ করবে। অতীত চার যুগের সাধনার সিদ্ধিলাভ এই যুগে। এই সত্যযুগের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করাই দয়ানন্দের কার্য্য। এই সত্যযুগের শিক্ষা দীক্ষা তিনি বাইশ বৎসর ধ'রে দিয়ে এসেছেন। আজ সত্যযুগের প্রভাতে তিনি বিশ্ববাসীকে এই সত্যযুগের স্কীম দিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

স্কীমের মূলতত্ত্ব

স্কীমের ভিত্তি—শ্রীভগবান

এতদিন এই জগৎ কি ভাবে চলছিল? জগৎ চলছিল শ্রীভগবানকে ভুলে। মানুষ ভাবছিল এই দুনিয়ার মালিক সে। ধর্ম্মকে সে ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতর পুরেছিল, শ্রীভগবানকে সে মন্দির, মসজিদ এবং গির্জ্জার ভিতরেই রেখে এসে বাহিরের জগতে, নিজে কর্ত্তা সেজে নিজের আধিপত্য বিস্তার করছিল। সে ভাবছিল ভগবান যদি কেহ থাকেন তিনি তাঁর স্বর্গেই আছেন, আর এই মর্ত্ত্যধামে সেই রাজা। জড়বিজ্ঞানের উন্নতি ক'রতে ক'রতে, আশ্চর্য্য কল-কব্জার আবিস্কার ক'রতে ক'রতে তার ধারণা হয়েছিল সেই বুঝি দ্বিতীয় ঈশ্বর। সে ভাবছিল সমস্ত মানবীয় ব্যাপারে সেই কর্ত্তা। তার ইচ্ছামত সে ভাঙ্গা-গড়া করছিল, মানবজাতির সুখদুঃখ নিয়ে সে খেলা করছিল। তার নিয়ামক একজন কেহ আছেন, তার ইচ্ছার উপর আর এক ইচ্ছা আছে, এ জ্ঞান তার মলিন বা লোপ হয়ে গিয়েছিল। মানবের এই আত্ম-কর্ত্তৃত্বের চরম পরিণতি এই ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধের ভীষণ আঘাত তার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন হয়েছিল— তার চমক ভেঙ্গে দেবার জন্য, তার ভুল তাকে বুঝাবার জন্য,

যে পথ দিয়ে সে চলছিল সে পথ থেকে তাকে নিবৃত্ত ক'রে নূতন পথে তাকে চালিত করবার জন্য। তার অভিমান এতই স্ফীত হয়ে উঠেছিল যে ভগবানের কাছে ও সে নত হতে চাচ্ছিল না। মানুষের এই আমিত্বের প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন হয়েছিল। তাই এই মহালোকক্ষয়কারী যুদ্ধ।

স্কীমের মূল শ্রীভগবান। দয়ানন্দ মানুষের প্রাণে বহুদিনের সেই পুরাণো কথা জাগিয়ে দিলেন। তিনি মানুষকে বল্লেন, এ জগৎ মানুষের নয়, শ্রীভগবানের। মানুষের আত্মকর্ত্তৃত্ব এখানে চলবে না। মানুষ এখানে যা কিছু করবে সব শ্রীভগবানের যন্ত্ররূপে, তাঁহারই কর্ম্মচারীরূপে, তাঁহারই প্রীত্যর্থে। এখানে যা কিছু কর্ম্ম হবে সব শ্রীভগবানকে লক্ষ্য ক'রে, যা কিছু প্রতিষ্ঠান মানুষ গ'ড়বে তাহা হবে একমাত্র ভগবৎ ভিত্তির উপর। না হ'লে তার সমস্ত চেষ্টা ভেসে যাবে, তার কর্ম্মের সৌধ ধূলিতে গড়াগড়ি যাবে। এখানে মানুষ চিন্তা ক'রবে শ্রীভগবানের, বাক্য তার হবে শ্রীভগবানের প্রেমের গান, কর্ম্ম হবে অসংখ্য নররূপী শ্রীভগবানের সেবা। এখানে মানুষ সর্ব্বস্ব শ্রীভগবানকে সমর্পণ ক'রবে। আর যাহা কিছু সে ভোগ করবে—শ্রীভগবানের হাত থেকে, তাঁহার দয়ার দান-রূপে। শান্তি যদি তার কাম্য হয় তবে সর্ব্বাগ্রে তাকে আত্ম-সমর্পণ ক'রতে হবে শান্তিদাতা শ্রীভগবানের চরণে।

দয়ানন্দ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, এ জগৎ সয়তানের নয়, এ দেবতার। এ পাপের নয়, পুণ্যের, এ অন্যায়ের নয়, ন্যায়ের, এ অধর্ম্মের নয়, ধর্ম্মের জগৎ; অপ্রেমের এখানে স্থান

নাই, এ জগৎ শ্রীভগবানের প্রেমের রাজ্য। মানুষ এখানে মানুষকে ঘৃণা ক'রে দূরে রাখবে না, ভাই ব'লে প্রেমভ'রে তাকে আলিঙ্গন ক'রবে। মানুষ এখানে পরের মুখের অন্ন কেড়ে নিবে না, নিজের অন্ন পরকে দিয়ে সে প্রাণের ক্ষুধার নিবৃত্তি ক'রবে। মানুষ এখানে পরের বস্ত্র কেড়ে নিয়ে নিজেকে সুখী করবার চেষ্টা ক'রবে না, মানুষ এখানে পরকে খাইয়ে পরিয়ে তার নিজের প্রাণের নগ্নতা দূর করবে। দয়ানন্দ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিলেন এই জগৎ শ্রীভগবানের। শ্রীভগবানের ব'লে তিনি বহুদিন পরে আবার এই জগতকে দাবী করলেন। এ রাজ্যের রাজা স্বয়ং শ্রীভগবান, সমস্ত নরনারী তাঁহার এই প্রেমরাজ্যের প্রজা। শ্রীভগবান সকলের পিতা, সমস্ত নরনারী—তাঁহার এই প্রেমপরিবারের লোক। এ ভ্রাতৃরাজ্য, ভেদ এখানকার নীতি নয়, মিলনই হচ্ছে এখানকার নীতি। এ রাজ্যে কর্ম্মের ধারা পরস্পরনিরপেক্ষ হয়ে—একা একা নয়, এখানে কর্ম্ম করতে হবে পরস্পরে হাত ধরাধরি ক'রে, গলাগলি ক'রে। এখানে মানুষ সুখী হবে না একজন অপরকে অসুখী ক'রে, এখানে মানুষ সুখ আহরণ করবে সকলের সুখের মাত্রা বাড়িয়ে, এ রাজ্যে মানুষ আপনাকে বড় ক'রে পাবে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে। এ রাজ্যে ভাই ভাইয়ের রক্তে স্নান করবে না, ভাই ভাইয়ের হাত ধ'রে প্রেমনদীতে অবগাহন করবে, নিজে ভেসে যাবে, অপরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এ রাজ্যে প্রতিযোগিতা পার্থিব সম্পদ নিয়ে নয়, এ রাজ্যে প্রতিযোগিতা আত্মদানে। শ্রীভগবানের এই প্রেমরাজ্যের ছবি দয়ানন্দ মানুষের প্রাণের উপর এঁকে দিলেন। ধরাতলে এই স্বর্গরাজ্য

স্থাপনের সঙ্কল্প—মানুষের প্রাণে জাগিয়ে দিলেন। যুগসন্ধিক্ষণে—পৃথিবীর সমস্ত নরনারীকে দয়ানন্দ এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করলেন।

এতদিন জগতের কর্ম্মধারা চ'লছিল একজন অপরকে বাদ দিয়ে, একা একা। মানুষ নিজের চতুঃপার্শ্বে নিজের জগৎ সৃষ্টি ক'রে বসেছিল, আপন ক্ষুদ্র জগতের কর্ম্ম আবর্ত্তনে সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, নিজের সুখদুঃখের সৃষ্টি করছিল। অহরহ তাই—অপরের সঙ্গে তার স্বার্থের সংঘর্ষ বাঁধছিল। পরস্পরের এই সংঘর্ষের ফলে পরস্পরের শক্তিক্ষয় হচ্ছিল, সুখ না হয়ে প্রত্যেকের দুঃখের মাত্রা, ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি বাড়ছিল। জগৎ এতদিন চলছিল নাবিকহীন তরণীর মত ভেসে ভেসে। ব্যষ্টি এবং সমষ্টিভাবে মানবজাতি চ'লছিল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে। দয়ানন্দ জগতকে বললেন শ্রীভগবানকে নাবিক ক'রে সে তার জীবনতরী বেয়ে চলুক। দয়ানন্দ আজ জগতের সমস্ত নরনারীর জীবনের লক্ষ্য স্থির ক'রে দিলেন—ধরাতলে স্বর্গরাজ্য স্থাপন। প্রতি নরনারীর ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জগতের প্রাকার ধুলিসাৎ ক'রে দিয়ে সকলকে তিনি এক বিশাল জগতে এনে দিলেন।

স্কীমে বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব স্থাপন

এই জগত-সৃষ্টির পিছনে রয়েছে শ্রীভগবানের ইচ্ছা। তিনি ইচ্ছা করলেন জগত-সৃষ্টি, জগৎ সৃষ্ট হ'ল। তিনি ইচ্ছা করলেন এক আমি বহু হইব, বহু রূপ-পরিগ্রহ করলেন। তিনি প্রতিনিয়তই ইচ্ছা করছেন। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের পিছনে রয়েছে নিত্য নূতন তাঁরই ইচ্ছা। সৃষ্টির জন্ম

শ্রীভগবানের মনে, তাঁরই চিন্তায়, তাঁরই ভাবে, তাঁরই ইচ্ছাতে।

মানুষের মনের সঙ্গে শ্রীভগবানের মনের কি সম্বন্ধ? মানুষের চিন্তা, তার ভাব কোথা থেকে আসে? তার ইচ্ছা কেন হয়? শ্রীভগবান কি মানুষকে সৃষ্টি ক'রে তাকে স্বাধীন ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন তার নিজের ইচ্ছামত চ'লতে? জগৎ কি সত্যই অরাজক? না, জীবলোকের সমস্ত চিন্তার মধ্যে, সমস্ত ভাবধারার মধ্যে, সমস্ত কর্ম্মধারার মধ্যে একটা প্রণালী, একটা পদ্ধতি রয়েছে। সমস্ত অসামঞ্জস্যের ভিতর একটা সামঞ্জস্য রয়েছে? আপাতদৃষ্টিতে তাহা ধরা না পড়লেও নরলোকের সমস্ত কার্য্য পরম্পরার মধ্যে একজনেরই হাত সুস্পষ্ট। নরলোকের সমস্ত কর্ম্মধারার ভিতর একটি উদ্দেশ্য পরিস্ফুট।

জগৎ সৃষ্টি ক'রে শ্রীভগবান মানুষকে স্বাধীন ক'রে দেন নাই। মানুষকে যন্ত্র ক'রে তিনিই কাজ করছেন। মানুষের মনের উপর রয়েছে তাঁহার মন। মানুষের চিন্তা তাঁরই এক বিরাট চিন্তার অংশগত। প্রতি ভাবের পিছনে রয়েছে শ্রীভগবানেরই ভাব। মানুষের প্রত্যেক ইচ্ছার মূলে রয়েছে তাঁর ইচ্ছা। মানুষ যাহা চিন্তা করে, যাহা কিছু বলে, যাহা কিছু ভাঙ্গে, যাহা কিছু গড়ে, সমস্তেরই পিছনে রয়েছে এক শ্রীভগবানেরই চিন্তা।

এই পরিবর্ত্তনশীল লীলার জগতে, পরিবর্ত্তন ঘটছে চিন্তার পরিবর্ত্তন ক'রে। আগে আসছে চিন্তা ও ভাব, তার পর আসছে বাক্য,—পরে তদনুযায়ী কর্ম্ম হচ্চে।

জগতের অধিকাংশ লোকই গতানুগতিক জীবন যাপন

করে। তারা চলেছে জীবনস্রোতে ভেসে। তারা চিন্তা করে না, তাদের সে শিক্ষা নাই। আর মানুষের অব্যবস্থার ফলে যে সমাজব্যবস্থা গ'ড়ে উঠেছে তাতে মানুষকে চিন্তা করবার অবসর ও দেয় না। অন্নবস্ত্রসমস্যাতেই তার সবখানি চিন্তা ব্যয় হয়ে যায়। সকলের সব বিষয় চিন্তা করবার শক্তি ও নাই। লীলার জন্য শ্রীভগবান সব মনকে একই ধারণা শক্তি দেন নাই। তিনি একটী মন দিয়ে বহুলোকের মনকে প্রভাবান্বিত করেন, একজনের চিন্তা দিয়ে বহুলোকের চিন্তাকে গ'ড়ে তোলেন, একজনের জীবন দিয়ে বহুলোকের জীবনধারাকে পরিবর্ত্তিত করেন, একজনের কর্ম্ম দিয়ে বহুলোকের কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করেন। ইহা আমরা সদা সর্ব্বদা চোখের উপর দেখতে পাচ্চি। ইহা অস্বীকার করবার যো নাই।

পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর মন যদি একই স্তরে থাকৃত, তাদের বৃত্তিগুলি, তাদের প্রকৃতি যদি একই রকম হ'ত, তাদের কর্ম্মও একই প্রকার হয়ে যেত। তাতে বৈচিত্র্য থাকৃত না, মাধুর্য্য থাকৃত না, নূতনত্ব থাকৃত না। তাই ভগবান বহুকে স্বষ্টি করেছেন বিভিন্ন শক্তি, বিভিন্ন প্রকৃতি, বিভিন্ন ভাব দিয়ে। কাহাকেও বুদ্ধিমান, কাহাকেও অল্পবুদ্ধি সাজিয়েছেন, কাহাকেও গুরু, কাহাকেও শিষ্য সাজিয়েছেন, কাহাকেও নেতা করেছেন, কাহাকেও সহচর সাজিয়েছেন। তাতেই বৈচিত্র্য আছে। এই বৈচিত্র্য না থাকলে লীলা থাকে না, লীলা না থাকলে জগৎ থাকে না।

লীলার জন্য বৈচিত্র্য থাকা দরকার। আবার সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব থাকা দরকার। জগতকে যদি কেবল বৈচিত্র্যের

হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় তা'হলে জগৎ অরাজক হয়ে দাঁড়াবে, মানবকুলের ধ্বংস উপস্থিত হবে। সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠা না করলে, বৈচিত্র্যই বৈচিত্র্যের ধ্বংস সাধন ক'রবে। বৈচিত্র্যের অর্থ এমন নয় যে প্রত্যেক নরনারী স্বতন্ত্র। প্রত্যেকের একটা ব্যক্তিত্ব আছে, সেখানে মানুষ নিজের নিজের ভাবে গ'ড়ে উঠবে, সেখানে অপরে তার স্বাধীনতার উপর হাত দেবে না। কিন্তু আবার জগতে একটী মাত্র মানুষ নয়, বহুমানব, বহু নরনারী, প্রত্যেককেই জগতে বিচরণ ক'রতে হবে; সকলকে নিয়ে একটি মহানাটক অভিনয়। প্রত্যেকের চিন্তার সঙ্গে প্রত্যেকের চিন্তার, প্রত্যেকের কর্ম্মের সঙ্গে প্রত্যেকের কর্ম্মের যোগ থাকা চাই, প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে প্রত্যেকের জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা চাই। সমস্ত বিভিন্ন অভিনয়গুলি একই অখণ্ড অভিনয়কে ফুটিয়ে তুলবে। প্রত্যেক নরনারীর কর্ম্ম হবে বিভিন্ন, কিন্তু সমস্ত কর্ম্মের গতি হবে একই দিকে। তা' না হয়ে প্রত্যেকের কর্ম্ম যদি পরস্পরকে খণ্ডিত ক'রে যায়, তাতে জগতে বিশৃঙ্খলা আস্‌বে, অশান্তি আস্‌বে, পরস্পরের শক্তি হ্রাস হবে, সমস্ত মানবজাতির উন্নতি বন্ধ হয়ে যাবে। পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর কর্ম্ম বিভিন্ন হ'লেও সমস্ত বিভিন্ন কর্ম্মের ভিতর একটি সামঞ্জস্য থাকা চাই। সবগুলি কর্ম্মধারা চলবে সমান্তরাল রেখায়, এক বিরাট লক্ষ্যাভিমুখে—মানব জাতি সম্বন্ধে শ্রীভগবানের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সাধনের দিকে। বৈচিত্র্যকে যেমন মুছে ফেলবার চেষ্টা করা বাতুলতা, তেমনি এই একত্বকে ও ভুললে মানুষের সর্ব্বনাশ হবে।

যাহা একই বিরাট চিন্তায় মানবজাতিকে অনুপ্রাণিত ও জগতের কর্ম্মধারাকে একমুখী করিল

এতকাল ধ'রে যে মানবীয় সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছে তাহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক। প্রত্যেক ব্যক্তিই বিচ্ছিন্ন, প্রত্যেকে দেখছে প্রত্যেকের স্বার্থকে বিভিন্ন ক'রে, প্রত্যেকে চলেছে স্ব স্ব স্বার্থ সাধন ক'রতে। তা'তে পরস্পর পরস্পরের স্বার্থকে খণ্ডিত ক'রেই চলেছে। পরস্পর পরস্পরের শক্তিকে সংহত করছে। জগৎ তাতে অশান্তিতে ভ'রে উঠেছে। ভেদ চরমসীমায় গিয়ে পৌঁচেছে। আজ জাতিতে জাতিতে ভেদ, শ্রমিকে ধনিকে ভেদ, ধনী নির্ধনে ভেদ, শিক্ষিতে অশিক্ষিতে ভেদ, স্ত্রী-জাতিতে পুরুষ-জাতিতে ভেদ, পিতাপুত্রে ভেদ, পিতামাতায় ভেদ, ভাইয়ে ভাইয়ে ভেদ। এই অবস্থায় মানবজাতি বেশী দিন চললে তার ধ্বংস অনিবার্য্য। মানবজাতির একান্ত আবশ্যক হয়েছে মিলন, সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব স্থাপন। আজ জগতের নরনারীর শত বিভিন্নতা সত্ত্বেও, মানবের সমস্ত কর্ম্ম-ধারার মধ্যে এই একত্ব স্থাপন করতে হবে। কর্ম্মের এই একত্ব আসতে পারে সমস্ত মানবজাতিকে একই ভাবে অনুপ্রাণিত করলে। এক মূল চিন্তা ধ'রে সকলে চললে। আজ সমস্ত মানবজাতির সামনে এমন একটী আদর্শ স্থাপন ক'রতে হবে, যাহা প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতি, তাদের জীবনের আদর্শ ব'লে সানন্দে গ্রহণ ক'রতে পারে, যাতে সকলের পার্থিব স্বার্থের এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য হয়।

আজ জগতের সর্ব্বপ্রধান অভাব চিন্তার ও ভাবের

একত্ব। এই একত্ব সাধন ক'রতে হলে, লৌকিক জগতে, একজন মাত্র অতিমানবের মনের ভিতর দিয়ে এই চিন্তা আসা দরকার। তা' না হ'লে একত্ব থাকে না। সে কি রকম মন? যে মন পৃথিবীর কোটী কোটী নরনারীকে এক ভাবতে পেরেছে, যে মন জাতিবর্ণ—স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকে সমান ভাবে গ্রহণ ক'রতে পেরেছে, সকলের স্বার্থকে এক ক'রে দেখতে পেরেছে। আজ জগতের প্রয়োজন এমন একজন নেতার যিনি কোনও একটী দেশের নন, যিনি সমস্ত মানবজাতির, যিনি মানবজাতির ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সবই জানেন। আজ জগতের চাই এমন একটি আধার যাঁর ভিতর শ্রীভগবানের বিরাট ইচ্ছা অবতরণ ক'রতে পারে, যাঁর ভিতর দিয়ে শ্রীভগবানের বিরাট চিন্তা মানবীয় জগতে রূপ পরিগ্রহ ক'রতে পারে। যে মনকে চালিত ক'রে শ্রীভগবান সমস্ত মানবমনকে চালিত করবেন। প্রত্যেক দেশে নেতারা তাঁদের চিন্তা দিয়ে, তাঁদের ভাব দিয়ে সেই সেই দেশের লোকের চিন্তা ও ভাব গ'ড়ে তুলে প্রত্যেক দেশের লোককে চালিত করছেন। কিন্তু জগতের আজ প্রয়োজন একজন পরম-নেতার যিনি অখণ্ড মানব জাতির কল্যাণকর এক বিরাট চিন্তা দিয়ে এই সকল নেতাদের মনকে চালিত ক'রে সমস্ত দেশের, সমস্ত মানবজাতির চিন্তা ভাব ও কর্ম্ম-ধারার ভিতর একত্ব স্থাপন করবেন, পৃথিবীর সমস্ত নরনারীকে এক লক্ষ্যাভিমুখে চালিত করবেন।

মানবজাতি এক প্রেমপরিবার

এই স্কীমের ভিতর দিয়ে দয়ানন্দ চাইলেন সমস্ত মানব-

জাতিকে একটি প্রেমপরিবারে পরিণত করতে। শ্রীভগবান এই পরিবারের কর্ত্তা, পৃথিবীর সমস্ত নরনারী এই পরিবারের লোক। পরিবার যেমন কর্ত্তার নির্দ্দেশ অনুসারে চলে, এই মহামানবপরিবারও চলবে জগতে একমাত্র কর্ত্তা শ্রীভগবানের নির্দ্দেশ অনুসারে। যে আদর্শে দয়ানন্দ তাঁহার আশ্রম স্থাপন করেছিলেন, সেই আদর্শ জগতে স্থাপন ক'রে তিনি মানবজাতিকে এক বিশাল আশ্রমে পরিণত করতে চাইলেন। পরিবারের ভিতর যেমন শিক্ষিত, অশিক্ষিত, জ্ঞানী, মূর্খ, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই স্থান আছে, এই মানব-পরিবারেও পৃথিবীর সভ্য অসভ্য, শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত সকলেরই স্থান আছে। পরিবারের প্রত্যেকটি লোক যেমন নিজের নিজের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ক'রে যায়, নিজের জন্য নয়, সমস্ত পরিবারের জন্য, এই মানব-পরিবারের সমস্ত নরনারীও ব্যষ্টি এবং সমষ্টিভাবে নিজ নিজ কাজ ক'রে যাবেন নিজের জন্য নয়, সমস্ত মানবজাতির জন্য। পরিবারের একজনের জ্ঞানবুদ্ধি শিক্ষা যেমন সমস্ত পরিবারের উপকারে আসে, একজনের কর্ম্মের ফল যেমন সমস্ত পরিবারের লোক ভোগ করে, এই মহামানবপরিবারেও একটি লোকের, একটি জাতির জ্ঞানবুদ্ধিশিক্ষার ফল, একটি লোকের বা একটি দেশের কর্ম্মের ফল, মানবপরিবারের সমস্ত লোক ভোগ করবে। একই পরিবারের ভিতর যেমন ইতরভদ্র নাই, প্রত্যেকের মানসিকবৃত্তি প্রভৃতির প্রভেদ সত্ত্বেও যেমন সকলে এক, তেমনি এই মানব-পরিবারেও ইতরভদ্র, বড়লোক ছোটলোক, প্রভুভৃত্য, কোনও রূপ আভিজাত্য থাকবে না। সকলেই যে একই পিতার সন্তান, একই পরিবারের লোক।

এক পিতার সন্তানদের মধ্যে, এক পরিবারের লোকদের মধ্যে আবার আভিজাত্য কি? মানসিকবৃত্তি হিসাবে, শারীরিক যোগ্যতা হিসাবে প্রত্যেকেরই কর্ম্ম বিভিন্ন হবে, কিন্তু কর্ম্মের বিভিন্নতা মানুষের কাছ থেকে মানুষকে দূরে রাখবে না। একজন শিক্ষিত, মার্জ্জিতবুদ্ধি জ্ঞানী লোকের এবং একজন চাষীর বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রভেদ থাকলেও, তাদের কর্ম্ম বিভিন্ন হলেও, দুজনেই একই পিতার সন্তান, একই পিতার উদ্দেশ্যে উভয়ে কর্ম্ম করবেন, উভয়েরই লক্ষ্য এক—সমস্ত মানবজাতির সুখসুবিধা বৃদ্ধি করা। পরিবারে যেমন ছোট ভাই বড় ভাই আছে, ছোট বড় হলেও তারা যেমন ভাই, তাদের ভিতর যেমন কোনও দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই, মানব-পরিবারেও তেমনি ছোট ভাই, বড় ভাই থাকবে কিন্তু তাদের মধ্যে কোনও দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান, কোনও আভিজাত্য থাকবে না, উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণী থাকবে না, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য থাকবে না।

সার্ব্বজনীন স্বাধীনতা

পরিবারের প্রত্যেক লোক যেমন স্বাধীন, কেহ কাহারও অধীন নয়, সকলে একমাত্র পিতার অধীন, এই মানব-পরিবারেও তেমনি প্রত্যেক পুরুষ, প্রত্যেক নারী, প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতি স্বাধীন, কেহ কাহারও অধীন নয়। এই স্বাধীনতার অর্থ এমন নয় যে কেহ কাহাকেও বাদ দিয়ে চল'তে পারে। প্রত্যেকে স্বাধীন আবার প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধীন। এ স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, স্বেচ্ছাচারিতা নয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ সীমার মধ্যে স্বাধীন, প্রত্যেকের স্বাধীনতার সঙ্গে

প্রত্যেকের স্বাধীনতার যোগ রয়েছে, একজন উচ্ছৃঙ্খল হতে চাইলে আর পাঁচজনের স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়।

আজ জগৎ জুড়ে এক মহা স্বাধীনতা সমর চলেছে। সমাজের এক শ্রেণী চাইছে আর এক শ্রেণীকে তাদের অধীন ক'রে রাখতে, ধনী চাইছে দরিদ্রকে তার অধীন রাখতে, ধনিকেরা চাইছে শ্রমিকদের তাদের অধীন রাখতে, এক দেশ চাইছে আর এক দেশকে তার অধীন রাখতে। ইংলণ্ডের ৪॥০ কোটী লোক চাইছে তাদের সুখ সুবিধার জন্য ভারতের ৩৩ কোটী লোককে তাদের অধীন ক'রে রাখতে। আমেরিকা চাইছে ফিলিপাইনকে পরাধীন ক'রে রাখতে, জাপান চাইছে কোরিয়াকে পরাধীন রাখতে, ফরাসী চাইছে মরক্কোকে, সিরিয়াকে, শ্যাম দেশকে তার অধীন রাখতে, হল্যাণ্ড চাইছে জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপবাসীদিগকে অধীন ক'রে রাখতে। আফ্রিকাকে ইউরোপীয় জাতিগুলি ভাগ ক'রে নিয়ে সেখানকার আদিম জাতিগুলিকে পদানত ক'রে রেখেছে। এতে কি জগতে শান্তি হতে পারে? এতবড় অন্যায় থাকতে জগতে শান্তি হতে পারে না। এই পরাধীনতা সমস্ত জগতেরই পরাধীনতা, যারা অধীন রয়েছে তাদের পরাধীনতা, যারা অধীন রেখেছে, তাদেরও পরাধীনতা। যারা অধীন রয়েছে তাদের প্রাণ এই পরাধীনতার চাপে নিষ্পেষ্ট, তারা স্বাধীন ভাবে, নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে গ'ড়ে উঠতে পারচে না। আর যারা অপরকে পরাধীন রেখেছে, তারা চলেছে ন্যায়ের বিরুদ্ধে, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে, ভগবৎ বিধানের বিরুদ্ধে। অপরের উপর অযথা কর্ত্তৃত্ব করতে করতে তাদের ও নৈতিক অধোগতি ঘটছে। দুই পক্ষের সংঘর্ষের ফলে জগৎ অশান্তিতে

ভ'রে উঠেছে। মানব-মন এই সংঘর্ষের উপরে উঠতে পারছে না, সমস্ত মানবজাতির নৈতিক এবং পার্থিব উন্নতি, সমস্ত মানবজাতির সুখসুবিধার বিস্তার স্থগিত হয়ে রয়েছে। দয়ানন্দ তাঁর স্কীমে সমস্ত মানবজাতির স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন,—প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা, প্রত্যেক শ্রেণীর স্বাধীনতা, প্রত্যেক নরনারীর স্বাধীনতা। মানবপরিবারে একটি মানুষও অপরকে অধীন রাখতে পারবে না। এই সার্ব্বজনীন স্বাধীনতার ভিত্তির উপর এই স্কীম প্রতিষ্ঠিত।

স্কীমে অশান্তির মূলোচ্ছেদ

জগতে এত অশান্তি, তার কারণ কি? একজন লোক আর একজনকে, এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীকে, এক দেশ আর এক দেশকে অধীন ক'রে রাখতে চাইছে কেন? পরিবারের ভিতর অশান্তি হয়, বিচ্ছেদ হয় কি নিয়ে? পরস্পরের স্বার্থ নিয়ে, পরস্পরের খাওয়া, পরা, থাকা, সুখসুবিধা নিয়ে। পরিবারের উপার্জ্জনক্ষম যাঁরা তাঁরা যদি নিজের নিজের উপার্জ্জিত ধন এনে কর্ত্তার হাতে দেন এবং কর্ত্তা যদি বিচক্ষণ, সমদর্শী হন, যদি তিনি প্রত্যেকের প্রয়োজন বিচার ক'রে প্রত্যেকের অন্নবস্ত্রের, প্রত্যেকের সুখসুবিধার ব্যবস্থা করেন তা' হলে আর কাহারও অশান্তির কারণ থাকে না। ক্ষুদ্র পরিবারেও যেমন, বৃহৎ মানবপরিবারেও তেমনি। একজন মানুষের স্বার্থ কতটুকু? খাওয়া, পরা, বাসের স্থান—এই হ'ল মানুষের প্রধান অভাব। এরই জন্য মানুষের প্রধান চিন্তা। ইহা না হলে সে বাঁচতে পারে না। এর উপরও যাহা

আছে তাহা হচ্চে শিক্ষা, অসুখ হলে চিকিৎসা, সুখসুবিধা, আরাম, বিলাস। কিন্তু এ সব মানুষের চিন্তার প্রধান বিষয় নয়, এ সবের জন্য সে জগতে অশান্তি ঘটাতে চাইত না যদি তার অন্নবস্ত্রবাসের সুব্যবস্থা থাকতো। আর এই শিক্ষা ইত্যাদি গৌণ বিষয়ের সুব্যবস্থা সহজেই হতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানের সাহায্যে, কলকব্জার সাহায্যে মানুষের এই যে সব গৌণ অভাব তাহা সহজেই পূরণ করা যেতে পারে। মানুষের প্রধান অভাব হচ্চে অন্নবস্ত্রবাসস্থানের সুব্যবস্থা। এর ভিতরেও মানুষের বাসস্থানের সুব্যবস্থা সহজেই হতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষই বস্ত্র পরিধান করে। জগতে যদি সুব্যবস্থা থাকে, তুলার চাষের বিস্তার হয়, অধিক পশম উৎপন্ন করা হয়, বস্ত্রশিল্পের উন্নতি করা হয়, তা'হলে জগতের লোকের বস্ত্রসমস্যাও সহজেই মীমাংসিত হয়ে যায়। জগতের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা অন্নসমস্যা। কিন্তু এই অন্নসমস্যাও প্রবল হতে পারে না যদি একদল লোক মানুষের এই জীবন ধারণের বস্তুকে লাভ লোকসানের বস্তু না করে, যদি একদল লোক তাদের নিজেদের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য সম্ভার ধ'রে না রাখে। পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক পেট ভ'রে খেতে পায় না। তার অনেকটাই এই সুব্যবস্থার অভাবে। জগতের সব লোকই যদি পেট ভ'রে খায় তা'হলেও জগতে খাদ্যের অভাব হতে পারে না। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, ব্রেজিল প্রভৃতি অনেক দেশ আছে যেখানে বহু পরিমাণে জমি পতিত পড়ে রয়েছে। এই সব জমি আবাদ ক'রলে বহু শস্য উৎপন্ন হতে পারে। আর বর্ত্তমান কালে প্রত্যেক

মানুষের স্বার্থ বিভিন্ন ব'লে, চাষী দেখে তার স্বার্থ, ব্যাপারী দেখে তার লাভটুকু, ক্রেতা দেখে তার স্বার্থ। সমাজের জীবন ধারণের বস্তু উৎপন্ন করার ভার যাদের হাতে সেই চাষীরা অশিক্ষিত, অজ্ঞ, দরিদ্র। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের উন্নতি করার শক্তি ও বুদ্ধি তাদের নাই। চাষী তার চাষ করে, সমাজের ইতরভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলে তাদের জীবন ধারণের প্রধান উপায় নিরক্ষর চাষীর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে মিথ্যা ব্যক্তিগত লাভলোকসানের পিছনে ঘুরে বেড়ায়।

বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ক'রে যদি মানবজাতিকে একটি পরিবারে পরিণত করা হয়, সকলের স্বার্থ মিলিয়ে দেওয়া যায়, তা' হলে এই চাষের উন্নতি বিধান করা হবে সমাজের সর্ব্বপ্রধান কাজ। যে সব বৈজ্ঞানিক উপায় মানুষ আবিষ্কার ক'রতে পেরেছে, তখন সে সমস্তই এই চাষের উন্নতিতে লাগাবার আর কোনও বাধা থাকবে না। উন্নত যন্ত্রপাতি, জলের সুব্যবস্থা, বীজের নির্ব্বাচন, পোকামাকড়ের, ইঁদুরের উপদ্রব নিবারণ ইত্যাদি সুপ্রণালীমত হলে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয়, তার দ্বিগুণ, তিনগুণ উৎপন্ন হতে পারে। আরও, বর্ত্তমান সময়ে, টাকার লোভে চাষী এমন সব ফসল উৎপন্ন করে যাহা মানুষের প্রধান প্রয়োজনে আসে না। প্রয়োজন হলে তার কতক কম ক'রে সেই সব ক্ষেত্রেও খাদ্যশস্য উৎপন্ন করা যেতে পারে। মানুষের শরীর সুস্থ এবং সবল রাখবার জন্য যে সব উপাদান প্রয়োজন তাহা অনেক পরিমাণে ফলমূলে আছে। এই ফল-মূলেরও উৎপাদন বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুব্যবস্থা ক'রে ক'রলে

মানুষের খাদ্যের অভাব হয় না। তা' ছাড়া খালখিল নদী নালা, সমুদ্রের মৎস্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃদ্ধি করবার ব্যবস্থা ক'রলে মানুষের খাদ্যের অভাব অনেক পূরণ হয়। আর বৈজ্ঞানিকরা বলছেন কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য (Synthetic food) উৎপাদন করার কথা, হাওয়া থেকে নাইট্রোজেন (nitrogen) নিষ্কাসন ক'রে নিয়ে মানুষের খাদ্যে পরিণত করার কথা। এ বিষয়ে গবেষণা চ'লছে। সুতরাং দেখা যাচ্চে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ পেট ভ'রে খেলে, পৃথিবীর লোক সংখ্যা খুব বৃদ্ধি হলেও মানুষের খাদ্যের অভাব কোনও দিনই হতে পারে না।

তা'হলে জগতে এ অশান্তি কেন? দরিদ্র তার উদরান্নের জন্য হাহাকার করে কেন? শ্রমিক তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও উপবাসী থাকে কেন? সমাজের একশ্রেণীর লোক আর এক শ্রেণীকে তাদের অধীনে রাখতে চায় কেন? একদেশ আর এক দেশকে পরাধীন ক'রে রাখতে চায় কেন? ইংলণ্ডের সাড়ে চার কোটী লোক ভারতের তেত্রিশ কোটি লোককে কেন পরাধীন ক'রে রাখতে চায়? ইংলণ্ডের শতকরা ৭৫ জন লোকের জগতে স্বার্থ কোনও মতে খেয়ে প'রে বেঁচে থাকা। তাদের অন্নবস্ত্রবাসের সুবিধা হলেই তারা সন্তুষ্ট, ভারতকে তারা পরাধীন রাখতে চায় না, কোনও দেশের কোনও লোকেরই সঙ্গে তারা ঝগড়া কর'তে চায় না। তারা দরিদ্র। ইংলণ্ডের অর্থসচিব যতই কেন কোটি কোটি পাউণ্ডের বাজেট করুন, দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের যতই শ্রীবৃদ্ধি হউক, এসব লোকেদের তাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। জগতে তাদের প্রধান স্বার্থ খেয়ে প'রে বেঁচে থাকা। তাদের

এই খাওয়া পরার সুব্যবস্থা সহজেই হতে পারে। তার জন্য ভারতকে পরাধীন রাখার প্রয়োজন হয় না। তবে ভারতকে পরাধীন রাখছে কারা? যারা ব্যবসাবাণিজ্য করে তারা। তারা চায় নিরুপদ্রবে ভারতে তাদের পণ্য বিক্রয় ক'রে লাভবান হবে, ভারত থেকে নিরুপদ্রবে তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল (raw materials) সংগ্রহ করবে। কিন্তু তাদেরও এই লাভটা কি? তাদেরও ব্যক্তিগত প্রয়োজন কতটুকু? তারা চায় খাওয়াপরা, সুখসুবিধা, আরাম, বিলাস। কিন্তু প্রয়োজনের দিক দিয়ে তাদের সেই প্রয়োজন বা কতটুকু? তারা চায় তাদের পুত্রকলত্রাদির জন্য সঞ্চয় করতে যাতে তারাও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। কিন্তু জগতের বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ক'রে সমস্ত মানবপরিবার যদি তাদের ব্যক্তিগত অভাব ও তাদের পুত্রপৌত্রাদির সমস্ত অভাব মোচনের ভার নেয়, তা'হলে তাদের এই সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয় না, দেশের দরিদ্রদিগকে, ভারতের এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোককে অধীন ক'রে রাখবার প্রয়োজন হয় না।

সুতরাং দেখা যাচ্চে এই সুব্যবস্থার অভাবই জগতের সমস্ত দুঃখদৈন্য, যুদ্ধবিগ্রহ, মনোমালিন্যের একমাত্র কারণ। এই সুব্যবস্থার অভাবেই—এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীকে, এক দেশ আর এক দেশকে পরাধীন রাখচে। এই সুব্যবস্থার অভাবেই পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ অপরের ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত হয়ে অস্ত্রে শস্ত্রে সেজে বসে আছে, পাছে কেহ তাকে আক্রমণ করে। এই সুব্যবস্থার অভাবেই জাতিতে জাতিতে হিংসা বিদ্বেষ, রেষারেষি। জগতে সমস্ত অশান্তির মূল কারণ এখানে।

এই সুব্যবস্থা সহজেই হ'তে পারে মানবজাতির জীবনযাত্রার ধারার পরিবর্ত্তন ক'রে, বর্ত্তমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ক'রে, সমস্ত মানবজাতিকে এক সঙ্ঘবদ্ধ সমাজে (One organised society) পরিণত ক'রলে। বর্ত্তমান মানবসমাজ বহুমানবের সমষ্টি মাত্র। কাহারও সঙ্গে কাহারও যোগ নাই, ঐক্য নাই, বন্ধন নাই, প্রত্যেকের জীবন স্বতন্ত্র, প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রত্যেকে বিচ্ছিন্ন। একজনের কর্ম্মের সঙ্গে আর একজনের কর্ম্ম সংযুক্ত (co-ordinated) নয়। ব্যষ্টির সহিত ব্যষ্টির, ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির, সমষ্টির সহিত সমষ্টির একটী সহজ যোগ (organic relation) নাই। গাছের শিকড় থেকে গাছের গুঁড়ী, ডালপালা, গাছের পাতাটির পর্য্যন্ত একটি অঙ্গাঙ্গী যোগ রয়েছে। মানবদেহের প্রত্যেক জীবকোষের সঙ্গে প্রত্যেক জীবকোষের যোগ রয়েছে, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে সহযোগিতা ক'রে মানবদেহকে বর্দ্ধিত করছে, মানবদেহকে সুস্থ সবল রাখছে। কিন্তু মানবসমাজ-দেহের জীব-কোষগুলি প্রত্যেকে স্বতন্ত্র, প্রত্যেকে চলেছে নিজ নিজ ভাবে, নিজ নিজ স্বার্থ সাধন উদ্দেশ্যে। ফলে মানবসমাজে আজ ঘোর অরাজকতা। তাই দয়ানন্দের প্রস্তাব সমস্ত মানবজাতিকে একটি বিধিবদ্ধ সমাজে পরিণত ক'রতে হবে। এই সমাজের একমাত্র লক্ষ্য হবে সমস্ত মানবজাতির অভাব মোচন করা, অখণ্ড মানবজাতির সুখশান্তি আনন্দের বিধান করা। সমস্ত মানবসমাজের লক্ষ্য হবে তাহাই, প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির লক্ষ্য হবে তাহাই।

দয়ানন্দের প্রস্তাব, জগতের সমস্ত ধনসম্পদ মানবজাতির

সাধারণ সম্পত্তি (Commmonwealth of Mankind) ব'লে গণ্য ক'রতে হবে। প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক মানুষ তাহা প্রয়োজনমত ভোগ ক'রবে, কেহ কাহাকেও বঞ্চিত ক'রবে না। প্রত্যেক দেশের উৎপন্ন দ্রব্য সমস্ত মানবজাতি প্রয়োজন হিসাবে বেঁটে নিবে। বর্ত্তমান সভ্যতায় প্রত্যেককেই প্রত্যেকের প্রয়োজন, এক দেশের উৎপন্ন দ্রব্য না হ'লে আর এক দেশের চলে না। মানবপরিবারের যিনি কর্ত্তা নির্ব্বাচিত হবেন, সেই মহারাষ্ট্রপতির নির্দ্দেশ অনুসারে প্রত্যেক দেশ খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি উৎপন্ন ক'রবে, যে দেশে যে পরিমাণ জিনিষ পাঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন তাহাও সুপ্রণালী মত সরবরাহের ব্যবস্থা ক'রতে হবে। ইহার ভিতর ব্যক্তিগত বা জাতিগত লাভের কোনও কথা থাকবে না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অভাব পূরণ ক'রবে, প্রত্যেকের সাহায্যে প্রত্যেকে উন্নতির পথে চ'লবে। উৎপন্ন দ্রব্যাদি সম্বন্ধে যেরূপ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, অধ্যাত্মবিদ্যা সমন্ধেও সেই কথা। মানবজাতি পরস্পরের ভাবের, শিক্ষার, জ্ঞানের আদানপ্রদান ক'রবে, পরস্পরে হাত ধরাধরি ক'রে, একই সঙ্গে দ্রুত উন্নতির পথে চলবে।

আইনের শাসনে জগতে শান্তি হবে না

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সব দেশগুলি পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। আর প্রতি দেশের নরনারীর জীবনও পরস্পর-নিরপেক্ষ হয়ে রয়েছে। প্রত্যেক দেশ দেখছে তার স্বার্থকে ভিন্ন ক'রে। প্রত্যেক মানুষ দেখছে তার স্বার্থকে ভিন্ন ক'রে।

প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত, অপরের স্বার্থের প্রতি কেহ দৃকপাত ক'রতে চায় না। মানুষের লোভ অপরিসীম, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ভিতর আবদ্ধ নয়। জগতের ধনসম্পদ যে যতখানি পারে আয়ত্ত করবার চেষ্টা ক'রছে। এতে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

রাষ্ট্রের ভিতরে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, ধনী নির্ধনে সংঘর্ষের যে সব কারণ রয়েছে এবং প্রতিনিয়ত যে সব কারণ সঞ্জাত হচ্চে, তার ফলে সর্ব্বদা মারামারি, কাটা-কাটি ঘটচে না শুধু রাষ্ট্রের শাসনে, প্রবল রাজশক্তির ভয়ে। সকলের উপরে রয়েছে রাজশক্তি। কিন্তু বিরোধের কারণগুলি এতই প্রবল যে, প্রবল রাজশক্তি থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকরা অভাবের তাড়নায় ধর্ম্মঘট ক'রছে, মালিকরা কলকারখানা বন্ধ ক'রে দিয়ে নিরন্ন শ্রমিকদের নিষ্পেষিত ক'রছে। ফলে, সময় সময় দাঙ্গা হাঙ্গামা, কখনও বা অন্তর্বিপ্লব ঘটছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক দেশেই ধনীনির্ধনের স্বার্থ নিয়ে অন্তর্বিপ্লবের সম্ভাবনা রয়েছে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই এই অন্তর্বিপ্লবের ভয়ে ভীত।

রাষ্ট্রের ভিতর সময় সময় অশান্তি ঘটলেও প্রবল রাজশক্তি সহজেই তাহা দমন ক'রে ফেলে। কিন্তু এই সংঘর্ষ প্রতি-নিয়তই চলছে। কেননা, সংঘর্ষের মূল কারণ পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। রাজশক্তি নির্ব্বিকার ভাবে বসে বসে তাহা দেখছে, এই সমাজব্যবস্থার আমূল সংস্কার ক'রে সামঞ্জস্যপূর্ণ নূতন সমাজব্যবস্থা গঠন করবার চেষ্টা ক'রছে না। রাষ্ট্রশক্তি ধনীদের হাতে। ধনীদের পক্ষ হয়ে রাষ্ট্রশক্তি দরিদ্রকে নিপীড়ন করছে,

সময় সময় পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার একটু একটু সংস্কার ক'রে ইহাকে বাঁচিয়ে রাখছে। তাতে মানুষের দুঃখদুর্দ্দশা দূর হচ্চে না, বরং দীর্ঘদিনব্যাপী হচ্চে। রাষ্ট্রশক্তির ধূয়া আইন, শান্তি এবং সুশাসন (Law, order and good government)। ইহার জন্য রাজশক্তি ভূরি ভূরি আইন প্রস্তুত করেছে, প্রতিদিন এই আইন প্রস্তুত হচ্চে—অসংখ্য আদালতের সৃষ্টি হয়েছে, আইনজ্ঞ বিচারক নিযুক্ত হয়েছে। তারা এই আইনমত বিচার করছে, অসংখ্য আইনব্যবসায়ী এই আইন-ব্যবস্থাকে সাহায্য করছে। কিন্তু তবুও সমাজে শান্তি হচ্চে না।

সমস্ত আইনের গোড়ায় রয়েছে মস্ত এক অন্যায়, মহা অসামঞ্জস্যের কারণ—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিচ্ছেদ, ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্প্রসারণের অবাধ এবং অন্যায় চেষ্টা। এই আইন সত্ত্বে ও সমাজে একজন আর এক জনের মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্চে, প্রবল দুর্ব্বলকে নিষ্পেষিত করছে, ধনী নির্ধনের ধন অপহরণ ক'রে তার ধনের পরিমাণ বাড়াচ্চে। আইন তাহা রদ করছে না। এই আইনের বিচারও সকলের সুপ্রাপ্য নয়। বাজারের পণ্য দ্রব্যের মত আইন ও বিচার ক্রয় বিক্রয়ের জিনিষ। যে পয়সা দিয়ে কিনতে পারে সেই আইনের বিচার পাবে, তাহা ন্যায়ই হ'ক, আর অন্যায়ই হ'ক। এই আইন (Law) একটি প্রকাণ্ড মিথ্যা (fiction)। এই মিথ্যা, মানুষ সৃষ্টি ক'রে তার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্চে, ক্রমেই এই মিথ্যার জালে নিজেকে জড়াচ্চে। কিন্তু যেখানে মূলে রয়েছে অন্যায়, অধর্ম্ম, অসামঞ্জস্য, শত শত আইন সত্ত্বেও তার সংশোধন হতে পারে না। মূলের অসামঞ্জস্য, ভুল ক্রটী

থেকেই যাচ্চে। শত শত আইন সত্ত্বেও, শত শত আদালত সত্ত্বেও, হাজার হাজার আইনব্যবসায়ী থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক দেশে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি বেড়েই চলেছে। আইনের দ্বারা কোনও দেশে শান্তি হয় নাই, মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর হয় নাই, হতেও পারে না।

এই গেল রাষ্ট্রের ভিতরের কথা। পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি বিচ্ছিন্ন থাকলেও প্রত্যেক রাষ্ট্রের মানুষগুলি নিজ নিজ দেশের গণ্ডীর ভিতর চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভই তাদের বহির্জগতে বাহির ক'রে এনেছে। প্রত্যেক দেশের লোক চাইছে পৃথিবীর সব দেশের লোকের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য ক'রে তাদের ধনবৃদ্ধি ক'রবে, তাদের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি ক'রবে। ফল দাঁড়িয়েছে, প্রত্যেক দেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রত্যেক দেশের ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা, পরস্পরের স্বার্থের সংঘর্ষ। রাষ্ট্র গুলি এই সব ব্যবসায়ীদের দ্বারা, ধনীদের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত, এই রাষ্ট্রগুলির পরিচালন তাদেরই হাতে। বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের হিংসাবিদ্বেষের ফলে তাদের স্বার্থ নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভিতর সর্ব্বদাই মনোমালিন্য ঘটছে। তারা প্রত্যেকেই দেখছে নিজের নিজের দেশের ব্যবসায়ীদের স্বার্থ। প্রত্যেকের ভিতর বিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে, সময় সময় তাদের ভিতর যুদ্ধ ঘটছে। এই স্বার্থের সংঘর্ষ যখন রয়েছে তখন প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যুদ্ধের সম্ভাবনা ও রয়েছে। প্রত্যেক দেশই নানারূপ অস্ত্র-শস্ত্রে সেজে বসে আছে। কিন্তু গতযুদ্ধের ফলে যুদ্ধের পরিণাম যে কি ভীষণ তাহা সকলেই বুঝতে পেরেছে। পুনরায় পৃথিবীতে যুদ্ধ ঘটলে সমস্ত মানবজাতি ধ্বংশ হয়ে যাবে,

যুদ্ধের দ্বারা পরিণামে বিশেষ কোনও সুবিধা নাই। এখন তাদের চিন্তা হয়েছে কি ক'রে এই যুদ্ধ প্রথা রদ করা যায়। যুদ্ধের যেখানে মূল কারণ সেখানে তারা যেতে চাচ্চে না, উপর থেকে গোঁজামিল দিয়ে পুরাতন সমাজব্যবস্থা বজায় রাখবার চেষ্টা করছে। প্রস্তাব হয়েছে আইনের দ্বারা যেমন প্রতি দেশের ভিতর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—যাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা—এই রাষ্ট্রগুলির ভিতরও সেই ভাবে আইনের দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার। আন্তর্জাতিক আদালত (International tribunal) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই আদালতের জজও নিযুক্ত হয়েছে, আন্তর্জাতিক আইনগুলিকে বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা চল্‌ছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও জগতে শান্তির কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্চে না। আইন ক'রে, আদালত ক'রে যেমন কোনও দেশের অধিবাসীদের ভিতর শান্তি আসে নাই, তেমনি আইন আদালত ক'রে রাষ্ট্রগুলির ভিতর ও শান্তি আসতে পারে না। ভিতরে গলদ থাকতে বাহিরে কি ক'রে শান্তি হ'তে পারে? মূলে রয়েছে অন্যায়, অধর্ম্ম; হিংসা দ্বেষ ও যুদ্ধের মূল কারণ ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত, জাতিগত স্বার্থের বিচ্ছিন্নতা, অসামঞ্জস্য, সংঘর্ষ। এরূপ অবস্থায় বাহিরে কি ক'রে শান্তি হতে পারে? চন্দনের দ্বারা বিষ্ঠাকে লেপ দিয়ে কতক্ষণ রাখা যায়? জীর্ণবস্ত্রকে তালি দিয়ে কতদিন রাখা যায়? জগতের রাজনীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ লোকদের এ কি দুর্ম্মতি!

এই যে আইন, যাহা জগতের বুদ্ধিমান লোকদের একমাত্র ভরসাস্থল, যে আইনের মায়া তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না,

এই আইন এল কোথা থেকে? এর ভিত্তি কোথায়? এই আইনের উৎপত্তি আদিমকালের মানবের অপরিণত পশুভাব-প্রধান প্রকৃতিতে—যে-যার সে-তার, কাহারও সঙ্গে কাহারও যোগ নাই পশুশক্তিতে যে যতখানি কেড়ে নিতে পারে, যে যতখানি কেড়ে রাখতে পারে ততখানি তার। এই আইনই মূলতঃ চলে এসেছে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত। তখনকার আইন এখন ও চালাবার চেষ্টা ক'রলে জগতে অনর্থই ঘটবে। এখন চাই অন্য আইন।

প্রকৃত আইন হচ্চে শ্রীভগবানের বিধান—সমস্ত সৃষ্টির পিছনে যে বিধান রয়েছে, যাহা সৃষ্টিকে চালাচ্চে, সৃষ্টিকে ধারণ ক'রে রেখেছে। আসল আইন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিধান। সূক্ষ্ম জগতে যে বিধান চলছে, মানবীয় বিধিব্যবস্থাও সেই অনুরূপ হওয়া চাই। মানুষের প্রাণে যখন প্রেমের উদয় হয়, তখনই সে তার পার্থিব স্বার্থ ভুলে যায়, নিজের মুখের অন্ন পরকে দিতে চায়, নিজে কষ্ট পেলেও নিজের বস্ত্র পরকে দিতে চায়, দশ জনের সঙ্গে মিলতে চায়। মানুষের মন যখন আধ্যাত্মিক জগতের দিকে অগ্রসর হয় তখনই আধ্যাত্মিক জগতে যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিরাজ করছে, তার প্রাণ সেই নিয়মের অধীন হয় ও তার আনন্দলাভ হয়, শান্তিলাভ হয়। পূর্ণ শান্তি এবং প্রেমের উপর, পূর্ণ সামঞ্জস্যের উপর সূক্ষ্ম জগৎ প্রতিষ্ঠিত। সেখানে পূর্ণ ঐক্য বিরাজমান, সেখানকার কার্য্যকলাপ সহজ, সুন্দর ও সরল। কেন না, ভগবৎ বিধানানুযায়ী। আজ এই সত্যযুগে মানুষের আমিত্বকে সঙ্কুচিত ক'রতে হবে, মানুষের প্রাণের মুখ ফিরিয়ে দিতে হবে

আধ্যাত্মিক জগতের দিকে। এই মানবীয় জগতকে সূক্ষ্ম জগতের সঙ্গে যোগ ক'রে দিতে হবে। সূক্ষ্ম জগতের ছাঁচে এই মানবীয় জগতকে দয়ানন্দ পুনর্গঠন ক'রতে চান।

স্কীমের উদ্দেশ্য মানবমনকে মুক্ত করা

দয়ানন্দ-স্কীমের একটি উদ্দেশ্য মানব-মনকে মুক্ত ক'রে দেওয়া। বর্ত্তমান ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক দেশ কেবল আপন আপন চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত। জগতের অন্নবস্ত্রসমস্যা এমনই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে অন্য চিন্তা করবার অবকাশ আর মানুষের থাকে না। যাদের অন্নবস্ত্রসমস্যা নাই, তারাও ব্যক্তিগত স্বার্থের চিন্তায় ব্যস্ত। ফলে, সব মানুষের চিন্তাই আমিত্বের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ। মানুষের লোভের সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই, তাকে স্বাধীনতা দেওয়া রয়েছে সে যত ইচ্ছা আহরণ ক'রবে। ফলে, প্রত্যেক মানুষই চেষ্টা করে, ছলে, বলে, কৌশলে নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে, নিজের ভাগ বাড়াতে, এমন কি দশজনের ন্যায্য প্রাপ্যটাও নিজের ভাগে আনতে। এই সমাজব্যবস্থার ফলে মানুষ সর্ব্বদাই একজন আর একজনের অনিষ্ট চিন্তা করে, বৃহৎ চিন্তা না ক'রে ক্ষুদ্র চিন্তা করে। মানবজাতির মন আমিত্বের, ক্ষুদ্রত্বের নাগপাশে বদ্ধ হয়ে রয়েছে।

পশুজগতে আমরা কি দেখতে পাই? পশুরা যখন ক্ষুধার যাতনায় অস্থির নয়, তখন একজন আর একজনকে হিংসা বা আক্রমণ করে না। তাদের প্রয়োজনীয় আহার পেলেই তারা সন্তুষ্ট। এ বিষয়ে দেখা যায় মানুষ পশুর চেয়েও

অধম। ব্যক্তিগত প্রকৃত অভাব পূরণ হলেও মানুষ সন্তুষ্ট নয়। তার শরীর ধারণের জন্য, সুখের জন্য, আরামের জন্য যাহা প্রয়োজন নয় তাহাও সে দখল করতে চায়। সমাজবিধি তাকে বাধা দেয় না।

দয়ানন্দ চাইলেন মানুষের ভিতর যে পশুত্ব আছে তাকে নির্ব্বাসিত ক'রতে, মানুষের আমিত্বের গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়ে বিশ্বমানবের সঙ্গে তার যোগ স্থাপন ক'রে দিতে, ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র ভাব থেকে তাকে উদ্ধার করতে। নিম্ন জগৎ থেকে তার মন ঊর্দ্ধ জগতে নিতে। একদিকে ধর্ম্মের উপদেশ, সাধু মহাপুরুষদের শিক্ষা তাদের মনকে সর্ব্বদাই উপরের দিকে তুলবার চেষ্টা করে, অপর দিকে সামাজিক বিধিব্যবস্থা এমনই যে তাহা সর্ব্বদাই মানুষের মনকে নীচের দিকে নিতে চায়, তার আমিত্বের গণ্ডীর ভিতর তাকে আবদ্ধ ক'রে রাখতে চায়। ফলে, অল্প সংখ্যক মানুষের মনই উপরে উঠতে পারে; পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের চিন্তাই অন্নবস্ত্র, লাভ লোকসান, ধন, ঐশ্বর্য্য, স্বার্থ এই চিন্তাস্তরের উপরে উঠতে পারে না। নিম্নস্তরেই দ্বন্দ্ব, উপরের স্তরে দ্বন্দ্ব নাই, সেখানে পূর্ণতা, সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। এরূপ অবস্থায় পৃথিবীতে শান্তি হতে পারে না। অশান্তির কারণ যেখানে রয়েছে সেখানে মানুষকে শত ধর্ম্মোপদেশ দিলেও, তাকে শতবার শান্তির কথা শুনাইলেও তার মন শান্ত হবে না। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ক'রতে হলে মানুষের মনকে ধর্ম্মের দিকে, ভগবানের দিকে ফিরাতে হবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে অশান্তির লৌকিক যে সব কারণ বিদ্যমান, তাহাও দূর ক'রতে হবে। দুটিই নিতান্ত

প্রয়োজনীয়, একটিকে বাদ দিয়ে শুধু অপরটির দ্বারা জগতে শান্তি হতে পারে না।

দয়ানন্দ-স্কীম মানব-চরিত্রে তাঁহার পূর্ণ জ্ঞানের ফল। একদিকে তিনি চান মানুষের হৃদয়মনের পরিবর্ত্তন (Change of heart), একদিকে তিনি চান ভগবৎ প্রেমে মানুষের প্রাণকে অভিষিক্ত ক'রে দিতে, আনন্দে তার প্রাণকে পরিপূর্ণ ক'রে দিতে, অপর দিকে তিনি ব্যবস্থা করেছেন যাতে পৃথিবীর একটি নরনারীরও অন্নবস্ত্রের কষ্ট না হয়, জগতে দারিদ্র্য না থাকে, মানুষের সঞ্চয় করার প্রয়োজন মাত্র না হয়। প্রতি নরনারীর অন্নবস্ত্রসরবরাহের, তার সমস্ত অভাব অভিযোগ পূরণের ভার থাকবে বিধিবদ্ধ মানবসমাজের উপর। তার অন্নবস্ত্র অভাবপূরণের চিন্তা করবে সমাজ। স্কীমে ব্যক্তিকে আত্মচিন্তা হতে মুক্ত হবার সুযোগ দেওয়া হ'ল। সে সমাজে থেকে কর্ম্ম ক'রবে চিন্তা ক'রবে—কিন্তু সে কর্ম্মের লক্ষ্য সমস্ত মানবসমাজের কল্যাণ। চাষী চিন্তা ক'রবে কি ক'রে ফসল উৎকৃষ্ট করা যায়, কি করে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, বৈজ্ঞানিক চেষ্টা ক'রবে কি ক'রে বিজ্ঞানকে সমস্ত মানবের সেবায় লাগানো যায়, ইঞ্জিনিয়ার চিন্তা ক'রবে কি ক'রে রাস্তাঘাট, রেল ষ্টীমার, প্রভৃতির উন্নতি এবং বিস্তার করা যায়, মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন, নানারূপ কলকব্জার দ্বারা মানুষের সুখ সুবিধা আরাম ও আনন্দ বৃদ্ধি করা যায়। শিক্ষক চিন্তা ক'রবে কি ক'রে সমাজের প্রত্যেক নরনারীকে শিক্ষিত ক'রে তোলা যায়। জ্ঞানী চিন্তা ক'রবে কি ক'রে নূতন নূতন জ্ঞান সম্পদ সমস্ত মানবজাতির ভিতর ছড়িয়ে

দেওয়া যায়। ডাক্তার চেষ্টা করবেন সমস্ত সমাজের স্বাস্থ্যের উন্নতি করবার, রোগ হলে প্রত্যেক মানুষকে সত্বর সুচিকিৎসা ঔষধ পথ্য দিবার।

মানুষ কর্ম্ম করে ধনের লোভে নয়—তার প্রকৃতির বশে, নূতন স্বষ্টির আনন্দে

প্রশ্ন উঠতে পারে, মানুষ যদি সহজেই তার অন্নবস্ত্র পায়, যদি তাকে এর জন্য বেশী চিন্তা ক'রতে না হয় তা'হলে, তার কর্ম্মস্পৃহাও কমে যাবে কি না, সে পূর্ণ উদ্যমে কাজ ক'রতে চাইবে কি না, যে কাজ সে ক'রবে তাহা ভাল ক'রে ক'রবে কি না? এর উত্তর, হাঁ সে ক'রবে। এ কথা ঠিক, বর্ত্তমান সময়ে মানুষ কাজ করে তার ব্যক্তিগত লাভের উত্তেজনায়, যার যে কাজে লাভ নাই, সে সে কাজ ক'রতে চায় না। কিন্তু মানুষ কাজ করে শুধু লাভলোকসানের দিকে তাকিয়েই নয়। মানুষ কাজ করে প্রধানতঃ তার প্রকৃতির বশে। মানুষের ভিতর ভগবান এমনই এক প্রকৃতি দিয়েছেন যাহা তাকে দিয়ে কাজ করাবেই, তাকে বসে থাকতে দেবে না। সে ইচ্ছা করুক আর নাই করুক এই প্রকৃতি তাকে দিয়ে কাজ করাবে। বর্ত্তমান সময়ে লাভের লোভ দেখিয়ে, বাহিরের চাপে তাকে দিয়ে কাজ করাতে হয়। তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন হ'লে, তার হৃদয়মনের সংস্কার হ'লে, তার মন আমিত্বের গণ্ডী থেকে মুক্ত হ'লে, ভগবৎ-মুখী হ'লে, সে প্রকৃতির বশে, প্রাণের আনন্দে সহজ ভাবে সমস্ত কর্ম্ম ক'রে যাবে।

বর্ত্তমানে মানুষ ব্যক্তিগত লাভের প্রেরণায় কাজ করে দেখা যায় বটে। কিন্তু এখানেও লাভটা উপলক্ষ্য মাত্র। আসল প্রেরণা আসছে তার প্রকৃতির কাছ থেকে। মানুষ বুঝুক আর নাই বুঝুক, কর্ম্মের কর্ত্তা সে নয়, সে যন্ত্র মাত্র। তার যন্ত্রে বসে, মায়ার দ্বারা তাকে আচ্ছন্ন ক'রে, তার প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে শ্রীভগবানই কাজ করছেন। মানুষ তার অহমাত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে, নিজের ইচ্ছায় কাজ করে, ভাল। না হ'লে তাকে অবস্থাতে বাধ্য ক'রে তার প্রকৃতি তাকে দিয়ে কাজ করাবে। মানুষ যখন ইচ্ছা ক'রে কাজ করে তখন শ্রীভগবান কৃপা ক'রে তাকে আনন্দের কণিকা দেন। যখন সে যন্ত্রমাত্র, যন্ত্রী শ্রীভগবান, এই জ্ঞানে কাজ করে তখন তার আনন্দের পরিমাণ বেশী হয়। যখন সে কর্ম্মকেই সাধন ব'লে জ্ঞান করে, যখন সে তার কর্ম্মের দ্বারাই শ্রীভগবানের পূজা ক'রতে চায় তখন শ্রীভগবান কৃপা ক'রে তার পূজা গ্রহণ করেন, তার সাধনাকে সিদ্ধি দেন, তাকে অসীম আনন্দের অধিকারী করেন।

জগতে যত বড় কাজ, ভাল কাজ হয়েছে, তাহা ব্যক্তিগত লাভলোকসানের হিসাব ক'রে হয় নাই, তাহা হয়েছে সৃষ্টির আনন্দে। মানুষ কাজ করে, আনন্দ পায় ব'লে। এই আনন্দের লোভ মানুষের ভিতরে রয়েছে। মানুষ আনন্দের কাঙাল, আনন্দই তার জীবনের লক্ষ্য, আনন্দই তার প্রাণের আহার।

ব্যক্তিগত লাভের প্রেরণা অপসারিত হ'লে মানুষ কাজ ক'রতে চাইবে কিনা এই প্রশ্ন উঠে কেন? তাহা উঠে

এই কারণে, বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায়, যেখানে তার লাভ, সেখানেই মানুষ কাজ করে, যেখানে তার ব্যক্তিগত লাভ নাই সেখানে সে কাজ ক'রতে চায় না। এর কারণ ব্যক্তিগত লাভের জন্য কাজ করাই মানবসমাজের বর্ত্তমান রীতি, জগতের অধিকাংশ লোকই তা'ই ক'রে থাকে। আর তা'ই ক'রতে ক'রতে ব্যক্তিগত লাভের জন্য কাজ করাটাই মানুষের সংস্কারে পরিণত হয়ে গেছে। আবার দেখার মধ্যেও ক্রটী আছে। আমরা দেখি মানুষের কাজ আর সঙ্গে সঙ্গে তার লাভ। এই দুটিই আমরা দেখতে পাই, এর অতিরিক্ত আমরা দেখতে পাই না। সে যে কতখানি লাভের আশায় কাজ ক'রল, কতখানি তার প্রকৃতির বশে কাজ ক'রল, কতখানি সে ইচ্ছা ক'রে ক'রল, কতখানি সে কাজের নেশায়, কাজের আনন্দে ক'রল তার পরিমাণ করার উপায় আমাদের নাই, তাহা আমরা চোখে দেখি না, চোখ দিয়ে দেখবার আমাদের প্রয়োজনও হয় না। আমরা যেটুকু দেখি তাহা মানুষের কাজ আর তার লাভ। তাই থেকে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্ত ক'রে থাকি যে মানুষ কাজ করে কেবল ব্যক্তিগত লাভের জন্য। আর ব্যক্তিগত লাভের জন্য আমরা নিজেরাও কাজ ক'রতে ক'রতে তাতে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে ব্যক্তিগত লাভ ছাড়াও যে মানুষ কাজ ক'রতে পারে তাহা শীঘ্র বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারি না।

বর্ত্তমানে জগতের অধিকাংশ লোকই ব্যক্তিগত লাভের লোভে কাজ করে এ কথা ঠিক। কিন্তু সব মানুষই যে ব্যক্তিগত লাভের জন্য করে এ কথা বলা চলে না। বর্ত্তমান

স্বার্থপর সমাজব্যবস্থা সত্ত্বেও দেখা যায় অনেক লোককে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে পরার্থে কাজ ক'রতে। আর সব কাজই যে মানুষ ব্যক্তিগত লাভের জন্য করে তাহাও ঠিক নয়। অনেক কাজই করে সে ব্যক্তিগত লাভের জন্য, কেননা, ব্যক্তিগত লাভের জন্য কাজ করাটাই মানবসমাজব্যবস্থা, ব্যক্তিগত লাভ না করলে সে খেতে পাবে না। আবার কোনও কোনও কাজ সে করে বিনা লাভেই। সাধারণ লোককে দুটি মিষ্ট কথা ব'লে কঠিন কাজও করিয়ে নেওয়া যায়। শিক্ষিত ভদ্রলোককে একটু অনুনয় ক'রে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। তা'হলে দেখা যাচ্চে মানুষ ব্যক্তিগত লাভ ছাড়াও কাজ করে। তাহা করা না করা নির্ভর করছে তার মনের অবস্থার উপর। তার মন যদি উপরে থাকে তার প্রাণ যদি গলে, তা'হ'লে সে পরার্থে কাজ করে। তার মন যদি নিম্নে থাকে তা'হলে সে ব্যক্তিগত লাভ ছাড়া কাজ ক'রতে চায় না। তার হৃদয়কে স্পর্শ ক'রতে জানলে অধিকাংশ স্থলেই মানুষের হৃদয় সাড়া দেয়, তাকে দিয়ে বিনালাভেই কাজ করানো যায়। মানুষের কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তার পার্থিব লাভের ততটা নয় যতটা তার মনের, তার প্রকৃতির, তার হৃদয়ের।

এই মনকে উপরে তুলে দেওয়া যায়। মানব প্রকৃতি প্রস্তর নয়, তার পরিবর্ত্তন করা যায়, মানবহৃদয় প্রেমে গলিয়ে দেওয়া যায়। দয়ানন্দ-স্কীম শুধু মানবসমাজবিধি (economic order of human society) পরিবর্ত্তন ক'রে ব্যক্তিগত লাভ উঠিয়ে দিয়ে মানুষকে দিয়ে কাজ করাবার স্কীম নয়। স্কীমের

আসল কথা জগতের সমস্ত নরনারীর হৃদয়মনকে উন্নত করা। মানুষের ভিতর দেবত্বকে জাগিয়ে দেওয়া, ভগবদ্ভাবে তাকে পরিপূরিত করাই হচ্ছে স্কীমের আসল কথা। তার পরে, পরিবর্ত্তিত ও উন্নত মানবহৃদয়মনের উপর এই নূতন সমাজবিধির প্রতিষ্ঠা করাই স্কীমের প্রস্তাব।

আর পার্থিব জগতে বাস ক'রে ব্যক্তিগত লাভটা যে মানুষ একেবারে ভুলতে পারে তা' নয়। সেদিকটা কখনও লোপ পেতে পারে না। ব্যক্তিগত লাভের দিক দিয়ে দেখলেও সমাজের দশজনের কল্যাণসাধন করলেই প্রত্যেক মানুষের কল্যাণ, সমাজের সুখসমৃদ্ধি লাভ হলেই প্রত্যেক ব্যক্তির লাভ।

রাষ্ট্র ও ব্যক্তি

যে নূতন মানবসমাজ দয়ানন্দ গ'ড়তে চাইলেন তাতে বৈচিত্র্যের সঙ্গে একত্বের, ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির, ব্যক্তির (individual) সঙ্গে রাষ্ট্রের (state) পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। বর্ত্তমান মানবীয় সমাজ-ব্যবস্থা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-মূলক (individualistic)। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্থহীন। জগতে যদি একটী মাত্র ব্যক্তি থাকত তবে সে স্বতন্ত্র হতে পারতো। কিন্তু জগতে বহুব্যক্তি, একজনও যদি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র (independent) হতে চায় তা' হলে অন্য সকলের তন্ত্রের সঙ্গে তার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। আর প্রকৃত প্রস্তাবে আজ জগতে তাই ঘটেছে। সুতরাং মানুষের এই নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য হতে পারে না। মানুষের অবাধ স্বাধীনতা (isolated independence) হতে পারে না। জগতে একজন মাত্র পরমপুরুষ

(Supreme Individual) আছেন, শ্রীভগবান, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়। একমাত্র শ্রীভগবানই স্বতন্ত্র। মানুষ তাঁর তন্ত্রের অধীন। তাঁর তন্ত্রে পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে, যেমন সৌরজগতে। সেখানে কোটী কোটী গ্রহ নক্ষত্র রয়েছে, প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা আছে, প্রত্যেকে নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরছে, কারও সঙ্গে কারও বিরোধ হচ্চে না। একেরও স্থান আছে আবার বহুরও স্থান আছে। আবার বহু সৌর জগত রয়েছে, প্রত্যেকটির ভিতর বহু গ্রহ নক্ষত্র চলছে ফিরছে। আবার এই বহু সৌরজগতকে নিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে। কোথাও কারও সঙ্গে কারও বিরোধ হচ্চে না। ব্যষ্টিও আছে সমষ্টিও আছে। ব্যষ্টির স্বাধীন গতিকে সমষ্টি বাধা দিচ্চে না। আবার সমষ্টির স্বাধীন গতিও অব্যাহত। ব্যষ্টি এখানে সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সে ঘুরছে নিজের পথে, কিন্তু সমষ্টির সঙ্গেও সে ঘুরছে। এখানে ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখা যাচ্চে। তারা প্রত্যেকে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রও বটে, আবার প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধীন। আকাশমণ্ডলে এই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখা যাচ্চে, তার কারণ প্রত্যেকেই শ্রীভগবানের নিয়মের অধীন হয়ে চলছে।

সৃষ্টিরহস্য পর্য্যবেক্ষণ ক'রলে দেখা যায় এখানে অরাজকতা, অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলতার স্থান নাই। সর্ব্বত্রই পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। শুধু মানবীয় জগতে আমরা দেখতে পাচ্চি ভয়ানক বিশৃঙ্খলা। কিন্তু ইহাও শ্রীভগবানেরই ইচ্ছাতে। গভীর ভাবে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে আমরা এই সব বিশৃঙ্খলতার

ভিতরও একটি সামঞ্জস্য, একটি গভীর উদ্দেশ্য নিহিত দেখতে পাই। শ্রীভগবান মানুষের আমিত্বকে প্রবল ক'রে তাকে এই সব অসামঞ্জস্যের ভিতর দিয়ে সামঞ্জস্যের দিকেই নিয়ে চলেছেন। অসামঞ্জস্যের অভিজ্ঞতা তার জ্ঞানের ভিতর বদ্ধমূল হয়ে থাকলে সামঞ্জস্যের প্রয়োজন-বোধ পূর্ণ এবং জাগ্রত থাকবে। তাই এই অবস্থার ভিতর দিয়ে শ্রীভগবান মানব-জাতিকে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

দয়ানন্দ-স্কীম মানবীয় জগতকে এই আকাশমণ্ডলেরই মত গড়তে চায়। প্রত্যেক মানুষ যেন এক একটী গ্রহ নক্ষত্র; বহু মানবকে নিয়ে একটী দেশ। দেশের প্রত্যেক নরনারীর যোগ থাকবে পরস্পরের সঙ্গে। পরস্পরকে নিয়ে পরস্পর চ'লবে, অথচ নির্দ্দিষ্ট সীমার ভিতর প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা ও পূর্ণ বিকাশের স্থান থাকবে। আবার প্রত্যেক দেশই চলবে প্রত্যেক দেশকে নিয়ে, বিচ্ছিন্নভাবে নয়, পরস্পরের সহযোগে। নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রত্যেক দেশেরই স্বাধীনতা থাকবে। প্রত্যেক দেশেরই পূর্ণ বিকাশ হবে, আবার সমস্ত মানবজাতিরও পূর্ণ বিকাশ হবে।

বর্ত্তমান মানবীয় সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে নিজে স্বতন্ত্র ভাবে চলতে, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে মাথা ঠোকাঠুকি ক'রে ম'রতে। এ স্বাতন্ত্র্য ভিত্তিহীন, এর কোনও অর্থ নাই। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেকের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ ও সুবিধা নাই, প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া নাই। একজন মানুষ দশজনের স্বাতন্ত্র্যকে হরণ করছে। এ স্বাতন্ত্র্য দরিদ্রের পক্ষে দুঃখ দুর্গতির সঙ্গে অহরহ

যুঝে মরার স্বাতন্ত্র্য। আর একজনের—ছলে, বলে, কৌশলে বহু লোককে নিজের সুখ সুবিধার জন্য দুর্গতিগ্রস্ত ক'রে রাখার স্বাতন্ত্র্য। এ একটা মহা মিথ্যা। বর্ত্তমানকালে এই রাষ্ট্র—একটী হৃদয়হীন নির্ম্মম যন্ত্রমাত্র। ব্যক্তিকে মিথ্যা স্বাতন্ত্র্য দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয়েছে। সে ঘুরে বেড়াচ্চে তার উদরান্নের চিন্তায় পাগল হয়ে। সে খেয়ে থাকুক আর না খেয়ে থাকুক, সে বাঁচুক আর মরুক, শীতগ্রীষ্মে তার মাথা রাখবার স্থান থাকুক আর নাই থাকুক, তার পুত্রকন্যা শিক্ষা পাক্ আর না পাক্, রাষ্ট্রের—তার জন্য কোন চিন্তা নাই। রাষ্ট্র তার কাছ থেকে প্রাপ্য ট্যাক্স আদায় ক'রে নিয়ে অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য তাহা খরচ করছে। এই যে অন্যায় অধর্ম্মমূলক (Godless) ব্যবস্থা তাহা বজায় রাখাই রাষ্ট্রের প্রধান কার্য্য। এই প্রাণহীন রাষ্ট্র বসে আছে স্থির নিশ্চল হয়ে আর কোটী কোটী লোক তাদের দুঃখের বোঝা বয়ে মরছে।

দয়ানন্দ-স্কীমে রাষ্ট্র (State) শব্দই উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্কীমে একটি দেশের বহু মানবের সমবায়কে নাম দেওয়া হয়েছে ইউনিয়ন (Union)। বর্ত্তমান রাষ্ট্রের কার্য্য হতে এই ইউনিয়নের কার্য্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। স্কীমের পরিকল্পিত মানব সমাজব্যবস্থা গড়া হয়েছে ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে। এই ব্যক্তিই সব। ব্যক্তিকে নিয়েই সমষ্টি। সে শ্রীভগবানের লীলার সঙ্গী, সে একেবারে অপরিহার্য্য। তার পূর্ণ বিকাশ নিতান্ত প্রয়োজন, না হ'লে শ্রীভগবানের লীলার পূর্ণ বিকাশ হবে না। সমষ্টির জন্য ব্যক্তিকে খর্ব্ব করলে চলবে না। তাতে শেষে সমষ্টিই খর্ব্ব হয়ে যাবে। এই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্যই

বহু ব্যক্তিকে নিয়ে এই ইউনিয়ন। বর্ত্তমান সময়ে, সমাজের মূলে রয়েছে অন্যায়, অধর্ম্ম। তাই রাষ্ট্রের ভিতর অশান্তির, অরাজকতার সম্ভাবনা সর্ব্বদা রয়েছে। রাষ্ট্র মানুষকে 'শাসন' ক'রে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহের ভাব জোর ক'রে দমন ক'রে রেখেছে।

কিন্তু এই ইউনিয়ানের কার্য্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইউনিয়ানের মূল উদ্দেশ্য 'শাসন' করা নয়, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্নবস্ত্রবাসের সুবন্দোবস্ত করা, তার শিক্ষার, রোগ হলে তার চিকিৎসার, তার সুখসুবিধার, তার আরামের, তার আনন্দের, তার মানসিক বিকাশের, তার আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যবস্থা করা। ব্যক্তির জন্যই এই ইউনিয়ন, ইউনিয়ানের জন্য ব্যক্তি নয়। এই ইউনিয়ানের সঙ্গে তার সহজ সম্বন্ধ। ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব দিয়েই এই ইউনিয়ান গঠন করবে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিয়েই ইউনিয়ানের ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তির নিজের সুখ সুবিধার জন্যই সে ইউনিয়ান গড়বে।

এই ইউনিয়ান প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথিবীর অন্যান্য ইউনিয়ানের সঙ্গে যোগ ক'রে দিয়ে এক বৃহৎ বিশ্ব-মিলনীর (World Union) সভ্য ক'রে দেবে। এই বিশ্ব-মিলনীও প্রত্যেক ইউনিয়ানের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য। এই বিশ্ব-মিলনী সমস্ত পৃথিবীর সুখসুবিধা, জ্ঞানবিজ্ঞান, খাদ্য, বস্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তিকে এনে দেবে। সর্ব্বোপরি এই বিশ্ব-মিলনী প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথিবীর সমস্ত ব্যক্তির সঙ্গে এক প্রেমের যোগে যুক্ত ক'রে দেবে। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিয়েই হবে এই বিশ্ব-মিলনী। এই বিশ্ব-মিলনী হবে ব্যক্তির এক বৃহৎ 'আমি'।

পঞ্চম অধ্যায়

চিন্তা-শক্তি

(POWER OF THOUGHT)

জড় শক্তি ও ইহার প্রভাব এখন সকলেই বিশ্বাস করেন। এক বস্তুর কম্পনে অন্য বস্তু কম্পিত হয়। এক বস্তুর উত্তাপে অন্য বস্তু উত্তপ্ত হয়। এক বস্তুর আকর্ষণে অন্য বস্তু আকৃষ্ট হয়। এক বস্তু হ'তে বৈদ্যুতিক শক্তি অন্য বস্তুতে সঞ্চারিত হয়। জড় শক্তির সাহায্যে এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর ঘাত প্রতিঘাত হয়। জড় জগতে এমন কোন কিছুই ঘটে না যার প্রভাব সমস্ত জগতে ছড়িয়ে না পড়ে। লর্ড কেল্‌ভিন্‌ (Lord Kelvin) এক দিন একটী পাহাড়ের উপর এক টুক্‌রা খড়িমাটি রেখে তাঁর ছাত্রদিগকে ব'ললেন, "এই দেখ, সমস্ত পৃথিবীকে নাড়া দেওয়া হ'ল।" খড়ির এই কম্পন-শক্তি স্থূল। তার চেয়ে সূক্ষ্ম জড়শক্তি আরও শীঘ্র পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। সূর্য্যের রশ্মি বায়ুর স্তর ভেদ ক'রে লক্ষ লক্ষ মাইল চ'লে যায় ও দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, এমন কি গভীর কুয়াসা ভেদ ক'রেও চ'লে যায়, কিন্তু মাটি, পাথর প্রভৃতি কঠিন জিনিষ ভেদ ক'রে যেতে পারে না। আবার একস্‌ রে (X-ray) এই সব জিনিষও ভেদ ক'রে যেতে পারে। তাই আমরা দেখতে পাই যে জড় শক্তির ক্ষমতার তারতম্য আছে; কোন

শক্তি স্থূল, কোন শক্তি তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম, কোন, শক্তি তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ; সূক্ষ্ম শক্তির ক্ষমতা বেশী ; স্থূল শক্তির ক্ষমতা কম। একটি বাঁশীর শব্দ কিছুদূর গিয়েই ক্ষীণ হয়ে যায়, কিন্তু বেতারবার্ত্তায় (Wireless) একটী বিদ্যুৎ বিকম্পন (electric oscillation) কত দেশ দেশান্তর পার হয়ে চলে যায় ও সমানভাবে কাজ করে।

বৈজ্ঞানিকরা বলছেন যে সমস্ত জগৎ ইথার (ether) দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই জগদ্ব্যাপী ইথার কঠিন, তরল, বায়বীয় সকল জড় পদার্থের ভিতরে বাহিরে রয়েছে। এই সর্ব্বব্যাপী ইথার এতই সূক্ষ্ম পদার্থ যে তা এখনও বৈজ্ঞানিকরা যন্ত্রপাতির সাহায্যে ধরতে পারেন নাই। তবে সকলেই তার কার্য্যাবলী দেখে তার অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। এই ইথারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ বিকম্পন (electric oscillation) দূর দূরান্তরে চ'লে যায়। বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণের (spark) সাহায্যে যখন এই বিকম্পনের সৃষ্টি হয়, তখন ইহা তার চারিদিকে ইথারের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায় ; এই পরিবর্ত্তন দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে ও সমবিকম্পনশীল অন্য এক যন্ত্রের সংস্পর্শে এসে তার মধ্যেও বিকম্পনের সৃষ্টি করে। বিদ্যুৎশক্তি যত প্রবল হয়, এই বিদ্যুৎ বিকম্পন ততই শক্তিশালী ও দূরগামী হয়।

স্থূল ঘটনা দ্বারাই সূক্ষ্ম ঘটনা বুঝার সুবিধা হয়। জড় শক্তি যত সূক্ষ্মই হোক্ না কেন চিন্তাশক্তির তুলনায় তাহা অতি স্থূল। স্থূল জড়-শক্তিই যখন সমস্ত জড় জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, তখন সূক্ষ্ম চিন্তা-শক্তি যে অতি সত্বর দ্রুতগতিতে সমস্ত চিন্তা জগতে পরিব্যাপ্ত হবে, এতে আর

বিস্ময়ের কারণ কি আছে? বৈজ্ঞানিকরা বলছেন সমস্ত জগৎ ইথার দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ভারতের ঋষিরাও বলেছেন যে সমস্ত জগৎ এক বিরাট চৈতন্য-শক্তি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সমস্ত জগৎ কেবল ইথারময় নয়, ইহা প্রাণময় ও মনোময় বা চিন্ময়। এই মনোময় বা চিন্ময় জগৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। জড় জগতে ইথার সমুদ্রে বিদ্যুৎ বিকম্পন যেমন এক স্থান হ'তে স্থানান্তরে চলে যায়, তেমনি মনোময় জগতে কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাহনের (medium) সাহায্যে এক মনের চিন্তা প্রবাহ (Thought wave) অন্য মনে সংক্রামিত হয়। শক্তিমান্ বিদ্যুৎ বিকম্পন যেমন ইথারের মধ্য দিয়ে সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হয়, শক্তিশালী চিন্তা তেমনি এক মন হ'তে সমস্ত মনোময় জগতে অতি দ্রুতগতিতে পরিব্যাপ্ত হয়। আজকার বৈজ্ঞানিক যুগে বেতারবার্ত্তা (Wireless) যদি দুর্ব্বোধ্য না হয়, তবে চিন্তার বেতারবার্ত্তাই বা দুর্ব্বোধ্য হবে কেন? বেতারবার্ত্তা সম্বন্ধে যেমন আজ জগতে কারও সন্দেহ নাই, তেমনি একজন মানুষের চিন্তা অন্য মানুষের মনে সঞ্চারিত হওয়া সম্বন্ধে কারও সন্দেহ থাকৃতে পারে না। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, জগতে যত শব্দ তরঙ্গ আছে আমরা সব শুনতে পাই না, কারণ আমাদের স্থূল কর্ণ সূক্ষ্ম শব্দতরঙ্গ ধরতে পারে না। আবার শব্দতরঙ্গ যতটা শুনতে পাই আলোক তরঙ্গ তার অপেক্ষাও কম দেখতে পাই, কারণ সূক্ষ্ম আলোক-তরঙ্গ আমাদের স্থূল চক্ষু দেখতে পায় না। সূক্ষ্ম জড় শক্তিই গ্রহণ করার যোগ্যতা যখন আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের নাই, তখন সূক্ষ্ম জড় শক্তি অপেক্ষাও বহু গুণে

সূক্ষ্ম চিন্তা-শক্তি কিরূপে আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচর হবে? আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁর অতি শক্তিশালী (Supersensitive) যন্ত্র দ্বারা তরুলতার ইন্দ্রিয়ের নানারূপ প্রতিক্রিয়ার (response) ছবি প্রত্যক্ষভাবে মানুষের চোখের সামনে ধরে দিয়েছেন। মানুষের মনের নানারূপ চিন্তা ও ভাবের প্রতিক্রিয়া মাপিবার যন্ত্রও আবিষ্কার হয়েছে। তবে এই চিন্তা-তরঙ্গের ঠিক স্বরূপ কি, কিরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাহনের (medium) ভিতর দিয়ে ইহা এক মন হ'তে অন্য মনে সংক্রামিত হয়, ইহার গতি কোন্ নিয়মের (law) অধীন, এ সব এখনও বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার ক'রতে পারেন নাই। একদিন এ সমস্তই তাঁদের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হবে। বৈজ্ঞানিকের মন এখনও জড় শক্তির উপাসনায় ডুবে আছে, তাই চিন্তা-শক্তির রহস্য উদ্ঘাটন করতে পাচ্চে না। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা কেহ কেহ চিন্তা-সঞ্চারণ (Thought Transference) বিশ্বাস করেন, কিন্তু উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেন না।

আমরা স্থূল জগতের জড়শক্তির তুলনায় (analogy) চিন্তা-শক্তি বুঝাবার চেষ্টা ক'রব। এই জগৎ মনোময়। একই মনোময় পদার্থের দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত। জলাশয়ে যেমন সমস্ত পদ্মগুলি পৃথক্ হয়েও একই জলে ভাস্ছে, মানুষের মনগুলিও সেইরূপ পরস্পর পৃথক্ হয়েও একই মনোময় সমুদ্রে ভাস্ছে। একটি পদ্মে একটি ভ্রমর এসে বস্লে পদ্মটি কেঁপে উঠে, জলে তরঙ্গ উঠে, আর সেই তরঙ্গে সমস্ত পদ্মগুলিই কেঁপে উঠে। জলাশয়ে একটি ছোট ঢিল ফেললে যে তরঙ্গ উঠে তাহা ক্রমে বড় হ'তে বড় হয় ও শেষে ক্ষীণ হ'তে

হ'তে অনেক দূরে মিলিয়ে যায়। তার চেয়ে বড় একটি ঢিল একটু বেশী জোরে ফেল্‌লে আরও বড় তরঙ্গ উঠে, আর তা বৃহৎ হ'তে বৃহত্তর হ'য়ে হয়ত জলাশয়ের শেষ সীমা পর্য্যন্ত চ'লে যায়। তেমনি একটি মনে চিন্তার তরঙ্গ উঠলে চৈতন্যময় সমুদ্র চারিদিকে তরঙ্গায়িত হয়। একটি মনে চিন্তার প্রবল তরঙ্গ উঠ্‌লে সেই তরঙ্গ খেল্‌তে খেল্‌তে সমস্ত চিন্ময় সাগরে পরিব্যাপ্ত হয়।

প্রত্যেক চিন্তার ভিতর শক্তি রয়েছে। প্রত্যেক চিন্তায় তরঙ্গ তোলে। তবে সব চিন্তার শক্তি সমান নয়। ক্ষুদ্র চিন্তার শক্তি ক্ষুদ্র। মহৎ চিন্তার শক্তি মহৎ। ছোট চিন্তায় চিন্ময় সাগরে ছোট তরঙ্গ তোলে। বড় চিন্তায় বড় তরঙ্গ তুলে চিন্ময় সাগরকে আলোড়িত করে। ক্ষুদ্র চিন্তার ক্ষুদ্র তরঙ্গ চিন্তা-রাজ্যে কিছু দূর গিয়েই মিলিয়ে যায়। ইহা অপেক্ষা বড় চিন্তা আরও কিছু দূর গিয়ে মিলিয়ে যায়। আর সর্ব্বাপেক্ষা বড় চিন্তা দূরাতিদূর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে সমস্ত চিন্তারাজ্যকে ওলট্‌পালট্‌ ক'রে দেয়।

যেমন একই সুরে বাঁধা অনেকগুলি বীণাযন্ত্রের মধ্যে একটী বীণায় সুর বাজালে অন্য বীণাগুলি সমস্বরে আপনা হ'তেই ঝঙ্কৃত হয়ে উঠে, তেমনি একটি মনে কোন মহৎ চিন্তার উদয় হ'লে জগতে ঐ সুরে বাঁধা যতগুলি মন আছে সব মনগুলিই এই চিন্তাতরঙ্গের আঘাতে সমস্বরে আপনা হ'তেই বেজে উঠে। এই ভাবেই একটী মন দূরদূরান্তরে অনুরূপ সহস্র মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

জড় জগতে আমরা দেখতে পাই যে যদি কোন জলাশয়ে

এক জায়গায় একটী ভাসমান পদার্থের (float) সাহায্যে একটী ছোট তরঙ্গ ও অন্য জায়গায় আর একটী ভাসমান পদার্থের দ্বারা একটী বৃহৎ তরঙ্গের সৃষ্টি করা হায়, তা'হলে এই বড় তরঙ্গ ছোট তরঙ্গের উপর প'ড়ে তাকে ক্রমশঃ নিজের অঙ্গের অনুরূপ ক'রে নেয় ও এই দুটী ভাসমান পদার্থ তখন একই তরঙ্গে নাচতে থাকে। মনজগতেও তেমনি একটী মনের প্রবল চিন্তা-তরঙ্গ অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের মনের ক্ষুদ্র চিন্তা-তরঙ্গগুলিকে আঘাত দিয়ে দিয়ে নিজের অনুরূপ ক'রে নেয় ও সেই মনগুলিকে একই চিন্তায় চিন্তান্বিত ক'রে উচ্চস্তরে উন্নীত করে। এইরূপে এক মনের মহৎ চিন্তা সকল মনে সংক্রামিত হয়ে চিন্তারাজ্যে বিপ্লব ঘটায়।

মানুষের মন যত ক্ষুদ্রই হোক্ না কেন, মহৎ মনের মহৎ চিন্তার প্রভাব মানুষ কখনই এড়াতে পারে না। এই ভাবেই ক্ষুদ্র চিন্তা বৃহৎ চিন্তার নিকট হার মানে, ক্ষুদ্র মন মহৎ মনের নিকট পরাজয় স্বীকার করে ও মহত্ত্বের স্তরে উঠে যায়। এই ভাবেই চিন্তার প্রভাবে চিন্তারাজ্যে পরিবর্ত্তন ঘটে। আর এই চিন্তারাজ্যে পরিবর্ত্তন ঘটলেই নূতন যুগের প্রবর্ত্তন হয়—মানবসমাজ নূতন ভাবে গ'ড়ে উঠে।

চিন্তা-জগতে বড় চিন্তা এলে, এই চিন্তা সমস্ত মানব-মনকে আক্রমণ করে; ক্রমে অসংখ্য মানবমনে একই চিন্তার তরঙ্গ উঠতে থাকে। তখন এই চিন্তার শক্তি দিন দিনই বৃদ্ধি পায়; তাহা বড় হ'তে বড় হয়। চিন্তা-জগতে বড় চিন্তা এলে ছোট চিন্তার শক্তি হ্রাস হয়ে যায়, ছোট চিন্তা ছোট হ'তে ছোট হয়ে যায়। বড় চিন্তাই চিন্তা-জগতে

সমস্ত স্থান গ্রহণ ক'রে ফেলে। চিন্তা-জগতে বড় চিন্তা এলে ছোট চিন্তাকে, ছোট ভাবকে জাগ্রত করা যায় না। মানুষের মন তখন চিন্তা করতে বসলেই এই বড় চিন্তা তার মনে তরঙ্গ তুলে। তাকে তখন এই বড় চিন্তাই করতে হয়।

দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এ জিনিষটা পরিষ্কার হবে। আজ আর কেহ শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করে না। আজ বৃহত্তর স্বাধীনতার চিন্তা, ভারতের স্বাধীনতার চিন্তা এসে গিয়েছে। আজ লোকে সেই চিন্তাই করে ও সেই কথাই বলে। ক্ষুদ্র ভাব দেশের লোকের প্রাণের কাছ থেকে সাড়া পায় না। আজ শিক্ষিত জ্ঞানী লোকে কেবল বাংলা-দেশেরই কল্যাণকে দেখে না, সমস্ত ভারতেরই কল্যাণ চিন্তা করে। ভারতের কল্যাণ সাধিত হ'লে বাংলারও কল্যাণ হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সব প্রদেশেরই কল্যাণ হবে। নেতাদের প্রথমে চিন্তা ছিল ভারতের শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার (reforms) করা, পরে তাঁদের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের (Colonial Self-government) চিন্তা এল। তখন শুধু শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার (reforms) করার চিন্তা তলায় পড়ে গেল। আজ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনও তলায় পড়ে গেছে, তার চেয়ে বড় চিন্তা, বড় ভাব এসেছে—পূর্ণ স্বাধীনতা (Complete Independence)। যে সব নেতারা শুধু সংস্কার (reforms) নিয়ে আন্দোলন করতেন, ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাঁদের পুরাতন কথা মানুষের প্রাণে আর স্থান পেল না। নূতন নেতারা এসে নূতন ভাবের কথা বল্লেন। এই সব নূতন নেতারাও আজ পুরাতন হয়ে গেছেন। আজ আর এক নূতন চিন্তার,

আর এক নূতন ভাবের বাহকরা এসে তাঁদের স্থান গ্রহণ কর্‌ছেন, পূর্ণ স্বাধীনতার কথাই দেশকে শুনাচ্চেন। দেশের চিন্তা উচ্চ স্তরে উঠে গেছে, তাঁদের কথায় বহু লোক সাড়া দিচ্ছে। এই পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়েও বড় চিন্তা হচ্ছে অন্যোন্য-তন্ত্রতা (Inter-dependence)। ক্রমে এই চিন্তাতেই ভারতের সমস্ত লোককে আস্‌তে হবে।

প্রত্যেক চিন্তার ভিতরে শক্তি আছে। তবে চিন্তার প্রকৃতি অনুসারে তার শক্তির তারতম্য হয়। প্রত্যেক সত্তার সু-কু, সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, দুইটি দিক্ আছে। তাই মনোময় রাজ্যে সু-চিন্তাও আছে, কু-চিন্তাও আছে। সকল চিন্তার মূল প্রস্রবণ শ্রীভগবান, তাঁহাতেই সকল চিন্তার উদ্ভব। যেমন সুচিন্তার উদয় শ্রীভগবান হ'তে, তেমনি কুচিন্তারও উদ্ভব তাঁ' থেকেই। তিনি তাঁর লীলার জন্য মানুষকে, তার চিন্তাকে সু এবং কু এই দুই রকম ক'রে দেখাচ্ছেন। কু প্রতিকূল শক্তি (negative force); সু অনুকূল শক্তি (positive force)। এই সু এবং কু'র দ্বন্দ্বেই লীলা বৈচিত্র্যময় হচ্ছে। কুচিন্তা মানুষের প্রাণে অশান্তি আনে; সুচিন্তা শান্তি ও আনন্দ আনে। তাই কু-কে ছেড়ে সু-কে ধরাই মানুষের প্রকৃতি। ইহাই তার সমস্ত জীবনের সাধনা।

কুচিন্তারও শক্তি আছে। মনে কুচিন্তার উদয় হ'লে সে চিন্তাও তরঙ্গ তুলে এবং অন্য মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের মনে উভয় চিন্তাই আসে। কু'কে প্রত্যাখ্যান ক'রে সু'কে ধরাই উন্নত চরিত্রের লক্ষণ। একজনের মনে কুচিন্তা স্থান পেলে তাহা অন্যের কুচিন্তাকে বলবতী করে।

একজনের কুচিন্তা অন্যের কুচিন্তার পথ সহজ সুগম ক'রে দেয়। কেমন ক'রে কু-অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করতে হবে তা একজন অন্যের চিন্তা ও কার্য্যের ফলে সহজেই স্থির ক'রে নিতে পারে। যতই মানুষ কুচিন্তাকে মনে পোষণ ক'রবে, এই চিন্তায় মনকে নিবদ্ধ ক'রবে, ততই এই কুচিন্তা বলবতী হবে ও জগতে কুচিন্তা এবং কুকার্য্যের শক্তিকে বলবতী করবে। এই জন্যই মানুষ যতই ঘৃণা দ্বেষ হিংসা মনে পোষণ করবে, ততই জগতে এ সবের শক্তি বেড়ে যাবে। দ্বেষ হিংসা দ্বারা দ্বেষ হিংসার নিবৃত্তি হয় না। কুচিন্তার দ্বারা কুচিন্তার নিবৃত্তি হয় না। কুচিন্তার নিবৃত্তি হয় সুচিন্তা দ্বারা। অপ্রেম ধ্বংস হয় প্রেমের দ্বারা।

কুচিন্তার শক্তি সীমাবদ্ধ। জড় পদার্থের তুলনায় রূপকভাবে ব'লতে গেলে, সুচিন্তা সূক্ষ্ম (subtle) ও লঘু (light); কুচিন্তা স্থূল (gross) ও গুরু (heavy)। কুচিন্তার গুরুত্ব (density) বেশী; তাই কুচিন্তার তরঙ্গ চিন্ময়-সমুদ্রে তরঙ্গায়িত হ'য়ে বেশী দূর যেতে পারে না। পথের ধূলা উড়ে বটে কিন্তু স্থূল ও ভারী ব'লে বেশী দূর যেতে পারে না। তেমনি স্থূল, গুরুত্ব পূর্ণ কুচিন্তা তরঙ্গায়িত হয় বটে কিন্তু চিন্ময় সাগরে বেশী দূর অগ্রসর হ'তে পারে না। কু'র শক্তি প্রবল হ'লেও তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। কু ধ্বংসকারী (destructive), সু গঠনকারী (constructive)। প্রবল ঝড় ধ্বংসকারী ব'লে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। ভূমিকম্প তা অপেক্ষাও বেশী বিনাশ সাধন করে ব'লে অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়। তাই কু'র শক্তি ধ্বংসকারী ব'লে ক্ষণস্থায়ী। ইহাই

বিধাতার বিধান। আবার কু-চিন্তাকে বহু মানব বর্জ্জন করছেন। যাঁরা তাকে বর্জ্জন করছেন তাঁদের মনের শক্তি বেশী। এই প্রবলতর শক্তির দ্বারা প্রতিহত হ'য়ে কুচিন্তা তার প্রভাব বিস্তার কর্‌তে পারে না। ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে কুচিন্তা তরঙ্গায়িত হয়, অল্প দূর গিয়েই সে শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। তাই কুচিন্তার শক্তি সীমাবদ্ধ।

সুচিন্তা সূক্ষ্ম ও লঘু; তাই সহজেই তাহা চিন্ময় সমুদ্রে বহু দূর ভেসে যেতে পারে। আর চিন্তা যতই মহৎ হ'তে মহত্তর হবে, ততই তাহা সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর এবং লঘু হতে লঘুতর হবে ও তত সহজেই চিন্ময় সাগরে তরঙ্গায়িত হ'তে হ'তে বহুদূর পর্য্যন্ত চ'লে যেতে পারবে। আর যেখানে যেখানে সমভাবাপন্ন অনুরূপ মন আছে সেখানেই তাহা বেজে উঠ্‌বে, ও এই সব মন (sub-stations) হতে আরও শক্তি সংগ্রহ ক'রে আরও শক্তিমান হয়ে চিন্তারাজ্যে দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়বে। তাই সুচিন্তার শক্তি তরঙ্গায়িত হ'তে হ'তে বেড়েই চলে। বহু মন যখন একই চিন্তায় কেন্দ্রীভূত হয় তখন এমন এক মহা শক্তির উদ্ভব হয় যে সে শক্তিতে সমস্ত চিন্তা-জগৎ ওলট্‌পালট্ হয়ে যায়।

সুচিন্তা করলেই সেই সুচিন্তা সূক্ষ্ম ও লঘু ব'লে প্রতি মনে সহজেই প্রবেশ কর্‌তে পারে, প্রতি মনের ভিতর তরঙ্গ তুল্‌তে পারে; প্রতি মনই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাকে আহ্বান ক'রে নেয়, তার সঙ্গে সহযোগিতা করে। এক জনের মঙ্গল সাধন করাও যেমন সহজ, দশ জনের মঙ্গল সাধন ও তেমনি সহজ। এক জনের মঙ্গল সাধনের জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করলে

সে চিন্তা ও চেষ্টা যিনি করেন ও যাঁর জন্য করেন, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে দুজনেরই মনের শক্তির সহযোগিতা হয়। তেমনি দশ জনের মঙ্গল সাধনের জন্য যিনি চিন্তা ও চেষ্টা করেন তাঁর শক্তির সঙ্গে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে দশ জনেরই মনের শক্তির সহযোগিতা হয়। যে চিন্তা-শক্তি বাংলা দেশের প্রতি প্রয়োগ কর্‌লে বাংলার কল্যাণ হবে, সেই চিন্তা-শক্তি ভারতের প্রতি প্রয়োগ কর্‌লে সমস্ত ভারতেরই কল্যাণ হবে। আর জগতের প্রতি তাহা প্রয়োগ কর্‌লে সমস্ত জগতেরই কল্যাণ হবে। সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য যে চিন্তা, তার সঙ্গে সমস্ত জগদ্বাসীর মনই সহযোগিতা কর্‌বে এবং তাদের সমবেত শক্তিতে এই কল্যাণ চিন্তার শক্তি সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাবে, তাতে বাংলা দেশেরও কল্যাণ হবে, ভারতেরও কল্যাণ হবে, সমস্ত জগতেরই কল্যাণ হবে। তাই দশজনের কল্যাণ চিন্তা অপেক্ষা হাজার জনের কল্যাণ চিন্তার শক্তি বেশী, আবার হাজার জনের কল্যাণ চিন্তা অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের কল্যাণ চিন্তার শক্তি বহুগুণ বেশী।

পরিবারের মধ্যে একটি মানুষ যদি স্বার্থপর হয়, কেবল নিজের চিন্তা করে, পরিবারের উপর তার প্রভাব হয় না। যখন সে নিজেকে ভুলে পরিবারের সকলের মঙ্গল চিন্তা করে তখনই পরিবারের সকলের উপর তার প্রভাব হয়। সকলের প্রাণের সঙ্গে তার প্রাণের এক সূক্ষ্ম যোগ হয়, সকলে তার কথা শুনে, তার ইচ্ছা পালন করে। যখন সে পরিবারের স্বার্থ ভুলে প্রতিবেশীদের, গ্রামের স্বার্থ দেখে, তাদের সকলের যথার্থ মঙ্গল ইচ্ছা করে, তখন সমস্ত গ্রামের লোকের উপরই তার

প্রভাব হয়। অলক্ষ্যে সকলের প্রাণের সঙ্গে তার এমন একটি যোগ হয় যে, সকলেই তার কথা মানে, তার উপদেশ মত চলে। গ্রামের সকল লোকের মনের উপর তার মনের, তার শুভ ইচ্ছার শক্তি গিয়ে পড়ে, তার মন দিয়ে গ্রামের সকলের মনকে সে চালিত করে। তেমনি কোনও সাধক যদি সম্পূর্ণরূপে আত্মবিলোপ ক'রে, জাতিধর্ম্ম দেশকালের উপরে উঠে অখণ্ড মানবজাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ চিন্তা করেন, সেই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন, তা'হ'লে তার চিন্তা অনন্ত শক্তিশালী হবে, অলক্ষ্যে সমস্ত জগতের লোকের মনের উপর সেই চিন্তা ও সাধকের মনের শক্তি গিয়ে পড়বে। তাঁর প্রাণের সঙ্গে বিশ্বের প্রতি নরনারীর প্রাণের একটি যোগ হবে। তাদের জীবনে তাঁর সেই চিন্তা ফলপ্রসূ হবেই।

সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য চিন্তা-শক্তি নিয়োজিত করা প্রয়োগকর্ত্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাঁর প্রাণে এই ইচ্ছা জাগা চাই, জগতের কল্যাণ চিন্তা তাঁর প্রাণে আসা চাই, এই চিন্তা তাঁর প্রাণে খেলা চাই। চিন্তা কার্য্যকরী হয় তখন যখন চিন্তার পিছনে সাধকের সমস্ত ইচ্ছা শক্তি (Will-force) থাকে। এই ইচ্ছা শক্তি যত প্রবল হয় চিন্তাও তত প্রবল ও শক্তিশালী হয়, তত শীঘ্র তাহা অন্যান্য মনে সঞ্চারিত হয় ও কার্য্যে পরিণত হয়। চিন্তার পিছনে ইচ্ছা-শক্তি না থাকলে সে চিন্তার গতিবেগ (momentum) হয় না। এই ইচ্ছা-শক্তিই চিন্তার প্রভাবের মূল উৎস। এই ইচ্ছা-শক্তি সাধকের জীবন থেকে আসে। সাধক তাঁর দেহ মন প্রাণের সকল শক্তি দিয়ে যতই তাঁর চিন্তা ও আদর্শকে

বরণ ক'রে নিয়ে জীবনে তাহা মূর্ত্ত ক'রে তুলবেন, ততই তাঁর চিন্তার প্রভাব অপরাজেয় হবে। তিনি যতই অনন্য-চিন্ত্য ও অনন্যকর্ম্মা হয়ে এই চিন্তার নিকট কায়মনোবাক্যে আত্মদান করবেন, ততই তাঁর চিন্তা শক্তিশালী হবে ও সমস্ত মানবজগতে প্রভাব বিস্তার ক'রবে। তাঁর চিন্তা ও আদর্শের প্রভাব তাঁর জীবনের উপর, তাঁর প্রাণ-শক্তি ও ইচ্ছা-শক্তির উপর নির্ভর করে। যে চিন্তা চিন্তাকারীর জীবনেই মূর্ত্ত হয়ে উঠে না সে চিন্তা অন্য মনে সংক্রামিত হ'লেও তার শক্তি ও প্রভাব বেশী হয় না; সে চিন্তা কল্পনা জগতের অবাস্তব আদর্শই রয়ে যায়, জীবন্ত সত্যে পরিণত হয় না। আর যে মহৎ চিন্তা ও আদর্শ একটি মানুষেরও জীবনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে—জীবন্ত সত্যে পরিণত হয়েছে, তাহা অন্যের মনে সহজেই সংক্রামিত হয় ও মূর্ত্ত হয়ে উঠে।

যে চিন্তা কেবল চিন্তারাজ্যেই রয়ে গেছে সে চিন্তা কল্পনা জগতেই অবাস্তব পদার্থ থেকে যায়। অন্যের জীবনে তাহা ফলবতী হবার সম্ভাবনা কম। আর যে চিন্তা এক জনের জীবনে কল্পনা রাজ্য হ'তে বাস্তব জগতে নেমে এসেছে সে চিন্তা আর অশরীরী থাকে না, সত্যের মধ্যে শরীর পরিগ্রহ ক'রে সকলের জীবনেই মূর্ত্ত হয়ে উঠে। তাই চিন্তার শক্তি ও প্রভাব চিন্তাকারীর ইচ্ছা-শক্তির উপর নির্ভর করে এবং এই ইচ্ছা-শক্তি তাঁর জীবনের উপর তাঁর প্রাণ-শক্তির উপর নির্ভর করে। চিন্তাকারীর চিন্তাকে তাঁর জীবন ভরা সাধনা দ্বারা নিজের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সাধক (Idealist) যখন তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে পরিপূর্ণভাবে তাঁর

আদর্শকে (ideal) বরণ করে নেন, যখন এই আদর্শে তিনি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন, যখন তাঁর আদর্শকে তিনি নিখুঁত ও পরিপূর্ণরূপে দেখ্‌তে পান, যখন তিনি এই আদর্শকেই তাঁর সমস্ত দেহ, মন, প্রাণ সমর্পণ করেন, যখন এই আদর্শই তাঁর একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান ও জপ হয়ে দাঁড়ায়, তখনই এই আদর্শ পূর্ণরূপে তাঁর জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখনই তাঁর মহাভাবরূপী মহান্ আদর্শ তাঁর জীবনে মূর্ত্ত হ'য়ে পূর্ণরূপে শক্তিমান হয়। তখন সাধক (Idealist) তাঁর আদর্শ (ideal) হ'তে পৃথক থাকেন না। তখন সাধক তাঁর আদর্শের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হয়ে যান। তখন আদর্শ তাঁর ছায়া, আর তিনিই তার কায়া হয়ে যান। এরূপ জীবন্ত আদর্শকে কেহ পরাভূত করতে পারে না ; তিনি জগতে অপরাজেয়। তাঁর আদর্শ—তাঁর মহৎ চিন্তা অন্যান্য মানুষের জীবনে ফলপ্রসূ হতে বাধ্য। এরূপ মহাপুরুষের মন ও তাঁর ভাবরূপী (idealised) দেহের প্রতি কেন্দ্র হ'তে এমন মহাভাবের (great thought) প্রবল তরঙ্গ নির্গত হয় যে সে তরঙ্গের স্পন্দনে (vibration) সমস্ত মানুষের মন স্পন্দিত ও অভিভূত হয় এবং সেই মহাভাবে আবিষ্ট হয়। এই রূপেই একজন মহাপুরুষের জীবন কোটি কোটি মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন (transformation) সাধন করে ও মানবসমাজকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলে।

চিন্তার স্থূল রূপ হচ্ছে বাক্য। সাধকের শুভচিন্তা যখন বাক্যে পরিণত হয়, তখন তাহা বিকাশ লাভ করে, তাহার শক্তি বৃদ্ধি পায়, কারণ বাক্যের মধ্যে চিন্তা আরও সুস্পষ্ট ও পরিস্ফুট

হয়। বাক্য তার শক্তি পায় চিন্তা থেকে। চিন্তা যখন প্রগাঢ় হয় তখন তাহা বাক্যে রূপ নেবেই। গর্ভস্থ শিশু যেমন ভূমিষ্ঠ হবেই, সেইরূপ মানব-মনের চিন্তা প্রগাঢ় হ'লে তাহা বাক্যে রূপ গ্রহণ ক'রবেই। চিন্তা যতই বৃহৎ হয়, যত গভীর এবং প্রগাঢ় হয়, যত ব্যাপক হয়, বাক্যের শক্তিও তত বড় হয়।

চিন্তা জাগ্রত হয় চিন্তা দ্বারা। আবার চিন্তা জাগ্রত হয় বাক্য দ্বারা। সব মনের গ্রহণ ক'রবার ক্ষমতা (receptivity) সমান নয়, সকলে চিন্তাশীল নয়, অধিকাংশ মনই স্থূলে বিচরণ করে। স্থূল চিন্তার রূপ যে বাক্য তাহা দ্বারাই তাদের প্রাণে চিন্তাকে জাগ্রত ক'রতে হয়।

চিন্তার পিছনে যখন শক্তি থাকে তখন তাহা বাক্যে আসতে বাধ্য। বাক্যে মূর্ত্ত হ'লে তাহা কার্য্যেও আস্‌তে বাধ্য। বাক্যে এলে চিন্তার অর্দ্ধেক কাজ হ'য়ে যায়। চিন্তা একবার বাক্যস্তরে নেমে এলে স্থূল জগতে ইথার-সমুদ্রে তরঙ্গায়িত হতে থাকে। জগতের একপ্রান্তে একটি মানুষ একটি মহৎ নিঃস্বার্থ এবং পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর কল্যাণকামী শক্তিমান্ বাক্য উচ্চারণ করলেই তাহা সর্ব্বত্র ধ্বনিত হবে। আর যদি এই চিন্তার পিছনে তাঁর জীবনভরা সাধনা থাকে তা' হলে চিন্তাজগতে ও বাক্যজগতে এই চিন্তা ও এই বাক্য মুহুর্মুহু ধ্বনিত হবে। সমস্ত নরনারীর মনের দুয়ারে তাহা আঘাত করবে, যেখানে যেখানে মানবমনের দুয়ার খোলা পাবে সেইখানেই এই চিন্তা প্রবেশ করবে। যেখানেই মানুষ একই রকমের আলোচনা কর্‌ছে, সেখানেই এই বাক্য তাহার বাক্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশ হবার চেষ্টা কর্‌বে। কখনও কখনও মানুষ না ভেবে চিন্তে বড় কথা ব'লে ফেলে।

এর কারণ চিন্তাজগতের শক্তিমান চিন্তার তরঙ্গ, তার অসংবিদের (Subconscious) উপর কাজ করে, অজ্ঞাতসারে তার বাক্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশ হয়ে যায়। এই বাক্যের পিছনে তার নিজের চিন্তা না থাক্‌লেও কোনও শক্তিসম্পন্ন মনের চিন্তা রয়েছে বুঝতে হবে। রেডিয়োতে (radio) আমরা দেখছি ইথারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ বিকম্পন দূর দূরান্তরে চলে যায় এবং দূরস্থ যন্ত্রে ধরা পড়ে। এই বিকম্পনকে শক্তি-সংযুক্ত ক'রে না দিলে তাহা বিস্তৃত হ'তে হ'তে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যায়, দূরস্থ যন্ত্রে ধরা পড়ে না। এ গেল যন্ত্রের কথা, বৈদ্যুতিক শক্তির কথা। সাধারণতঃ মানুষ যে সব কথা বলে তাহার কি হয়? মানুষের প্রত্যেক কথাই ইথার তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। যতক্ষণ এই বাক্যের শক্তি আমাদের শ্রুতিগোচর হবার মত থাকে, ততক্ষণ আমরা একজন অপরের কথা কাণে শুনতে পাই। এই যে আমরা একজন আর একজনের কথা শুনি, তাহা কাণ দিয়ে ততখানি শুনি না, যতখানি মন দিয়ে শুনি। প্রকৃতপক্ষে কাণ শুনে মুখের কথা নয়, মন শুনে মনের কথা। দুটি মন যখন নিম্নস্তরে থাকে তখন একজনের কথা অপরের শুনবার উপায় হচ্ছে বাক্যদ্বারা, শব্দদ্বারা। আবার এই মন দুটি যখন উচ্চস্তরে উঠে তখন একজনের মনের কথা আর একজন শব্দ ছাড়াও শুন্‌তে পায়। এই যে বলা ও শুনা এখানেও শক্তির প্রয়োজন। যে বল্‌ছে তার বাক্যের শক্তি থাকা চাই, আর অপরকে শুনাবার ইচ্ছা থাকা চাই, তবেই তার বাক্যের গতিবেগ (momentum) হবে। একদিকে যেমন শক্তিমান বাক্য বক্তার ইচ্ছাশক্তি সংযুক্ত হওয়া চাই,

অপরদিকে শ্রোতার মনও গ্রহণের জন্য উন্মুখ হওয়া চাই, এই বাক্য ধরার জন্য উদ্‌গ্রীব হওয়া চাই। তা' হলেই একজনের মনের কথা আর একজন অতি সহজে ধরতে পারে। আর যখন শ্রোতা রয়েছেন স্থূল জগতের স্তরে (grosser plane) কর্ম্মের জগতে, আর বক্তা রয়েছেন চিন্তার জগতে তখন শ্রোতার মনকে চিন্তা দিতে হলে, বক্তাকে তাহার মনের চিন্তাকে আরও বড় ক'রে আরও জোরে শুনাতে হবে। চিন্তাকে, মনের কথাকে তখন স্থূলরূপ দিয়ে, শব্দায়িত ক'রে শুনাতে হবে, যাতে চিন্তার তরঙ্গ আরও প্রবল হয়। এই বাক্য নিকটের লোক যারা—তারা কাণে শুনে, মনেও শুনে, যারা দূরে থাকে তাদের কাছে এই শব্দের অন্তর্নিহিত চিন্তা ভাস্‌তে ভাস্‌তে গিয়ে তাদের মনে আঘাত করে। তারা কাণে না শুনলেও, তাদের মনে এই চিন্তা-তরঙ্গের ঢেউ লাগে। তাহাও সকলে ধরতে পারে না। যারা চিন্তাশীল, উচ্চচিন্তা করে তারাই তাহা ধরতে পারে। তাদের ভিতর দিয়েই অন্যে পরে ধরতে পারে। কিন্তু একই লক্ষ্য ধরে সকলকে কাজ করাতে হলে তখন মূল চিন্তাটিকে স্থূলরূপ দিয়ে তাহা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হয়।

বাক্যের শক্তিরও তারতম্য আছে। কোনও বাক্য মানুষের প্রাণে বাজে, কোনও বাক্য বাজে না; কোনও বাক্যে মানুষের প্রাণ সাড়া দেয়, কোনও বাক্যে দেয় না। কোনও বাক্যে মানুষের চৈতন্যশক্তি জাগ্রত হয়, কোনও বাক্যে হয় না। কোনও বাক্যে মানুষের ক্রোধ প্রদীপ্ত হয়ে উঠে, কোনও বাক্যে তার প্রাণে শান্তি আসে, আনন্দের উদয়

হয়। কোনও বাক্য মানুষের পশুভাবকে জাগ্রত ক'রে দেয়, কোনও বাক্য মানুষের দেবত্বকে উদ্বুদ্ধ করে। সুচিন্তা কুচিন্তা যেমন আছে, সুবাক্য কুবাক্যও আছে এবং তাদের শক্তিরও ইতরবিশেষ আছে। বাক্য চিন্তারই একটি রূপ মাত্র,—স্থূল রূপ, শব্দায়মান রূপ। বাক্যেরও ছোট বড় আছে, সৎ অসৎ আছে। ছোট বাক্য প্রাণে ছোট ভাব জাগায়, বড় বাক্য প্রাণে বড় ভাবের সৃষ্টি করে। চিন্তা বড় হলেই যেমন তার দ্বারা বড় কাজ হয় না, তাহা বড় ইচ্ছা সংযুক্ত হওয়া চাই, সাধকের প্রাণশক্তিতে শক্তিমান হওয়া চাই, বড় বাক্যের পিছনেও সেইরূপ বড় ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই, বক্তার সমস্ত প্রাণশক্তিতে তাহা ভরা চাই। ব্যক্তিবিশেষের একটি কথায় মানুষের সমস্ত জীবনের গতিই ফিরে যায়, আবার একজন মানুষের শত শত বাক্যও ফলদায়ক হয় না।

সৎ বাক্য, মহৎ বাক্য সদিচ্ছাপ্রণোদিত হলে, সাধকের পূর্ণ বিশ্বাসের দ্বারা বলবান হলে, সাধকের প্রেমশক্তিতে, তাঁর সমস্ত প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ হলে সেই বাক্যের শক্তি অসীম। তাহা দূরদূরান্তরে চলে যাবে, প্রতি ঘটে তাহা বেজে উঠবে। সমভাবাপন্ন প্রাণ যাঁদের প্রথমে তাঁদের প্রাণে এই বাক্য বেজে উঠবে, পরে তাঁদের ভিতর দিয়ে সকল নরনারীর প্রাণে প্রতিধ্বনিত হবে।

জগতে একটি সৎ চিন্তাও বৃথা যায় না। একটি সদিচ্ছা বহু জনের ভিতর সদিচ্ছাকে জাগিয়ে দেয়। সৎ বাক্য, শক্তিমান বাক্য কার্য্যে পরিণত হবেই হবে।

জগতে একটি শুভ ইচ্ছাও ব্যর্থ হয় না। একটি মানুষের

একটি প্রার্থনাও বৃথা যায় না। মানুষ যখন নিজের জন্য প্রার্থনা করে, তাতে তার নিজের কল্যাণ হয়, যখন দশ জনের জন্য প্রার্থনা করে তখন তার নিজের এবং অপর দশ জনেরই কল্যাণ হয়। যখন সে একটি দেশের জন্য প্রার্থনা করে তখন তার ও সেই দেশের কল্যাণ হয়। আর যখন সে সমস্ত জনমানবের কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করে তখন সমস্ত জগতেরই কল্যাণ হবে। এক দিন, দু দিন, দশ দিন পরে সেই শুভ চিন্তা, সেই শুভ বাক্য, সেই প্রার্থনা পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর জীবনে প্রতিফলিত হবেই হবে। সূক্ষ্ম জগতের ইহাই নিয়ম। ইহার কখনও ব্যতিক্রম হতে পারে না। ঋষিরা বলেছেন বাক্য ব্রহ্ম। নিঃস্বার্থ প্রাণের সদিচ্ছাসংযুক্ত মহদ্বাক্য ব্রহ্মশক্তিসম্পন্ন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আদর্শ কার্য্যকরী হয় কখন ?

আদর্শ কার্য্যকরী হয় স্থান কাল পাত্র ভেদে। এই যে মানব জাতির মহামিলনের চিন্তা, বিশ্বশান্তির চিন্তা, পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলিকে মিলিয়ে এক বিশ্বমিলনী (World-federation) গঠনের চিন্তা, সৃষ্টির আদিকাল থেকে তাহা চিন্তা জগতে রয়েছে। মানবজাতির সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির মহামিলনের চিন্তাও সৃষ্টিকর্ত্তার মনে ছিল। সূক্ষ্ম জগতে ভাব জগতে স্রষ্টার এই চিন্তা প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে এবং তরঙ্গায়িত হচ্চে। কালক্রমে, মানবজাতির হৃদয়মনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে, খণ্ডভাবে, এই আদর্শ, আধার অনুযায়ী, মানব মনে বিকশিত হয়ে উঠেছে। স্থান কাল পাত্র ভেদে এই আদর্শ মানবীয় চিন্তা, বাক্য এবং কার্য্যের ভিতর দিয়ে রূপ পরিগ্রহ করবার চেষ্টা করেছে। সূক্ষ্ম ভাবজগতে এই চিন্তা রয়েছে ; কিন্তু স্থূল জগতে তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। ধরাতলে স্বর্গ-রাজ্য স্থাপনের এই যে স্কীম দয়ানন্দ জগতকে দিলেন, এই স্কীমের মহাভাব এতদিন পূর্ণাবয়ব গ্রহণ করে নাই। এই পরিপূর্ণ আদর্শটী মানবমনে ফুটে উঠে নাই, এই মহাভাব মানব মনে জাগ্রত হয় নাই। তার কারণ, এতদিন কাল পূর্ণ হয় নাই।

সুদূর অতীতে প্রথমে গ্রীকরা, পরে রোমানরা পৃথিবীর সব দেশ জয় করে একটী বিশাল সাম্রাজ্য (World empire) গঠন করতে চেষ্টা করেছিলেন। রোমান চার্চ্চ যুদ্ধের দ্বারা পৃথিবীর সব দেশ জয় করে, পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করে এক বিশাল খৃষ্টান সাম্রাজ্য (Holy Roman Empire) গঠন করতে চেষ্টা করেছিল, এক বিশ্বজনীন ধর্ম্মের ভিত্তিতে 'সমস্ত মানবজাতিকে মিলিত করার চিন্তা তখনকার যুগের মানব মনের ভিতর দিয়ে এই ভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল। তুর্কিরাও এক বিশাল মুসলমান রাজ্য গঠন করতে চেয়েছিলেন। নেপোলিয়নও বাহুবলে বিশ্বজয় ক'রে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করতে চেয়েছিলেন। এ সব চেষ্টার পিছনে ছিল ক্ষুদ্রভাব, ক্ষুদ্র চিন্তা, ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের যশলালসা, সাম্রাজ্য-লিপ্সা। এ সবের পিছনে ধর্ম্ম ছিল না, ছিল অধর্ম্ম। এ সব শান্তি স্থাপনের চেষ্টা নয়, এ সবের দ্বারা জগতে অশান্তিরই সৃষ্টি হয়েছিল। তবুও এ সবের পিছনে অলক্ষ্যে মানবজাতিকে এক করারই চেষ্টা ছিল। তখনকার যুগের অপরিণত মন ও অশুদ্ধ আধারের ভিতর দিয়ে ইহা—এই ভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ১১৮২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে একজন ধর্ম্মপ্রাণ সূত্রধর জননী মেরীর দৈববাণী অনুসারে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বদ্ধ-পরিকর হবার জন্য একটী সঙ্ঘ স্থাপন করেন। তার নাম দেন "ভগবানের সন্তানসঙ্ঘ" ("Confraternity of God") বা "শান্তিসঙ্ঘ" ("Brethren of Peace")। তাঁরা যুদ্ধ-নিবারণের জন্য তাঁদের সাধ্যমত কিছু কাজও করেছিলেন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে পিয়ারি ডুবস্ (Pierre Dubois) "ধর্ম্মরাজ্যের পুনরুদ্ধার" (The Recovery of the Holy Land) নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ও ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ডকে তাহা উৎসর্গ করেন। এই পুস্তকে তিনি যুদ্ধনিবারণের জন্য ও আপোষে বিভিন্ন জাতির বিবাদ মীমাংসার জন্য একটী রাষ্ট্রসঙ্ঘ (League of Governments) ও আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপনের আদর্শ দেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রিন্স্ চার্ল্সের পরামর্শদাতা উইলিয়ম অব্ শিভর্ (William of Chievres) যুদ্ধনিবারণের জন্য একটী "শান্তিসঙ্ঘ" (League of Peace) স্থাপনের স্কীম দেন। বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের নিয়ে এই শান্তিসঙ্ঘ (federation of sovereigns) গঠিত হবে ও তাঁরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়ে আপোষে সকল বিবাদের মীমাংসা ক'রবেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে এমেরিক্ ক্রুসি (Emeric Cruce) "নিউ সাইনিয়াস" New Cyneas, নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি যুদ্ধনিবারণের জন্য ও আন্তর্জাতিক বিবাদের আপোষে মীমাংসার জন্য একটী রাষ্ট্রসঙ্ঘ (League) গঠনের প্রস্তাব করেন। যুদ্ধে কত রকমের আর্থিক ক্ষতি হয় এ বিষয়ে তিনি নানারূপ মৌলিক যুক্তি দেন।

এমেরিক ক্রুসির প্রস্তাবের প্রভাবে সপ্তদশ শতাব্দীতে হিউগো গ্রোশিয়াস্ (Hugo Grotius) আন্তর্জাতীয় আইনের (International Law) দ্বারা পৃথিবীর স্বতন্ত্র জাতিগুলির পরস্পরের প্রতি আচরণ সুনিয়ন্ত্রিত করবার প্রস্তাব করেন।

যুদ্ধবিগ্রহ তিনি তুলে দিতে চান নাই। যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ক'রে নিয়ে কিরূপ ধর্ম্মসঙ্গত ভাবে ("war conducted religiously") যুদ্ধ করা উচিত তিনি সেই আদর্শ দিয়েছিলেন। আর মধ্যে মধ্যে ইউরোপের খৃষ্টান রাজ্যগুলি একস্থানে মিলিত হয়ে যাতে নিজেদের মধ্যে বিবাদ আপোষে মীমাংসা ক'রে নেন তার কথাও বলেছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশের রাজা চতুর্থ হেনরী (Henry IV) ইউরোপে শান্তিস্থাপনের জন্য একটী রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের "মহা প্রস্তাব" ("Great Design") করেন। পশ্চিম ইউরোপকে ১৫টী রাজ্যে বিভক্ত ক'রে, প্রত্যেকের শক্তি সমান ক'রে দিয়ে, সকলকে নিয়ে একটী রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এই ছোট ছোট রাজ্যগুলির ৬৪ জন প্রতিনিধি নিয়ে একটী কাউন্সিল গঠিত হবে। এই কাউন্সিল রাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদের মীমাংসা করবে ও আন্তর্জাতিক সেনা ও নৌবহর তার সহায়তা করবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্ত্তা হবেন সম্রাট। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত সালির স্মৃতিলিপিতে (Sully's Memoires) এই প্রস্তাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রস্তাবের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল অষ্ট্রিয়ার রাজপরিবারকে বিতাড়িত করা।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন চতুর্দ্দশ লুই (Louis XIV) ইউরোপকে বিধ্বস্ত করেন, তখন উইলিয়ম পেন্ (William Penn) ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে Essay towards the Present and Future Peace of Europe নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন ও তাতে ইউরোপে কিরূপে স্থায়ী শান্তি

স্থাপন করা যায় তার এক প্ল্যান্ দেন। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদের মীমাংসার জন্য তিনি একটী ইউরোপীয় পার্লামেণ্ট (European Parliament) গঠন করতে চান। এই পার্লামেণ্টে বিভিন্ন জাতিগুলি তাদের আয়ের পরিমাণ অনুসারে প্রতিনিধি পাঠাবেন। যে জাতি পার্লামেণ্টের আদেশ অমান্য করবে অন্যান্য সমস্ত জাতি মিলিত হয়ে সেই বিদ্রোহী জাতিকে শাস্তি দিবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে আবে দি সেণ্ট পিয়ারি (Abe de Saint Pierre) ইউরোপের "খৃষ্টান" জাতিগুলির মধ্যে এক চিরন্তন সন্ধি (perpetual alliance) স্থাপন করার প্রস্তাব করেন। তিনি ১৯টী রাজ্যের প্রতিনিধি নিয়ে ফ্রান্সের আধিপত্যে একটী ইউরোপীয় কংগ্রেস (European Congress) গঠন করতে চান। এই কংগ্রেসের একটী পৃথক্ তহবিল থাকবে ও কিরূপ ক্ষেত্রে বিদ্রোহী রাজ্যের বিরুদ্ধে অন্যান্য রাজ্যগুলি মিলিত হয়ে যুদ্ধ করবে তাই বিবেচনা করবে। এই প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপ হতে তুর্কিশক্তিকে বিতাড়িত করা।

ইউরোপের কোন কোন দার্শনিকও শান্তি স্থাপনের জন্য চিন্তা করেছেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseau) আবে সেণ্ট পিয়ারির, "চিরস্থায়ী সন্ধি" (Paix perpituelle) নামক গ্রন্থখানির নূতন সংস্করণ লিখতে আরম্ভ করেন ও তাঁর শান্তি স্কীমের বিশেষ পক্ষপাতী হয়ে উঠেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি A lasting Peace through the Federation of Europe নামক গ্রন্থে ইউরোপে একটী

রাষ্ট্রসঙ্ঘ (Federation of Europe) গঠন ক'রে চিরস্থায়ী শান্তিস্থাপনের আদর্শ দেন। কিন্তু এই আদর্শ দিয়েও তিনি নিজেই এতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নাই। কারণ তখন একমাত্র ইংলণ্ড ছাড়া ইউরোপের সর্ব্বত্র যথেচ্ছাচার রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। যথেচ্ছাচারী রাজারা স্বেচ্ছায় যে তাঁদের স্বাধীনতা খর্ব্ব ক'রে একটী আন্তর্জাতিক কাউন্সিলের পরামর্শমত কাজ করবেন ও নিজেদের সৈন্য সামন্ত উঠিয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক সেনা দ্বারা রাজ্য শাসন করতে রাজি হবেন এ বিশ্বাস তাঁর ছিল না। তাই তিনি নিজেই একটী প্রবন্ধে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের যত গলদ ঘটতে পারে তাহা দেখিয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম্ (Jeremy Bentham) একটী সার্ব্বজনীন চিরস্থায়ী শান্তির ("A plan for universal and perpetual peace") প্ল্যান্ দেন। তিনি আন্তর্জাতিক আইন বিধিবদ্ধ ক'রবার, অস্ত্রশস্ত্র কমাবার, পরাধীন দেশগুলিকে স্বাধীন করবার এবং একটী আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপন করবার জন্য প্রস্তাব করেন। তিনি পাশবিক বলের দ্বারা বিদ্রোহী রাজ্যকে শাসন করতে চান নাই। তিনি স্বাধীন প্রেসের সাহায্যে আন্তর্জাতীয় জনমতের দ্বারা অবাধ্য রাজ্যকে শাস্তি দিতে চান। তিনি নৈতিক বলের উপরই বেশী আস্থা স্থাপন করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ দার্শনিক ইম্যানুয়েল ক্যাণ্ট (Immanuel Kant) তাঁর "চিরস্থায়ী

শান্তি" (Project for a Perpetual Peace) নামক গ্রন্থে এক জগদ্ব্যাপী "স্বাধীন-রাষ্ট্র-সঙ্ঘে"র (Federation of free states) আদর্শ দেন। জগতের ইতিহাসে ইহাই জগদ্ব্যাপী সার্ব্বজনীন রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রথম সুস্পষ্ট স্কীম। এই স্কীমে প্রতি রাজ্যে সাধারণতন্ত্র শাসনপদ্ধতি (republic) প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এই রাজ্যগুলি মিলে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হবে। এই রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা রাজ্যগুলির সম্বন্ধ নিয়মিত হবে। রাজ্যের প্রতি নর নারী বিশ্বরাজ্যের প্রজা (World citizen) ব'লে নিজেকে মনে করবেন। স্থায়ী সেনা (Standing army) উঠিয়ে দিতে হবে। ক্যাণ্টের স্কীমের মধ্যে দুটী জিনিষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, তাঁর বিশ্বাস সমস্ত মানবজাতি শেষে এক জগদ্ব্যাপী মহারাষ্ট্রে পরিণত হবে ইহাই ভগবদিচ্ছা। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর বিশ্বাস আর্থিক অবস্থায় বাধ্য হ'য়ে চিন্তাশীল মানুষেরা জগৎ হ'তে যুদ্ধপ্রথা উঠিয়ে দিবে। * ক্যাণ্টের এই জগদ্ব্যাপী রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্কীম অন্যান্য সকল স্কীম অপেক্ষা ব্যাপক ও উৎকৃষ্ট। কিন্তু তিনি এটা যে সম্ভবপর ব্যাপার তাহা মনে করেন নাই। তাঁর মতে এটা একটা সুন্দর আদর্শমাত্র। মানুষ চিরদিনই এই আদর্শ অনুসরণ ক'রে চল্‌বে।

জার্ম্মান্ দার্শনিক ফিক্টে (Fichte) ক্যাণ্টের মতের

---

* "He held that it was the divine intention that mankind should ultimately be united in a world-state...... Kant believed that economic conditions would compel reasonable men to eliminate war."

Gettell : *History of Political Thought*, p. 316.

সমর্থন করেন ও জগতের চরম আদর্শ যে জগদ্ব্যাপী এক রাষ্ট্রসঙ্ঘ (World-federation) তা স্বীকার করেন। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ দার্শনিক হেগেল (Hegel) রাজনীতিক দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে জাতিদের বেঁচে থাক্‌তে হ'লে যুদ্ধ করতেই হবে। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য। চিরস্থায়ী শান্তি বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ তাতে প্রত্যেক জাতির ভিতরে নানা রকম অশান্তি, উপদ্রব ও ব্যভিচার ঘটে। কিন্তু হেগেল্ ফিক্টের মত এ কথা স্বীকার করেছেন যে প্রত্যেক জাতিরই বৈশিষ্ট্য আছে ও নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তারা বিশ্বসভ্যতা-ভাণ্ডারে তাদের আপন আপন উপহার দান করে। হেগেলের শিষ্য হ'য়েও ইংরাজ দার্শনিক গ্রীন্ (Green) জগদ্ব্যাপী এক রাষ্ট্রসঙ্ঘ (World federation) প্রতিষ্ঠার আদর্শকে গ্রহণ করেছেন। তিনি এই রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারা প্রতি রাষ্ট্রের শক্তি নিয়ন্ত্রিত করতে চান। তাঁর মতে যুদ্ধ অবাঞ্ছনীয় ও রাষ্ট্রের অপূর্ণ অবস্থারই পরিচায়ক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রুশিয়ার জার "খৃষ্টান যৌথ-পরিবারের" (Christian Commonwealth) আদর্শে সমগ্র ইউরোপীয় জাতিগুলিকে একতাবন্ধনে আবদ্ধ করার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবের ফলে নেপোলিয়ানের যুদ্ধের অবসানে ইউরোপীয় প্রধান রাজশক্তিরা শান্তিস্থাপনের জন্য এক "পবিত্র সন্ধি" সূত্রে ("Holy Alliance") আবদ্ধ হয়। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইহাই প্রথম কার্য্য। যে সমস্ত জাতি খৃষ্টান ধর্ম্মের মূলনীতি, ন্যায়, শান্তি ও ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করেন তাঁদিগকে

"অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ব" ("indissoluble fraternity") বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে নিমন্ত্রণ করা হয়। ইহার ফলে Concert of Europe এর সৃষ্টি হয়।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে "আমেরিকান্ শান্তি সমিতি" ("American Peace Society") স্থাপিত হয়। আজ এক শত বৎসর ধরে এই শান্তি সমিতি আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা জগতে শান্তি রক্ষার কথা মানুষকে শুনিয়ে আসছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম্ ল্যাড্ (William Ladd) Essay on a Congress of Nations নামক গ্রন্থে একটী আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের আদর্শ দেন। এই কংগ্রেস বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদের মীমাংসা ক'রবে ও যুদ্ধ হ'তে সমস্ত জাতিকে বিরত ক'রে চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপন করবে। আন্তর্জাতিক সেনা কেবল প্রহরীর কাজে নিযুক্ত থাক্‌বে।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে পারস্যের বাহাই (Bahai) সম্প্রদায়ের গুরু ঋষি বাহাউল্লা সমস্ত মানবজাতির শান্তির কথা বলেন। তিনি একটী আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপন করে সালিশীর দ্বারা পৃথিবীর সব জাতির বিসংবাদের মীমাংসা ক'রে নিতে বলেছেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম হেগ্ কন্‌ফারেন্স্ (First Hague Conference) আহূত হয়। তাতে অস্ত্রশস্ত্র কমাবার চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। তবে ইহার ফলে হেগে একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় (Hague Tribunal) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় হেগ কন্‌ফারেন্স্ (Second Hague Conference) আহূত হয়।

জগতের ইতিহাসের প্রথম হতেই রাষ্ট্রের দিক দিয়ে যেমন

সমস্ত জগৎকে এক করার চিন্তা হয়েছে, তেমনি অর্থনীতির দিক দিয়েও সমস্ত মানবজাতিকে একটী আদর্শ যৌথপরিবারে (Commonwealth) পরিণত করার চিন্তাও ইতিহাসের প্রথম হতেই হয়েছে। সর্ব্বপ্রথমে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্লেটো (Plato) রাষ্ট্রকে অর্থনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি যে সাধারণতন্ত্রের (Republic) চিত্র এঁকেছিলেন তাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Private property) ও পারিবারিক জীবন (family life) উঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই রাজ্যে তিন সম্প্রদায় মানুষ থাকবে—মজুর, সৈনিক ও শাসক। যার যেরূপ যোগ্যতা সে সেইরূপ কাজ করবে। প্লেটো মজুর ও সৈনিক সম্প্রদায়ের বিষয়ে বিশেষ কিছু বলেন নাই। শাসক সম্প্রদায় আদর্শ, চিন্তাশীল, অভিজ্ঞ, নিস্বার্থ সাধুরা হবেন। যীশুখৃষ্ট তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে নিয়ে একটী আদর্শ যৌথপরিবার গঠন করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যাঁদের ধনসম্পত্তি বেশী ছিল তাঁরা সে সমস্ত সকল শিষ্যদের মধ্যে সমানভাগে বেঁটে দেন। যীশুর শিষ্যরা তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি উঠিয়ে দিয়ে সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজন মত সাধারণ সম্পত্তি ভোগ করতেন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে সার্ টমাস্ মোর (Sir Thomas More) তাঁর ইউটোপিয়া (Utopia) নামক গ্রন্থে প্লেটোর অনুকরণে জগদ্ব্যাপী এক আদর্শ যৌথপরিবারের চিত্র অঙ্কন করেন। মোর্ যুদ্ধের অত্যন্ত নিন্দা করেন। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিকেই (private property) মানবসমাজের প্রধান ব্যাধি ব'লে মনে করেন। তাঁর আদর্শ যৌথপরিবারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না, টাকাকড়ি থাকবে না ও প্রত্যেক সমর্থ লোকই

কাজ করবে। তিনি বলেন জগতে যে দিন সাধারণ সম্পত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে সেইদিন হ'তে জগতে চিরস্থায়ী শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করবে। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে টমাস্ ক্যাম্যানেলা (Thomas Campanella) তাঁর সিটি অব্ দি সান্ (The City of the Sun) নামক গ্রন্থে প্লেটোর মত এক আদর্শ যৌথপরিবারের কল্পনা করেন। সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাক্‌বে না। এমন কি ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনও থাকবে না। প্রত্যেক মানুষই রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিশ্রম করবে ও সাধারণ জীবন যাপন করবে। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে জেমস্ হ্যারিংটন্ (James Harrington) তাঁর The Commonwealth of Oceana নামক গ্রন্থে একটী আদর্শ যৌথপরিবারের চিত্র অঙ্কন করেন। তিনিও প্লেটোর মত রাষ্ট্রকে অর্থনীতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চান : তিনি এই নিয়ম করতে চান যে কোন মানুষই কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমির বেশী ভোগ করতে পারবে না। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে মরেলি (Morelly) ও সমস্ত জমি সমানভাবে সকলের মধ্যে বেঁটে দিয়ে সমাজের আর্থিক বৈষম্য দূর ক'রে দিতে চান। বর্ত্তমান সাম্যবাদের (Socialism) জন্ম উনবিংশ শতাব্দীতে। সাম্যবাদ নানারূপ শ্রমিক-ধনিকের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে চায়।

কবি ও সাহিত্যিকরাও কেহ কেহ রাষ্ট্রসঙ্ঘের চিন্তা করেছেন। কবি দান্তে (Dante) সমগ্র ইউরোপের জন্য এক বিশাল সাম্রাজ্যের চিত্র এঁকেছেন। এই সাম্রাজ্যের একজন একচ্ছত্র সম্রাট্ হবেন। তিনি একমাত্র ন্যায় ও ধর্ম্মকে লক্ষ্য ক'রে এক সার্ব্বজনীন আইনের দ্বারা এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করবেন। ইমারসন্ (Emerson) ও ভিক্টর হিউগো (Victor

Hugo)·বিশ্বসাধারণতন্ত্রের (World Republic) স্বপ্ন দেখে গেছেন। চিন্তাশক্তি সম্বন্ধে ইমার্‌সন একটি সুন্দর কথা * বলেছেন :—"একটি চিন্তাধারাকে অবলম্বন ক'রেই যুদ্ধ সম্পর্কীয় এই বৃহৎ ব্যাপার গ'ড়ে উঠেছে, আর একটি চিন্তার শক্তিই ইহাকে বিলীন ক'রে দেবে।" টেনিসন্ (Tennyson), শেলি (Shelley) ও হুইট্‌ম্যান্ (Whitman) কবিদৃষ্টিতে দেখেছেন যে পৃথিবী হ'তে যুদ্ধ উঠে গেছে, পৃথিবীর সব দেশ ও জাতি মিলিত হ'য়ে বিশ্বমিলনী (World-federation) গঠন করেছে, বিশ্বমানবের মহাসভা (Parliament of Man) বসেছে, এবং সমগ্র জগৎ এক মহাভ্রাতৃত্ব (Brotherhood) বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

ইউরোপের চিন্তাশীল মনীষী ও দার্শনিকদের এই সব চিন্তার ভিতর বিশেষ অপূর্ণতা রয়ে গেছে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিবলে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ ক'রে তাঁরা এই চিন্তা পান নাই। তাঁদের সময়ের জাগতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করতে করতে তাঁরা এই চিন্তায় উপনীত হয়েছিলেন। তাঁরা অন্তর্দৃষ্টিবলে এই চিন্তা পান নাই, তর্কবিচার ক'রে পেয়েছিলেন। তাঁরা বুদ্ধির অতীত অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা এই সত্য পান নাই, বুদ্ধির দ্বারা, পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা পেয়েছিলেন। এই সত্য তাঁদের অনুভূত সত্য নয়, কল্পিত সত্য। তাঁরা পার্থিব বিষয়ে চিন্তা করতে করতে বিশ্বশান্তিরূপ বিরাট চিন্তার যিনি যতটুকু ধরতে পেরেছেন তিনি ততটুকুই প্রকাশ করেছেন।

---

* "It is really a thought that built this portentious war-establishment, and a thought shall also melt it away."

তাঁদের মন পার্থিব জগৎ ছাড়িয়ে ঊর্দ্ধলোকে গিয়ে সত্য আহরণ ক'রে মানব জগতে নেমে এসে সত্যের প্রচার করে নাই। এমন কি নবযুগের একজন অগ্রদূত ঋষি বাহাউল্লাও এই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠারূপ বিরাট সত্যকে মাত্র আংশিকরূপে উপলব্ধি করেছিলেন।

ইউরোপের দার্শনিকগণ প্রধানতঃ ইউরোপের কথা, ও বিশেষ ক'রে খৃষ্টান জাতিগুলির কথাই চিন্তা করেছেন। বিশ্বশান্তিকে তাঁরা তাঁদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি দ্বারা বহু দূর হ'তে দেখেছেন। তাই তাঁদের দর্শনের ভিতর ভ্রমপ্রমাদ রয়ে গেছে। বিচারের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, পরোক্ষ জ্ঞানের আলোকে, তাঁরা এই বিরাট আদর্শের যতটুকু দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁরা ততটুকুই দিয়ে গেছেন। আবার এই আদর্শ তাঁরা মানুষের সামনে ধ'রে নিজেরাই তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নাই। তাঁদের আদর্শ যে কার্য্যকরী হতে পারে তাহা নিজেরাই বিশ্বাস করেন নাই। তাঁদের চিন্তা, তাঁদের আদর্শ তাঁদের জীবনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। তাই তাঁদের আদর্শ কল্পনারাজ্যের অবাস্তব পদার্থই রয়ে গেছে। তাঁরা দয়ানন্দ-স্কীমের ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে গিয়েছেন। তখনকার দিনে এর বেশী করার সময় হয় নাই।

মহাপুরুষ যীশু খৃষ্ট স্বর্গরাজ্যের (Kingdom of Heaven) আভাস জগৎকে দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে ও পরে তাঁর ভক্তদের প্রাণে তাঁর চিন্তা, তাঁর ভাবরাজি মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর ভক্তদের ভিতর এক দল লোক সর্ব্বস্ব বিক্রয় ক'রে যৌথভাণ্ডারে দিয়ে এক যৌথ-পরিবারের (Commonwealth) সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু কালস্রোতে তাহা অল্পদিনেই মুছে গেল।

তখনকার দিনে ধরাতলে স্বর্গরাজ্যস্থাপনের বিরাট চিন্তার পূর্ণ অভিব্যক্তির সময় হয় নাই। ধরাতলে স্বর্গরাজ্যস্থাপনের সমস্ত উপাদানগুলি তখনও সংগৃহীত হয় নাই। তখনকার দিনে পৃথিবী ছিল খণ্ড বিচ্ছিন্ন, আজকার দিনের মত পৃথিবী একটী দেশে পরিণত হয় নাই। এক স্থানে এই স্বর্গরাজ্যস্থাপনের চেষ্টা হলেও পারিপার্শ্বিক জগৎ সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিত। তখনকার দিনে সমগ্র জগৎকে এক করা সম্ভবপর ছিল না।

এই ধরাতলে স্বর্গরাজ্যস্থাপন করতে হ'লে সর্ব্বপ্রথমে জগতের সমস্ত নরনারীর দৃষ্টিকে আধ্যাত্মিকতার দিকে ফিরাতে হবে, ভগবদ্‌জ্ঞানহীন মানুষকে ভগবানের জন্য উন্মুখ করতে হবে। কিন্তু তখনকার দিনে আধ্যাত্মিকতার দিকে, ভগবানের দিকে মানুষের অতিরিক্ত দৃষ্টি পড়লে জড়বিজ্ঞানের (Science) পূর্ণ বিকাশ হ'ত না, বর্ত্তমান ভোগপ্রধান সভ্যতার উদ্ভব হ'ত না। অথচ ধরাতলে স্বর্গরাজ্যস্থাপনের জন্যই বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ, মানুষের পার্থিব সুখসুবিধার চরম উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। আজ তাহা সুসম্পন্ন হয়েছে।

ধরাতলে স্বর্গরাজ্যস্থাপনের জন্য পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর সহযোগিতা চাই। তার জন্য জগতের সমস্ত জাতির লোকের ঘনিষ্ঠ যোগ প্রয়োজন। আজ রেল, ষ্টীমার, এরোপ্লেন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও প্রভৃতি প্রত্যেক দেশকে প্রত্যেকের ঘরের পাশে এনে দিয়েছে। সব দেশের লোক সব দেশে ভ্রমণ করছে, পরস্পর পরস্পরকে জানছে, বুঝছে। অতি সহজে তাদের ভিতর ভাবের আদান প্রদান হচ্চে।

ধরাতলে স্বর্গরাজ্যস্থাপনের আর একটী উপাদান হচ্চে

সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানের প্রসার, বহুমানবের মানসিক উৎকর্ষ। শ্রেণীবিশেষের শিক্ষা দীক্ষা, তাদের মানসিক উন্নতির উপর স্বর্গরাজ্য দাঁড়াতে পারে না। সর্ব্বসাধারণের মানসিক উন্নতির উপর, সর্ব্বসাধারণের সহযোগিতার উপরই স্বর্গরাজ্য গড়ে উঠতে পারে। আজকার দিনের মত তখনকার দিনে শিক্ষার বিস্তার হয় নাই, মানুষের বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় নাই, তার বিচারশক্তি, ধারণা-শক্তি প্রখর হয় নাই। মানবজাতির সেই বাল্যকালে আজকার দিনের জ্ঞানবুদ্ধি সম্ভব ছিল না। খৃষ্ট **ধরাতলে** স্বর্গরাজ্য স্থাপন করতে চান নাই ; চাইলে ও তিনি কৃতকার্য্য হতেন না। তিনি যে স্বর্গরাজ্যের ভাব দিয়েছিলেন তাহা একটা আধ্যাত্মিক অবস্থা মাত্র (Spiritual condition)। এর কার্য্যকরী দিকটা কিরূপ হবে তিনি তাহা দেখান নাই। রাজনীতি অর্থনীতির দিক্ দিয়ে তিনি যান নাই। তিনি বরং এই কথাই বলে গিয়েছেন "My father's Kingdom is not of this earth" (আমার পিতার রাজ্য পার্থিব বস্তু নয়)।

আজ কাল পূর্ণ হয়েছে। ধরাতলে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের সমস্ত উপাদানগুলি সংগৃহীত হয়েছে। আজ উপযুক্ত সময়ে এই বিরাট চিন্তাও মানুষকে দেওয়া হয়েছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাবের সঙ্গে দয়ানন্দ-স্কীমের ভাবের যোগ আছে, স্থানে স্থানে কমবেশী মিলও আছে। কিন্তু স্কীমের ভাব এত বিরাট, এত ব্যাপক, এত গভীর যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাব থেকে ইহাকে সম্পূর্ণ পৃথক বলা যেতে পারে। স্কীমের ভাবের সঙ্গে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাবগুলির তুলনা হয় না। স্কীমের ভাবের তুলনায় সেগুলি অতি অপূর্ণ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনস্বীদের চিন্তা পরিপূর্ণতা লাভ ক'রেছে এই স্কীমে। তাঁরা স্কীমের জন্যই

পথ প্রস্তুত ক'রে গিয়েছেন। স্কীমের ভাব জগতে অতুলনীয়। এর চেয়ে বড় চিন্তা আজ পর্য্যন্ত কেহ ধারণা করেন নাই। এত বড় কার্য্যকরী আদর্শ জগতের লোকের সামনে আজ পর্য্যন্ত কেহ ধরেন নাই। জগতের লোকের সামনে এই স্কীম ধরাটাই মানবজাতির ইতিহাসে এক মহা স্মরণীয় ঘটনা।

সপ্তম অধ্যায়

স্কীমের অনুসরণ

আমরা পূর্ব্বে বলেছি সৃষ্টির জন্ম মনে—চিন্তায়—ইচ্ছায়। শ্রীভগবানের চিন্তাই মানুষের মনের ভিতর দিয়ে নূতন নূতন সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পায়। শ্রীভগবানের ইচ্ছাই মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত ক'রে দেয়। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তা সব যন্ত্রে ধরা পড়ে না, তাঁর বিরাট ইচ্ছা সব প্রাণ ধারণা ক'রতে পারে না। শ্রীভগবানের সঙ্গে যাঁর পূর্ণযোগ হয়েছে, তাঁর চিন্তা, তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে যে সাধক নিজের চিন্তা, ইচ্ছা, ভাব, নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়ে দিয়েছেন, প্রথমে তাঁরই মনে এই চিন্তা, এই ভাব, এই ইচ্ছা জাগ্রত হয়। সেই সাধকের মনের ভিতর দিয়ে, তাঁরই চিন্তাকে অবলম্বন ক'রে মানবজাতির মনে চিন্তা জাগ্রত হয়। তাঁর ইচ্ছাই মানবজাতির প্রাণে ইচ্ছাকে জাগ্রত ও বলবতী করে। ক্রমে এই চিন্তা, এই ভাব প্রথমে বাক্যে, পরে মানবজাতির আচরণে মূর্ত্ত হয়ে উঠে। ইহাই লৌকিক জগতের নিয়ম।

দয়ানন্দের প্রাণে এল এক নূতন জগৎসৃষ্টির চিন্তা। ইহাকেই তিনি জীবনের সাধনা করলেন, তাঁর সমস্ত ইচ্ছাশক্তি এই কাজে নিয়োগ করলেন। তিনি চাইলেন মানুষের জীবনে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে, মানুষের মন ভগবানের দিকে ফিরিয়ে দিতে,

মানুষের মনে ভগবানের চিন্তা, ভগবানের স্মৃতি, ভগবদ্ভাব জাগিয়ে দিতে, জগতের চিন্তাধারাকে, কর্ম্মধারাকে পরিবর্ত্তিত ক'রে দিতে। চিন্তা প্রথমে রূপ নেয় বাক্যে, পরে তাহা কার্য্যে প্রকাশ হয়। দয়ানন্দ জীবকে অমৃতবারতা দিলেন। একটি দুটি ক'রে তাঁর শিষ্যমণ্ডলী গ'ড়ে উঠলো। তাঁর বিরাট চিন্তাকে তাঁরা গ্রহণ ক'রে, সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, সেই চিন্তাকে জীবনে মূর্ত্ত ক'রে তুললেন তাঁদের আশ্রমগুলিতে। দয়ানন্দের চিন্তার কার্য্য আরম্ভ হ'ল। যে দিন একটি ভক্ত এসে এই বিরাট চিন্তার কাছে আত্মসমর্পণ করলো, সেইদিন থেকেই জগতের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হ'ল। যেদিন এই চিন্তাকে রূপ দিয়ে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হ'ল, সেদিন থেকে এই চিন্তার কার্য্য দ্রুত হ'ল, এর শক্তি বৃদ্ধি হ'ল, বহুমানবের জীবনে তাহা মূর্ত্ত হওয়ার পথ সহজ হ'ল। একটি মানুষের পরিবর্ত্তনেই সমস্ত জগতের পরিবর্ত্তন; কয়েকটী মানুষ নিয়ে ভগবৎ-ভিত্তির উপর আশ্রমে যৌথ পরিবার প্রতিষ্ঠাই মানবজাতির যৌথ পরিবার প্রতিষ্ঠা। বীজের মধ্য হতেই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়।

আমরা বলেছি আদর্শ কার্য্যে পরিণত হয় কাল পূর্ণ হ'লে। সমস্ত বিশ্বমানব নিয়ে এই নূতন যৌথ পরিবার হবে। বিচ্ছিন্ন জগৎ আজ এক হয়েছে, মানবজাতির পরস্পরের সঙ্গে দেখাশুনা, মেলামেশা হচ্ছে, মানুষের সুখসুবিধার আরামের, তার পার্থিব উন্নতির নমুনা দাঁড়িয়েছে, মানবপরিবারের প্রত্যেককে এই সুখসুবিধা দেবার উপায় মানুষের হস্তগত হয়েছে। দয়ানন্দের স্কীম জগতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় হয়েছে। কিন্তু মানুষের মন ছিল বিপথগামী। যুদ্ধের অবসানে যখন মর্ম্মান্তিক আঘাত

পেয়ে মানুষের মন বিশ্বশান্তির দিকে ফিরলো, সেই শুভ মুহূর্ত্ত বুঝে দয়ানন্দ, যে চিন্তা এতদিন তাঁর মনে ছিল, তাঁর ভক্তদের জীবনে, তাঁর আশ্রমগুলিতে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল, সেই চিন্তাকে প্রণালীবদ্ধ করে বহির্জগতে প্রকাশ করলেন। এইরূপে জগতের চিন্তাধারাকেও তিনি প্রণালীবদ্ধ করে দিলেন। সমস্ত মানবজাতির জীবনে, জগতের চিন্তা, ভাব ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার ভিতর স্কীমের আদর্শানুযায়ী পরিবর্ত্তন সুরু হ'ল। এই পরিবর্ত্তন এক ভাবে নয়। বহুদিকে, বহুভাবে, আধার অনুযায়ী তাহা রূপ পরিগ্রহ করছে। অনন্তশক্তিশালী এই স্কীম প্রত্যেক মানুষের চিন্তা, ভাব ও কার্য্যের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠছে।

কি ভাবে এই স্কীম ব্যক্তির ও জাতির, ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে মূর্ত্ত হয়ে উঠছে তাহা আমরা এইবার দেখবো। প্রথমে আমরা দেখবো মানুষ কি ব'লছে। বাক্য থেকেই বুঝা যাবে মানুষ কি চিন্তা ক'রছে। আর আমরা দেখবো মানুষের কার্য্য। জগতের কর্ম্মের ধারা চলছিল এক পুরাতন প্রণালীতে। নূতন চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে জগতের কর্ম্মধারাতে কি এবং কতখানি পরিবর্ত্তন এসেছে তাহা আমরা বুঝে দেখবার চেষ্টা করবো। এতকাল মানুষ পুরাতন এক ভাবে মগ্ন ছিল। আমরা দেখবো মানুষের ভাবের কতখানি পরিবর্ত্তন এসেছে, পুরাতন ভাব ছেড়ে সে নূতন ভাবে কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছে। মানুষের বাক্য এবং কার্য্যই তাহার সাক্ষ্য দিবে।

স্কীমে দয়ানন্দ নিজের পরিচয় দিলেন "বিশ্বসুহৃদ" ব'লে। বিশ্বসুহৃদের ভাবসাধনা করবার জন্যই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। এই চিন্তা, এই কার্য্যই তিনি করছেন। আজ তিনি এই

ভাবটিকে বাক্যে রূপ দিলেন। তারে (Cable) স্কীম পাবার ৭।৮ দিন পরে, ইয়োরোপে একস্থানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট উইলসন নিজেকে "বিশ্বসুহৃদ" ব'লে ঘোষণা করলেন। ইহার কিছুদিন পরে, লয়েড্ জর্জ্জও নিজেকে "বিশ্বসুহৃদ" ব'লে পরিচয় দিলেন। চিন্তার অমোঘ শক্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দেখা গেল, জগতে বিশ্বসুহৃদের হাওয়াই বইছে। জগতের ভাব এখন এই ধারাতেই চলেছে।

প্রেসিডেণ্ট উইলসন তাঁর চতুর্দ্দশ সর্ত্তকে ভিত্তি ক'রে শান্তির প্রস্তাব করলেন। বক্তৃতাদিতে তিনি যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন তাহা হচ্চে Self-determination (প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বরাজ)। কিন্তু কার্য্যে পরিণত করার সময়ে তাঁর উচ্চ আদর্শ একেবারে খর্ব্ব হয়ে গেল। তাঁর চতুর্দ্দশ সর্ত্তের সর্ব্বপ্রধান যাহা, জাতিসঙ্ঘ স্থাপন (League or Association of Nations), তাহা কার্য্যে পরিণত হ'ল। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ শক্তিগুলি কেহ কাহারও রাজনৈতিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ক'রবে না, কেহ কাহারও রাজ্যসীমানা লঙ্ঘন ক'রবে না। উইলসন্ বু'ঝছিলেন, জাতিগুলি যতদিন পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন থাকবে ততদিন জাতিগত স্বার্থ নিয়ে তাদের ভিতর যুদ্ধ অনিবার্য্য। তাই তিনি চাইলেন জাতিগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রতে। তিনি জগৎসমস্যা দেখেছিলেন শুধু রাষ্ট্রনীতিকের চোখ দিয়ে, গভীর ভাবে, ব্যাপকভাবে নয়। তাই তাঁর চেষ্টা অতি ভাসা-ভাসা। তাঁর চতুর্দ্দশ সর্ত্তে ইয়োরোপের জাতিগুলিকে স্বাধীনতা দেবার কথা আছে, তুর্কীর সাম্রাজ্য সঙ্কোচনের কথা আছে, কিন্তু এসিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলিকে

স্বাধীনতা দেবার কোনও কথা নাই। জগৎসমস্যার মূল কারণ উইলসন ধ'রতে পারেন নাই, পৃথিবীর ধনসম্পদ নিয়ে জাতিতে জাতিতে যে হিংসাবিদ্বেষ, শ্রমিক-ধনিকের যে দ্বন্দ্ব, ধনী নির্ধনের পরস্পরকে উচ্ছেদ করবার যে চেষ্টা তার কোনও প্রতিবিধান তাঁর প্রাণে জাগে নাই। তাঁর জাতিসঙ্ঘ পৃথিবীর সমস্ত জাতির মিলন নয়। জাতিগুলি পূর্ব্বে যেমন পরস্পর হতে স্বতন্ত্র, স্ব স্ব স্বার্থান্বেষী, সর্ব্বদা যুদ্ধের ভয়ে শঙ্কিত, পরস্পরকে আঘাত করবার জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল, এখন ও তাহাই রয়ে গেল। যে পুরাতন মানবসমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল উইলসন মূলতঃ তাহাই মেনে নিলেন ও তাহাই একটু আধটু সংস্কার ক'রে সেই ভিত্তির উপরই তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চাইলেন। আমূল সংস্কারের চিন্তা তিনি ধ'রতে পারলেন না। জগতের আসল সমস্যাগুলি যেমন তেমনই রয়ে গেল।

তবুও উইলসনের ভিতর দিয়েই এই বিশ্বশান্তি চিন্তা জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে, রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশ পেল। জগৎকে তিনি শান্তির পথে একটুখানি অগ্রসর ক'রে দিলেন। অন্ধকারের ভিতর প্রথম আলো দেখা গেল।

রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়ে জগৎসমস্যা সমাধানের চেষ্টা করলেন উইলসন্। অর্থনীতির দিক দিয়ে, বহুমানবের সুখসুবিধার দিক দিয়ে আর এক চেষ্টা করলেন লেনিন্। উইলসন জগতের সমস্যার মূল কোথায় তাহা ধ'রতে পারেন নাই, লেনিন অনেক খানি পেরেছিলেন। সেই হিসাবে লেনিনের চেষ্টা বড় ও মূল্যবান। যুগ যুগ ধ'রে যারা দুঃখ কষ্ট ভোগ ক'রে এসেছে, তিনি চাইলেন সেই অসংখ্য জনগণের মঙ্গলসাধন ক'রতে,

তাদের পার্থিব অবস্থার উন্নতি ক'রতে। জগৎসমস্যার মর্ম্মস্থলে লেনিন্ আঘাত করলেন। কিন্তু তিনিও মূল সত্য ধ'রতে পারেন নাই। মানুষকে তিনি দেখলেন জড় বস্তুর সামিল ক'রে, শুধু তার ক্ষুধাতৃষ্ণার দিক দিয়ে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি তাঁর ছিল না। ভগবানকে বাদ দিয়ে তিনি নূতন মানবসমাজ গ'ড়তে চাইলেন। বালির উপর তিনি সৌধ নির্ম্মাণ ক'রতে চাইলেন। লেনিনের স্কীমের জন্ম প্রেমে নয়, অপ্রেমে, অখণ্ড মানবসমাজের মঙ্গল ইচ্ছায় নয়, অসংখ্যজনগণের দুঃখদারিদ্র্যের বেদনায়। শান্তি ক'রতে গিয়ে তিনি অশান্তি সৃষ্টি করলেন, সামঞ্জস্য করতে গিয়ে নূতন ক'রে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করলেন, এক শ্রেণীকে রক্ষা করতে গিয়ে আর এক শ্রেণীর উচ্ছেদসাধন করলেন। তাঁর বল ব্রহ্মবল নয়। তাঁর বল পিস্তলের গুলির। মানুষের হৃদয় মনের সংস্কার না ক'রে, তিনি গায়ের জোরে বাহিরে সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন। উইলসন্ ও লেনিন্ দয়ানন্দ-স্কীমের বিরাট ভাবকে, আধার অনুযায়ী যিনি যে দিক দিয়ে যতটুকু ধ'রতে পেরেছেন, তিনি সেই ভাবেই তাহা মূর্ত্ত ক'রে তোলবার চেষ্টা করেছেন। দুজনের চেষ্টার গতি দয়ানন্দ-স্কীমের দিকেই।

ইতালিতে আর এক আধারে, আর এক ভাবে এই স্কীম মূর্ত্ত হবার চেষ্টা ক'রছে। মুসোলিনী চাইলেন সমস্ত ইতালির সমাজকে নূতন ভাবে গঠন ক'রতে, সমস্ত সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে একই উদ্দেশ্যে তাকে চালিত ক'রে সমষ্টির মঙ্গল সাধন ক'রতে। তাঁর স্কীমে প্রভু (master) এবং ভৃত্য (slave) সম্বন্ধ দূর ক'রে দেশের সকলকে তিনি সহকর্ম্মী ক'রতে

চাইলেন। সাধারণ লোকের অন্নবস্ত্রসমস্যার তিনি সমাধান ক'রতে চাইলেন। কিন্তু সমষ্টির মঙ্গল সাধন ক'রতে গিয়ে তিনি ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ ক'রলেন। এ সমাজের প্রতিষ্ঠাও ভগবৎ ভিত্তির উপর নয়। এর বল ও বাহুবল। এখানেও ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হ'ল না, তার প্রাণের পরিবর্ত্তন না ক'রে বাহির থেকে এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হ'ল। যে ভাবেই হ'ক, এও সেই দয়ানন্দ-স্কীমকেই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর করবার চেষ্টা ক'রছে, এই বিশাল স্কীমকেই অনুসরণ ক'রে চলেছে।

এ হ'ল বৃহৎভাবে স্কীমের প্রচেষ্টা। খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রত্যেক দেশে এর কার্য্য চল্‌ছে। দেশের কথা, জগতের কথা, জনসমাজের কথা যে যেখানে চিন্তা করছে, যে যেখানে কার্য্য কর্‌ছে, প্রত্যেকের প্রাণের উপর এই স্কীমের কার্য্য চলছে। "কানু ছাড়া গীত নাই।" এখন 'জগৎ' ছাড়া কথা নাই। যে যেখানেই আজ কথা বলছে, সেই বড় কথা ব'লতে বাধ্য হচ্চে, সেই জগতের কথা ব'লছে, বিশ্বশান্তির কথা ব'লছে। মানুষের চিন্তা, মানুষের দৃষ্টি আজ ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম ক'রে সমস্ত জগৎকে ধ'রেছে। বিশ্বশান্তি মানবজাতির সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন এই বোধ দিন দিন মানুষের ভিতর ফুটে উঠছে। বিশ্বশান্তি আজ কল্পনার, চিন্তার, ভাবের সীমা অতিক্রম ক'রে, বাস্তবের ক্ষেত্রে, মানুষের সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এসেছে। প্রত্যেক দেশে চিন্তাশীল, ভাবুক, প্রেমিক লোকেরা শান্তির কথা বলছেন, মানবজাতির মিলনের কথা বলছেন, যুদ্ধবিরতির কথা বলছেন, অস্ত্র শস্ত্র বিসর্জ্জনের কথা

বলছেন। প্রত্যেক দেশে অসংখ্য নরনারী মিলিত হয়ে সভা সমিতি ক'রে দশ জনকে শান্তির দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। সেদিন রাষ্ট্রসঙ্ঘের (League of Nations) একজন সভ্য ঘোষণা করেছেন যে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে এক হাজারের উপর সার্ব্বজাতিক সভা সমিতি (international congress and conferences) হয়েছে। সমস্ত মানবজাতির স্বার্থ এক, সমস্ত মানবজাতির কল্যাণ এক এবং অখণ্ড, কাহাকেও বাদ দিয়ে কাহারও চলে না, দিন দিন এই জ্ঞান মানুষের প্রাণে ফুটে উঠছে। যুদ্ধ যাহাদের ব্যবসা, যারা ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে ভাই হয়ে ভাইয়ের বুকে সঙ্গীন বসিয়েছে, আজ তারাও ব'লছে বিশ্বশান্তির কথা। যুদ্ধে যাঁরা সেনাপতি ছিলেন, যাঁরা যুদ্ধে নেতৃত্ব ক'রে এসেছেন, আজ তাঁরাই মানুষকে শান্তির কথা শুনাচ্চেন, যুদ্ধ উঠিয়ে দেবার কথা বলছেন, নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা বুঝাচ্ছেন। বিশ্বশান্তির চিন্তা আজ আর কেহ এড়াতে পারছেন না। ক্রুপের অস্ত্রশালায় আজ কৃষিযন্ত্র তৈয়ারী হচ্চে, ইংলণ্ডেও বড় বড় অস্ত্রশালার মালিকরা মানুষের নিত্যব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করার জন্য কারখানাগুলি নূতন ক'রে সাজাচ্ছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন জগতের হাওয়া আজ কোন্ দিকে বইছে। পুরাতনের পসরা উঠিয়ে ফেলে তাঁরা নূতন যুগের নূতন পসরা সাজাচ্ছেন। আমেরিকার বেথলেহেম ইস্পাতের কারখানার (Bethlehem steel works) প্রেসিডেণ্ট চার্লস্ সোয়াব বক্তৃতার মুখে বলেছেন, 'এক বেথলেহেম্ থেকে জগতের মুক্তির বাণী প্রচারিত হয়েছিল, মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রয়োজন

'হ'লে তাঁর বিরাট অস্ত্রশালা সমুদ্র গর্ভে ডুবিয়ে দেবেন।' অখণ্ড মানব জাতির পরম কল্যাণ সাধনের যে ভাব মানব জাতির বুকে জমাট বেঁধে উঠেছে আজ চার্লস্ সোয়াবের মুখ দিয়ে তাহাই বাক্যে প্রকাশ পেল। হেন্‌রি ফোর্ড সব দেশের গবর্ণমেণ্টের কাছে প্রস্তাব করেছেন * তাঁদের যুদ্ধ জাহাজগুলি উচিত মূল্যে তিনি কিনে নিয়ে কৃষিযন্ত্র (tractor) তৈয়ারী ক'রবেন। কোন্ চিন্তা, কোন্ ভাব আজ মানুষের মন প্রাণের উপর কাজ ক'রছে এ সব তারই নিদর্শন। অচিরে জগতের

---

* Mr. Henry Ford, the motor-car manufacturer, has sent the United States Government an offer to buy the "navies of the world at junk (scrap metal) prices."

"I mean business," he said in an interview to-day. "The Governments may not think I could finance this undertaking, but I can. With acetylene torches and electricity I can cut these warships to pieces and make agricultural machinery and other useful things out of them.

"I stand ready to buy every warship the United States and other Powers may decide to scrap. I understand that many German warships were sunk. That was a crime.

"If the diplomats mean business they will accept my offer. If the Powers will sell me their fleets I will help them to solve the unemployment problem. Something must be done for the men whom smaller navies will throw out of employment.

"If the ships are sold to me I will employ all the men in the world in turning fleets into tractors and other machinery which would benefit the world."—*"Daily Mail,"* London—quoted in "Active Service" of November 26, 1921.

রাষ্ট্রশক্তিগুলিকে যে কাজ ক'রতে হবে, মহাপ্রাণ হেনরি ফোর্ডের প্রাণে সেই চিন্তাই জাগ্রত হয়েছে। এই দুঃসাহসী প্রকৃতিকে অবলম্বন ক'রে দয়ানন্দ-স্কীমের বিরাট চিন্তা জগতে ধ্বনিত হয়ে উঠলো।

দিকে দিকে, বহুরূপে, বহু প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই নূতন জগৎ, এই প্রেমরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য গ'ড়ে উঠছে। জগতের নারীশক্তি, মাতৃশক্তি আজ জাগ্রত হয়েছেন। নারীশক্তি আজ চাইছেন নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে, পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার পেতে; জগৎটাকে তাঁরা নিয়ন্ত্রণ ক'রতে চান, জগৎ থেকে অন্যায় অবিচার দূর ক'রে দিতে চান, যে যুদ্ধে তাঁহাদের সন্তানসন্ততিরা মূঢ়ের ন্যায় পরস্পরকে নিপাত করে, সেই যুদ্ধ উঠিয়ে দিতে চান। জেনেভার আন্তর্জাতিক নারীসভা পৃথিবীর সব দেশের নারীসমাজকে এই কার্য্যে প্রণোদিত করছেন।

জগদ্ব্যাপী এই নারীজাগরণ এবং নারীপ্রচেষ্টার সঙ্গে আর এক অভিনব ব্যাপার জগতে ঘটেছে। তা' হচ্চে তরুণের অভিযান। জগতের যারা তরুণ, বয়সে তরুণ, ভাবে তরুণ, আজ তারা শ্রীভগবানের মঙ্গলহস্তস্পর্শে জাগ্রত হয়েছে। উৎসাহ তাদের অফুরন্ত, উদ্যম তাদের অসাধ্য সাধন ক'রতে চায়। অতীতের বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলে আজ তারা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি জীবের ভিতরে যে আনন্দময়ী মা মহাশক্তিরূপে আছেন, যে মা এতদিন সুখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, সেই মা আজ জেগেছেন। আজ জগতের সমস্ত তরুণ তার নবজাগরণের আনন্দে কলকোলাহল ক'রছে। তরুণ আজ নূতন

জগৎ সৃষ্টি ক'রতে চায়। যুগদেবতা আজ তরুণের কাণে এই নূতন জগৎ সৃষ্টির মন্ত্র দিয়েছেন। যেখানে অন্যায়, যেখানে অবিচার, যেখানে অত্যাচার, যুগদেবতার এই নারায়ণী সেনা তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দেবে। মানবজাতির উন্নতির পথে যে সব পর্ব্বতপ্রমাণ আবর্জ্জনাস্তূপ রয়েছে, তার অনন্ত উন্নতির পথে যাহা কিছু বিঘ্ন, শ্রীভগবানের এই নারায়ণী সেনা তাহা দূর ক'রে দেবে। যুগদেবতা আজ তরুণের রথে আরূঢ় হয়ে বিশ্ববিজয়ে বাহির হয়েছেন। তরুণ আজ অপরাজেয়, গতি তার অপ্রতিহত। যারা স্থবির, বয়সে স্থবির, চিন্তায় স্থবির, ভাবে স্থবির, তারা পুরাতনকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে বসে থাকুক ; তরুণ ছুটে চলেছে নূতন জগৎ সৃষ্টি ক'রতে।

মানুষের অন্তর-দেবতা আজ জেগেছেন। মানুষ আজ আর অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, পরাধীনতাকে সহ্য ক'রতে পারছে না। এসিয়ার পুরাতন জাতিগুলি যুগযুগান্তের সংস্কার ত্যাগ ক'রে, নূতন ক'রে গ'ড়ে উঠছে। প্রত্যেক জাতিই তার স্বাধীনতা, তার স্বাতন্ত্র্য দাবী কর্‌ছে। পুরাতনের দুর্গ আজ শতধা বিধ্বস্ত হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে, সমস্ত জগৎজুড়ে আজ নূতনের জয়শঙ্খ বেজে উঠেছে।

ধনিকদের দ্বারা চালিত বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টগুলি অনিচ্ছাসত্ত্বেও আজ বিশ্বশান্তির পথে চলতে বাধ্য হচ্চে। অলক্ষ্যশক্তির দ্বারা চালিত হ'য়ে, জাগতিক অবস্থার তাড়নায় তারাও আজ শান্তির পথে চলতে বাধ্য হচ্চে। ইচ্ছায় হ'ক, অনিচ্ছায় হ'ক, সবাইকেই আজ চলতে হবে, আর সে চলা বিশ্বশান্তিরই দিকে। নিরস্ত্রী-করণ নিয়ে তাঁরা আজ দশ বৎসর ধরে শুধু কল্পনা জল্পনা

ক'রছিলেন কিন্তু জেনেভার নিরস্ত্রীকরণ সভাতে রাশিয়া প্রস্তাব ক'রে বস্‌লো হয় এখনি, না হয়, অগত্যা, ৪ বৎসরের মধ্যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সমূলে উঠিয়ে দেওয়ার কথা।

আজ একদিকে নয়, আজ দিকে দিকে মানুষ ছুটেছে দয়ানন্দ স্বামীকে মানবজাতির জীবনে সার্থক ক'রে তুলতে। শান্তি-দেবতার চরণে যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ সমর্পণ করে, এমন ভাবে, পূর্ণরূপে, তাঁকে বরণ করে নেওয়ার প্রস্তাব তো আজ পর্য্যন্ত জগতে হয় নাই।

জগতের আজ কত বড় পরিবর্ত্তন হয়েছে, মানবজাতির চিন্তা কোন্ উচ্চস্তরে উঠেছে, কোন্ ভাব মানবজাতির প্রাণে খেলছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ দিচ্ছে কেলগ্ প্যাক্ট (Kellog pact)। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সেক্রেটারী কেলগ্ এবং ফরাসী দেশের মন্ত্রী ব্রায়াণ্ডের উদ্যোগে পৃথিবীর ৬২টী রাষ্ট্রশক্তি এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। তাতে তাঁরা সর্ব্বাগ্রে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন যে সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলসাধনের জন্য তাঁরা দায়ী ("deeply sensible that their high office imposes upon them a solemn duty to promote the welfare of mankind")। দশবৎসর পূর্ব্বে যে রাষ্ট্রগুলি মানবজাতির মঙ্গলকে পদদলিত ক'রে নিজেদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোককে অম্লানবদনে মরণের মুখে পাঠিয়ে দিয়ে সমস্ত মানবজাতির ধ্বংস সাধন করছিলেন, আজ তাঁরা বলছেন, সমস্ত মানবজাতির মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁরা নিজেদের দায়ী মনে করছেন। একই সঙ্গে এতগুলি জাতির প্রাণে এই নূতন ভাব কি ক'রে জাগ্রত হল? এই দায়ীত্ববোধ তাঁদের প্রাণে জাগ্রত হওয়ায় মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য,

—আজ পর্য্যন্ত মানবজাতির ইতিহাসে যাহা কখনও হয় নাই,—তাঁরা তাহাই করলেন। তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন যে তাঁরা আর যুদ্ধ করবেন না। দ্বন্দ্বের যে কোনও কারণই ঘটুক না কেন, তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছেন, কেবলমাত্র শান্তির পথেই তাঁরা সমস্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসা করবেন। ভার্সেলে সন্ধি (Versailles treaty) থেকে কেলগ্ প্যাক্ট (Kellog Pact) পর্য্যন্ত জগতের রাষ্ট্রশক্তিগুলি বহু পথ অতিক্রম করেছেন। বিশ্বশান্তির পথে রাজনীতিকরা আজ অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন। এতকাল যাঁরা যুদ্ধকে মানবজাতির দ্বন্দ্ব মীমাংসার ন্যায্য উপায় ব'লে গ্রহণ করেছিলেন, কালপ্রভাবে যুদ্ধের সেই সব উপাসকরা আজ প্রতিজ্ঞা করতে বাধ্য হলেন যে যুদ্ধকে তাঁরা পরিত্যাগ করলেন। চিন্তাজগতে যে বিরাট শক্তি কাজ করছে, আজ তাঁরা সেই শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রতে বাধ্য হলেন। সেই চিন্তাকে তাঁরা স্বীকার করে নিলেন, চিন্তা থেকে তাঁরা বাক্যে এলেন। বাক্যে যখন তাঁরা এসেছেন, তখন কার্য্যেও আসতে বাধ্য। যে শক্তির প্রেরণায় তাঁরা এই চিন্তাকে স্বীকার ক'রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, সেই শক্তিই তাঁদের এই চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত ক'রতে বাধ্য করবে। দেশে দেশে মানুষের প্রাণ তাঁদের এই কার্য্যে আনন্দকোলাহল ক'রে উঠেছে। তাদের প্রাণের গভীর ভাবকেই আজ রাষ্ট্রগুলি স্বীকার ক'রে নিয়ে তাকে বাক্যে রূপ দিলেন।

এই প্রতিজ্ঞা ক'রেই তাঁরা চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারছেন না। অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলেছে জগৎ থেকে অস্ত্রশস্ত্র উঠিয়ে দেবার জন্য। ওয়াশিংটনে যে সন্ধি হ'ল তাতে তাঁরা এই পথে কিছু

দূর অগ্রসর হলেন, বড় বড় জাহাজগুলির সংখ্যা নির্দ্ধারিত ক'রে দিলেন। কিন্তু তাহা কিছুই নয়, আরও বহুদূর তাঁদের অগ্রসর হতে হবে। তারপর জেনেভার সভায় আমেরিকার প্রতিনিধি গিবসন প্রস্তাব করলেন সমস্ত প্রকার অস্ত্রশস্ত্র কমিয়ে কেবল আমরা পুলিশ ফোর্স রাখার মত নৌ-বহর রাখবো। ক্রমেই তাঁরা অগ্রসর হচ্চেন। এত বড় বিরাট পরিবর্ত্তন একদিনে হয় না, কিন্তু তাঁরা নিশ্চেষ্ট থাকতে পারছেন না। পুনরায় লণ্ডনে নিরস্ত্রীকরণ সভা আহূত হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র বিসর্জ্জন তাঁদের করতেই হবে। যুদ্ধ প্রথা শুধু মুখে নয়, কার্য্যতঃও তাঁদের উঠিয়ে দিতে হবে।

ইয়োরোপে দেশে দেশে যুদ্ধ নিবারণের জন্য অসংখ্য সভা সমিতি ("No More war", "War Resisters League") স্থাপিত হয়েছে। তাঁরা অক্লান্ত চেষ্টা করছেন যুদ্ধের কুফল মানুষকে বুঝিয়ে দিতে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভাব জাগ্রত ক'রতে। দেশে দেশে দলে দলে মানুষ যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্চে, যুদ্ধশিক্ষা (military training) গ্রহণ ক'রতে অস্বীকার ক'রে জেলে যাচ্চে, দুঃখ কষ্ট অত্যাচার অম্লান বদনে স্বীকার করছে।

যেখানে চির অন্ধকার বিরাজ করছিল, আজ সেখানে আলো দেখা দিয়েছে, যেখানে জগতের ধারণা ছিল না, আজ সে ধারণা এসেছে, যেখানে পরস্পর থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা ছিল, আজ সেখানে পরস্পরকে জানবার, বুঝবার এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলবার চেষ্টা হচ্চে। পরস্পরের আসল, বড় এবং ভাল কোনখানে তাহা দেখবার, পরস্পরের ক্ষুদ্র দোষ ত্রুটী ক্ষমা ক'রে চলবার প্রবৃত্তি জেগেছে। যুদ্ধই ছিল যেখানে মানব

জাতির সর্ব্বপ্রধান অধ্যবসায়, আজ সেখানে শান্তি স্থাপনই হয়েছে সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা। যুদ্ধকে আজ আর কেহ বড় বলে না, বড় ক'রে দেখায় না, তার গৌরবগাথা রচনা ক'রে না। আজ "রুল বৃট্যানিয়া" ("Rule Britannia") অতীতের দাম্ভিকতাদুষ্ট, জগৎ সভার মাঝে বৃটেন আজ সে গান গাহে না। আজ ফরাসী তার "লা মার্শেলে" গাহিতে লজ্জা বোধ ক'রবে। আজ যুদ্ধকে সকলেই একবাক্যে নিন্দা করে, যারা যুদ্ধের জন্য সেজে বসে আছে তারাও নিন্দা করে। যুদ্ধদেবতা আজ চিন্তা জগৎ থেকে বিতাড়িত, বিশ্বশান্তিই আজ ভাবজগতের রাজা।

মানবজাতির প্রকৃত স্বার্থ যে এক, উন্নতির পথে তাদের একই সঙ্গে চ'লতে হবে এ ধারণা আজ মানুষের প্রাণে বদ্ধমূল হয়েছে। প্রত্যেক দেশের শিক্ষকরা সম্মিলিত হয়ে জগতের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করছেন, বৈজ্ঞানিকরা একত্র সমবেত হয়ে বিজ্ঞানের নূতন নূতন তত্ত্ব নিয়ে পরস্পরে আলোচনা ক'রে পরস্পরের জ্ঞানবৃদ্ধি করছেন। মিকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা মিলিত হয়ে (World Conference of Mechanical Engineers) কল কব্জা তৈয়ারীর নূতন উপায় চিন্তা করছেন। সঙ্গীতজ্ঞরা বিশ্ব-সঙ্গীত সভা স্থাপন করেছেন (World Fellowship through Music)। তাঁদের বিশ্বাস সঙ্গীতই মানবজাতির প্রাণের ভাষা, সঙ্গীতই শান্তির প্রাণ, সঙ্গীতের দ্বারা তাঁরা জগতে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করছেন। খেলা-ধূলার প্রতি যাঁদের অনুরাগ, তাঁরা চেষ্টা করছেন, সব জাতির খেলোয়াড়দের সম্মিলিত করে, খেলা-ধূলার ভিতর দিয়েই জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবার। সেনাপতি বেডেন পাওয়েলের নেতৃত্বে জগদ্ব্যাপী এক

বালখিল্য সেনাদল (Boy Scout Movement) গ'ড়ে উঠছে। সেদিন বিলাতের বার্কেনহেড্ নগরে জগতের সমস্ত দেশের বালকরা সমবেত হয়ে পরস্পরের মিলনকে আরও ঘনিষ্ঠ করেছে। সেনাপতি বেডেন্ পাওয়েল যিনি এতদিন যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি হাজার হাজার বালকদের সম্মুখে তাঁহার তরবারী মাটিতে প্রোথিত ক'রে বললেন, "আজ হতে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ ভূগর্ভে প্রোথিত হল"। * এইরূপ শত শত ঘটনা জগতে ঘটছে। ঘটনা শুধু শুধু ঘটে না, তার পিছনে চিন্তা থাকে, অনেকখানি ভাব থাকে, তবেই এমন ঘটনা ঘটে।

বেলজিয়ামে জগতের ৫০০ আন্তর্জাতিক সভা তাঁদের কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। তাঁদের পরস্পরের ভাবের আদান প্রদান হচ্চে, পরস্পরের মিলনের দ্বারা তাঁরা সমস্ত জগৎকে এক মহামিলনের দিকে নিয়ে যাচ্চেন।

আজ আমেরিকাতে, ফ্রান্সে, জার্ম্মানিতে স্কুল কলেজের বই থেকে যুদ্ধের কথা, অপর জাতির নিন্দাসূচক কথা বাদ দিয়ে বই রচনার চেষ্টা চলেছে, শিশুদের প্রাণে সামরিক ভাব জাগিয়ে দেয় এমন খেলনা পর্য্যন্ত বাদ দেওয়া হচ্চে, এক দেশের

---

*"Its membership now numbers about 2,000,000. No less than 50,000 lads ignoring class-distinctions, from many far-separated lands, representing 40 nations, foregathered in Arrow Park.........."This is the hatchet, the emblem of war, enmity and bad feeling which I now bury in the earth," cried the Chief Scout. He plunged the hatchet deep into the earth and with his foot stamped it down."

—Brotherhood, Dublin, Aug. 1929.

ছেলেরা অপর দেশের অজ্ঞাত অপরিচিত ছেলেদের কাছে উপহার পাঠাচ্চে, ভালবাসা জানিয়ে চিঠি দিচ্চে, এক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অপর দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করবার জন্য সেই সব দেশে ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্চে। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মূল্য অনেক।

জগতের আজ কত বড় পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং হচ্চে তাহা আপাত দৃষ্টিতে ধরা পড়তে না পারে, আর অধিকাংশ লোকেরই তাহা বুঝবার অবসর নাই। চিন্তাশীল যাঁরা একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন আজ মানুষের ভাবরাজ্যে, চিন্তারাজ্যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটেছে, আর তাহা মানুষের কথায় এবং কার্য্যে, তাহার আচার ব্যবহারে, চলতে, ফিরতে প্রকাশ পাচ্চে। জগতে একজনও যদি শান্তির কথা বলে তার অর্থ আছে; একটী মানুষও যদি শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করে তাহার মূল্য অনেক। আর আজ পৃথিবীর সব দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী শান্তির চিন্তা করছে, শান্তির কথা বলছে, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ ভাবে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করছে। সকলের চোখে তাহা না পড়তে পারে। যাঁরা চোখ দিয়ে দেখেন তাঁরাই দেখতে পান।

ধর্ম্মজগতেও আজ এক মহা বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে। আজ আর মানুষ ধর্ম্মের খোসা নিয়ে, ডালপালা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকছে না। আজ সে আচার নিষ্ঠা, কর্ম্মকাণ্ডের বোঝা নামিয়ে ফেলেছে। শত শত, হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে আর সে সন্তুষ্ট নয়। আজ সে সত্যকেই জানতে চায়, পূর্ব্ব পিতামহগণের অনুভূতির ভিতর দিয়ে নয়,

তাঁদের সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়েই নয়, আজ সে সত্যকে জানতে চায় নূতন ক'রে, তার নিজের অনুভূতির ভিতর দিয়ে। অতীত অতীতই, বর্ত্তমানই বর্ত্তমান। আজ আর সে অতীতের দুর্ব্বহ বোঝা বহন ক'রতে চায় না। আজ সে সত্যকে নূতন ক'রে জানতে চায়, পরিপূর্ণ সত্যের কাছে সে আত্মসমর্পণ ক'রতে চায়। অতীতের আবর্জ্জনারাশি তখনকার দিনে অর্থযুক্ত হলেও আজকার দিনে তাহা অর্থশূন্য, বর্ত্তমানের অনুপযুক্ত। আজ তার প্রাণ অতীতকে শ্রদ্ধা ক'রবে, প্রণাম ক'রবে কিন্তু আজ তার প্রাণ নবীনকেই বরণ করেছে।

ধর্ম্ম যিনি সকলকে ধারণ ক'রে রেখেছেন, আজ তিনি রূপ বদলাচ্চেন, আজ তিনি তাঁহার সত্যরূপে মানুষের কাছে দেখা দিচ্চেন। আজ আর তিনি হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম নন, আজ তিনি ধর্ম্ম। মানুষের প্রাণ আজ সেই পুরাতন বন্ধুকে চিনেছে, মানুষের প্রাণ আজ তাঁহারই চরণতলে নিজকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছে। গোঁড়ামীর দুর্গ আজ ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্চে। মানুষ আজ বুঝেছে ভগবান এক, ধর্ম্মও এক, এই এক ধর্ম্মই সমস্ত জনগণকে তাঁহার বক্ষে ধারণ ক'রে রেখেছেন। ধার্ম্মিক ধর্ম্মকে চায়, ধার্ম্মিক ধার্ম্মিককে চায়। আজ আচার নিয়ম অনুষ্ঠানের ব্যবধানগুলিকে সে বড় ক'রে দেখ্‌চে না, আজ আর পথ নিয়ে ঝগড়া করার প্রবৃত্তি তাহার নাই। আজ মানুষ মানুষকে চায়। ধর্ম্ম আজ সমস্ত মানবজাতিকে এক ক'রে দিচ্চেন।

খৃষ্টানজগতে সমস্ত সম্প্রদায়কে মিলিয়ে এক বিশাল খৃষ্টান সমাজ গঠন করবার চেষ্টা হচ্চে। একমাত্র যীশুকে স্বীকার

ক'রে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা দিয়ে রোমের পোপের নেতৃত্বে এক বিশাল খৃষ্টান চার্চ্চ গ'ড়ে তুলবার প্রস্তাব হয়েছে। এক সম্প্রদায়ের প্রচারক আর এক সম্প্রদায়ের গির্জ্জায় গিয়ে সেই সম্প্রদায়ের লোককে ধর্ম্মকথা শুনাচ্চেন। ইহুদি ধর্ম্মযাজক (Rabbi) খৃষ্টান চার্চ্চে গিয়ে ধর্ম্মের কথা শুনাচ্চেন। ক্যানাডাতে বিভিন্ন খৃষ্টান সম্প্রদায় গুলি মিলিত হয়ে এক বিশাল খৃষ্টান সম্প্রদায় (One Church of Christ) স্থাপন করেছে। বহু পাশ্চাত্যবাসী আজ হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান, হিন্দুধর্ম্মের, বৌদ্ধধর্ম্মের সার তথ্যগুলি সংগ্রহ ক'রছেন, আনন্দের সঙ্গে তাহা গ্রহণ ক'রছেন। যোগ এবং যৌগিক সাধনার প্রতি ইউরোপীয় লোকেরা বিশেষ আকৃষ্ট। বিশ্বমানবমুক্তিবাদীরা (Universalist), মুক্তধর্ম্মবাদীরা (Free Religious Movement) আজ 'এক ভগবান, এক ধর্ম্ম' (One Universal Church of God) ঘোষণা করছেন। মানুষ আজ বস্তু চায়, সে সত্যকে চায়। আজ মানুষের প্রাণ বিশাল হয়েছে। সমস্ত জগৎই তার প্রাণের ভিতর স্থান পেয়েছে। আজ আর সে অল্পে সন্তুষ্ট হতে পারছে না। আজ সে একতে চায়, সে বহুর মধ্যে একতে উপলব্ধি ক'রে সেই একের সেবায় নিঃশেষে আত্মনিবেদন ক'রে দিতে চায়।

এসিয়ার জাগরণ

যুগদেবতার মঙ্গলহস্তস্পর্শে আজ সমস্ত এসিয়া ভূখণ্ড জাগ্রত হয়ে উঠেছে। এসিয়ার আধ্যাত্মিকতা এক মহা তামসিকতায় পরিণত হয়েছিল। জড়জগতে বাস করেও তারা জড়জগৎকে

অস্বীকার ক'রে চলছিল। জড়বিজ্ঞানের কোনও ধার তারা ধারতে চায় নাই। তাই শ্রীভগবান জড়বাদী ইয়োরোপীয় জাতিগুলিকে ডেকে এনে জড়বিজ্ঞানকে (Science) এসিয়ার ঘরে তুলে দিয়েছেন। আধ্যাত্মিকতা (spirituality) এবং জড়বাদের (materialism) বিচ্ছেদ দূর ক'রে দিয়ে দুইকে আজ এক ক'রে দিয়েছেন। পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, জাগতিক উন্নতির প্রতি এসিয়ার জাতিগুলি উদাসীন ছিল। শ্রীভগবান আজ জোর ক'রে, পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের যারা চরম উৎকর্ষ সাধন করেছে, জড়বিজ্ঞানকে যারা আয়ত্ত ক'রে মানুষের সেবায় লাগিয়েছে, পার্থিব উন্নতিই যাদের একমাত্র কাম্য, সেই পাশ্চাত্য জাতিগুলির এক এক জনকে এসিয়ার এক এক দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পরাধীনতার দুঃখ তাদের ভোগ করিয়ে আজ সমস্ত এসিয়াকে তিনি জাগ্রত ক'রে তুলেছেন। এসিয়াবাসীরা আজ বুঝেছে জড়জগৎকে অস্বীকার ক'রে, জড়বিজ্ঞানকে অবহেলা ক'রে জগতে বেঁচে থাকা যায় না। দিকে দিকে আজ এই নবজাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছে।

মুসলমান-জগতে আজ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটেছে। মুসলমানের গোঁড়ামী যুগপ্রভাবে চূর্ণ হয়ে যাচ্চে। সমস্ত মুসলমান-জগৎ আজ নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে, পুরাতনকে ভেঙ্গে ফেলে আজ সে নূতনের সঙ্গে যোগস্থাপন করেছে। হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন মত, বিশ্বাস, আচার, ব্যবহার পরিত্যাগ ক'রে সে নবযুগের নবভাব গ্রহণ করছে।

তুর্কি আজ নির্ম্মমভাবে পুরাতনকে বহিষ্কৃত ক'রে দিয়ে নূতন ভাবে জাতীয় জীবন গ'ড়ে তুলছে। তুর্ক রমণী আজ পুরুষের সঙ্গে সমান স্বাধীন, আজ সে আর হারেমে আবদ্ধ নয়, জগতের মুক্ত আলোতে আজ সে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে কর্ম্ম ক'রছে। তুর্কিতে আজ ধর্ম্মের দিক দিয়ে প্রত্যেক নরনারী স্বাধীন। যে যে ধর্ম্ম ইচ্ছা গ্রহণ ক'রতে পারে, কেহ কাহাকেও বাধা দিতে পারে না, একজন আর এক জনের ঘাড়ে তার নিজের ধর্ম্ম চাপাতে পারে না। ভারতে আজ মসজিদের সামনে গান বাজনা করা নিয়ে কত ঝগড়াবিবাদ, কত রক্তপাত হয়ে যাচ্চে। নূতন তুর্কি তার মসজিদে মসজিদে সঙ্গীতের প্রবর্ত্তন ক'রছে, অরগ্যান (organ) রাখবার ব্যবস্থা ক'রছে, বেছে বেছে এমন লোকদের ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত ক'রছে যারা সুকণ্ঠ ও সুগায়ক। সঙ্গীতের প্রতি এই অনুরাগ, তুর্কজাতির জীবনতন্ত্রী যে আজ এক নূতন সুরে বাজছে তারই পরিচয় দিচ্চে।

ফরাসীর আঘাতে সিরিয়ার অধিবাসীরা জাগ্রত হয়ে উঠছে। ট্রান্সজর্ডানিয়াতে, ইরাকে ইংরাজকে পাঠিয়ে দিয়ে শ্রীভগবান ঐ সব দেশের লোকদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ ক'রে দিয়েছেন। বহির্জগতের সঙ্গে তাদের যোগস্থাপন হয়েছে। নূতন ভাবে তারা জাতীয় জীবন গ'ড়ে তুলছে। একদিকে রাশিয়া এবং অপরদিকে ইংরাজের কবল থেকে পারস্য আজ মুক্ত হয়েছে। পারস্যে আজ রেলপথ, মোটরের জন্য বড় বড় রাস্তা নির্ম্মাণ হচ্চে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বস্‌ছে। নারীরা স্বাধীনতা লাভ ক'রে পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে

চলতে চাইছে। নারীরা প্রকাশ্য ভাবে চলাফেরা ক'রছে, তাদের নিজেদের সভাসমিতি স্থাপন ক'রছে, নিজেদের সংবাদপত্র চালাচ্চে। পুরাতন পারসী জাতি আজ নবজীবন লাভ ক'রে আধুনিক জাতিগুলির সঙ্গে চলবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রছে। আফগানিস্থানে আজ নূতন-পুরাতনে বিষম দ্বন্দ্ব বেঁধেছে। আমানুল্লা চেয়েছিলেন রাস্তাঘাট, কল, কারখানা, রেল, এরোপ্লেন, বেতার স্থাপিত ক'রে, শিক্ষার নূতন বন্দোবস্ত ক'রে, আফগান ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে শিক্ষিত ক'রে এনে আফগানিস্থানের দ্রুত উন্নতি সাধন করবেন। কিন্তু আফগান জাতির পুরাতন সংস্কার নবযুগের এই নূতন ভাব গ্রহণ ক'রতে পারলে না। আমানুল্লাকে তাড়িয়ে দেওয়া সহজ কিন্তু নবযুগকে তাড়িয়ে দেওয়া শক্ত। নবযুগ জাতির চিন্তার ভিতর তার স্থান গ্রহণ করেছে। এই সংঘর্ষের ফলে নবযুগের নবভাব জাতির জীবনে আরও বদ্ধমূল হয়ে যাবে। আমানুল্লা যদি সংস্কার ক'রে যেতেন আর জাতি যদি নির্ব্বিবাদে তাহা মেনে নিত তা' হলে জাতির প্রাণের সংস্কার হত না। এই সংঘর্ষের ফলে জাতির চিন্তা জাগ্রত হবে, নবযুগের প্রতি অনুরাগ প্রবল হবে।

ভারতের স্বরাজ সাধনায় এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। ভারতের সকল দুঃখ দৈন্য দুর্দ্দশার জন্য একমাত্র রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাকেই দায়ী মনে ক'রে এতদিন নেতারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্যই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল ইংরাজের হাত থেকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ফিরিয়ে পেলেই ভারতের সুখ সৌভাগ্য

ফিরে আসবে। এটা তাঁদের চিন্তায় আসছিল না যে পৃথিবীতে অন্যান্য দেশ আছে যাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় আছে কিন্তু দেশের সাধারণ লোকদের কাছে সে স্বাধীনতার কোনও মূল্য নাই। তারা দিনের পর দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রেও দুবেলা পেট ভ'রে খেতে পায় না, অনেকেরই মাথা গুঁজে থাকবার স্থান নাই, পুত্রকন্যাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার সংস্থান নাই, রোগে প'ড়লে চিকিৎসা ও পথ্যের উপায় নাই। দিনের পর দিন ভাবনা চিন্তায়, নিত্য অভাব অনাটনের মধ্যে তাদের কাল যাপন ক'রতে হয়। তারা সুখের মুখ দেখতে পায় না, আনন্দ কা'কে বলে তা' জানে না। তারা পরিশ্রম করে কিন্তু তার ফল ভোগ করে ধনীরা। আর যখন দেশের ধনীরা নিজেদের সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিয়ে অপর দেশের ধনীদের, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধায় আর সেই যুদ্ধ জাতীয় যুদ্ধ ব'লে অভিহিত করে তখন এই সকল নিরন্ন গৃহহীন নির্ধন লোকদের ডাক পড়ে দলে দলে যুদ্ধে যেয়ে প্রাণদান করবার জন্য। তাদের দুর্ব্বহ জীবনগুলিকে এই ভাবে শেষ ক'রে দেওয়াই তাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চরম সার্থকতা। সাধারণ লোকদের কাছে এ স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু? ইংলণ্ড স্বাধীন। কিন্তু ইংলণ্ডের ৪॥ কোটী লোকের মধ্যে কয়জন প্রকৃত স্বাধীন? কয়জন সুখী? কয়জন নিরুপদ্রব শান্তিতে বাস করে? কয়জন আনন্দ উপভোগ করতে পায়? ইংলণ্ডের স্বাধীনতা ভোগ করে মুষ্টিমেয় লোকমাত্র। শতকরা ৯০ জনের নিকট এ স্বাধীনতার বড় মূল্য নাই। কিন্তু তবুও ইংলণ্ডে

স্বাধীন বলা হয় আর এই স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতের নেতারা তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছিলেন। ভারতের জনসাধারণের কাছে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নিরর্থক হবে যদি না অন্নবস্ত্র-সমস্যার হাত থেকে তারা মুক্তি পায়, যদি না সুখশান্তি আনন্দের আস্বাদ তারা পায়।

কলিকাতায় ছাত্রসভায় পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর অভিভাষণ ভারতের স্বরাজসাধনায় এক নূতন সুর এনে দিয়েছে। তিনি ভারতের নরনারীর হয়ে অখণ্ড স্বাধীনতা চেয়েছেন,—রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, অর্থনীতিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা। দেশে আজ ধূয়া উঠেছে 'দরিদ্রনারায়ণের' সেবা কর। জহরলাল তার উপরেও উঠেছেন। যে সামাজিক বিধিব্যবস্থার (economic order) ফলে দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্রই থেকে যায় তিনি সেই বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করতে চেয়েছেন, যাতে ভারতে দরিদ্র কেহ না থাকে। সমস্ত বিশ্বমানবসমাজ যে এক, ভারতের সুখ দুঃখ, ভারতের কল্যাণ যে সমস্ত বিশ্বমানবসমাজের সুখ দুঃখ, তার কল্যাণের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তিনি তাহা বুঝেছেন এবং দেশকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। ভারতের হয়ে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছেন, * "যে স্বাধীনতা হবে সমস্ত মানবজাতির যৌথ পরিবার প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান—যে যৌথ পরিবারে ভারতবর্ষ পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গে সহযোগিতায় জগদ্ব্যাপী শান্তি ও

* "As a step towards the creation of a World Commonwealth of Nations in which we can assist in the fullest measure to bring about world co-operation and world-harmony."

সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত ক'রবে।" তিনি চেয়েছেন পৃথিবী থেকে যুদ্ধ উঠিয়ে দিতে, সমস্ত দেশগুলিকে নিয়ে এক বিশ্ব-শাসনতন্ত্র (World Federation) গঠন ক'রতে। চিন্তাস্তরের সর্ব্বোচ্চশিখরে উঠে তিনি শ্রীভগবানের সেই চিরন্তন আশার বাণী দেশকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সেই অতিমানবের আগমনের প্রতীক্ষা ক'রতে বলেছেন।

মিরাটে ডাক্তার আনসারি এক অভিনন্দনের উত্তরে বলেছেন, সাম্যবাদ (Socialism) ছাড়া ভারতের চিরন্তন দারিদ্র্যের উচ্ছেদ সাধন হবে না। কংগ্রেসের ভাবকে তিনি বলেছেন ধনিকদের প্রতি সহানুভূতিদোষদুষ্ট। এই ভাবের পরিবর্ত্তন ক'রে তিনি কংগ্রেসকে সাম্যবাদী ক'রতে চেয়েছেন। ভারতের কৃষাণরা, ভারতের শ্রমিকরা, ভারতের জনসাধারণও আজ এক নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে, তাদের ভিতরও এক নূতন প্রাণসঞ্চার হয়েছে। আজ সর্ব্বত্র শ্রমিক-সমিতি, কৃষাণ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হচ্চে। বর্ত্তমান অসামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনীতিক বিধি ব্যবস্থাকে তারাও মেনে নিতে চাইছে না। তারা চাইছে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক অর্থনীতিক বিধিব্যবস্থা। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারছেন না। যুক্তপ্রদেশে প্রাদেশিক কনফারেন্সে সাম্যবাদ সম্বন্ধে প্রস্তাব নিয়ে তুমুল বাদানুবাদের পর সে প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়েছে। কিন্তু সমস্যা তো প্রত্যাহৃত হয় নাই, এ সমস্যার মীমাংসা ক'রতেই হবে

বাংলাদেশের নবপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতা সঙ্ঘ (Independence League) দেশের সামনে যে কার্য্যতালিকা উপস্থিত করেছেন তার মূলনীতিগুলি হচ্চে—অর্থনীতিক বৈষম্য দূর

করা, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে সমান অধিকার দেওয়া, জাতির জীবনধারণের জন্য যে সব দ্রব্যের একান্ত প্রয়োজন সেই সব জিনিষের ব্যবসা বাণিজ্য জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা (nationalisation of the key industries), ব্যক্তি-গত ধন সম্পত্তির সীমা নির্দ্দেশ, জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ, স্ত্রীলোকের পর্দ্দা প্রথা উঠাইয়া দেওয়া, পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোককে সমান অধিকার দান ইত্যাদি। দিল্লীতে যে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছে তারও কার্য্যতালিকা এইরূপ। ভারতের সমস্ত প্রদেশেই এই স্বাধীনতা সঙ্ঘের শাখা স্থাপিত হয়েছে।

দয়ানন্দের চিন্তা আজ সমস্ত ভারতবর্ষ, সমস্ত চিন্তাজগৎ ছেয়ে ফেলেছে। এই কর্ম্মবীরের কর্ম্মপদ্ধতিই আজ সমস্ত ভারতের নেতৃবর্গ নিতে বাধ্য হচ্চেন। দয়ানন্দের সাধনার ফল আজ ভারতের ও সারা জগতের লোকের জীবনে ফুটে উঠেছে। আজ ভারত, সমগ্র জগৎ অজ্ঞাতসারে তাঁকেই অনুসরণ ক'রে চলেছে।

ভারতেও এক নারী জাগরণের সাড়া পড়েছে। নারীর শিক্ষা, পুরুষের সঙ্গে নারীকে সমান অধিকার দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। পর্দ্দা প্রথা আজ সারা ভারত থেকে দূর হয়ে যাচ্চে। আলিগড়ে ভারতীয় মোশ্লেম লীগের অধিবেশনের সময় নারীদের জন্য পর্দ্দার আড়ালে পৃথক আসন নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, কিন্তু নব-জাগ্রত নারীরা পর্দ্দা টেনে সরিয়ে ফেলে দিয়ে পর্দ্দার বাহিরে এসে পুরুষদের সঙ্গে সমান ভাবে আসন গ্রহণ করলেন। এই একটী মাত্র ঘটনা থেকেই দেশের ভাবের গভীরতা বুঝতে পারা যায়। ভাবজগতে অনেকখানি পরিবর্ত্তন ঘটেছে ব'লে এমন

একটী ঘটনা ঘটতে পেরেছে। বিহারের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্ত্রী এবং পুরুষ, উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, মুনসেফ, জমিদার, কাউন্সিলের ও এসেম্ব্লির মেম্বর, সকলে মিলে এক ঘোষণা করেছেন যে পর্দ্দা হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু সাধনার অঙ্গ নয়। ঘোষণাকারীরা বিহার থেকে পর্দ্দা প্রথা উঠিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে ১৯২৮ এর ৮ই জুলাই বিহারের বহুস্থানে স্ত্রী পুরুষ মিলিত হয়ে সভা সমিতি করেছেন। শত শত বৎসর ধ'রে এই পর্দ্দা প্রথা চলে এসেছে কিন্তু এতদিন এই পর্দ্দা প্রথাকে ভাঙ্গবার সঙ্কল্প দেশের লোকের প্রাণে এমন ভাবে জাগে নাই। আজ দেশের লোক চলেছে অলক্ষ্য শক্তির ইঙ্গিতে। ভাবরাজ্যে আজ মহাভাবের স্রোত বইছে, সেই স্রোত জাতির সকল ধর্ম্মের, সকল শ্রেণীর লোকের প্রাণে অবতরণ করে জাতির সমস্ত কর্ম্ম-ধারায় পরিবর্ত্তন এনে দিচ্চে। বাংলাদেশেও মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে নারীরা সভা ক'রে পর্দ্দা প্রথা উঠিয়ে দিবার সঙ্কল্প করেছেন। দয়ানন্দের জীবনের একটী প্রধান কার্য্য জগতের সমস্ত নারী জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান করা, পুরুষের সঙ্গে তাঁদের সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। তাহা আজ ফলবান হয়েছে। নারী তাহার ভগবৎ-নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ ক'রবে। জগতে কাহারও সাধ্য নাই তাহার গতিরোধ করে।

পুণ্যভূমি বারাণসীতে সম্প্রতি যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সভা হয়েছিল সে সম্বন্ধে দু-একটী কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ ক'রব। বিংশ শতাব্দীতে বাস ক'রেও ব্রাহ্মণ সভা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বাৎস্যায়ন, দেবলের নির্দ্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা বর্ত্তমানকালেও বজায় রাখতে চান। কালস্রোতকে ফিরাইবার এ ব্যর্থ চেষ্টা!

মহাচীনের জাগরণ আজ সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত করেছে। চীন আজ অসাধ্য সাধন ক'রেছে। অসংখ্য বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাজয় ক'রে সে জাতীয় একতা স্থাপন ক'রেছে। উত্তর-দক্ষিণের দ্বন্দ্ব শেষ হয়েছে। উত্তরীয় দলের সেনাপতির পুত্র আজ জাতীয় দলে যোগদান করেছেন। পরস্পর যুদ্ধ্যমান দেশ-নায়কগণ আজ ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলে অখণ্ড চীনের মঙ্গলের জন্য এক হয়ে কার্য্যক্ষেত্রে নেমেছেন। এর পিছনে রয়েছে চীনদেশের কোটী কোটী নরনারীর মনোভাবের পরিবর্ত্তন। জাতির প্রাণে এখন নূতন ভাব, বড় ভাব এসেছে, অখণ্ড চীনের কল্যাণকেই তারা বড় ক'রে দেখছে। জাতির নৈতিক বল বেড়েছে, জাতির আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস খুলে গিয়েছে। চীন আজ নিজকে নিজে জয় ক'রেছে। শ্রীভগবানের কৃপায় এখন বাহিরের সমস্ত বন্ধন তার খসে প'ড়বে। নবজাগ্রত জাতির শক্তি শত ধারায় জাতির কর্ম্মজীবনে প্রকাশ পাচ্ছে। চারি-দিকে সংস্কার আরম্ভ হয়েছে। শিক্ষার বিস্তার হচ্চে, স্ত্রীজাতির উন্নতির চেষ্টা হচ্চে, ভাষার সংস্কার হচ্চে, জাতীয় মঙ্গলকে একমাত্র লক্ষ্য ক'রে রাজ্য শাসনের নূতন বিধিব্যবস্থা হচ্চে, রাস্তাঘাট রেলপথ নির্ম্মাণ হচ্চে। পৃথিবীর এই এক-চতুর্থাংশ জনগণের নব-জীবন লাভ জগতে মহা আনন্দের ব্যাপার।

ইণ্ডোনেসিয়ায় ওলন্দাজদিগের কঠোর শাসনে সেই দেশের অধিবাসীদের মরাদেহে প্রাণসঞ্চার হয়েছে। তারা নিজেদের দুরবস্থা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পেরেছে, আজ তারা জাতীয় মুক্তির জন্য প্রাণপাত ক'রছে। স্পেনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা আমেরিকার অধীনে

অনেক উন্নতি ক'রেছে। কিন্তু সকলের চেয়ে উন্নতি ক'রেছে তারা তাদের জাতীয় মনোভাবের। জাতীয় স্বাধীনতা না পেলে কিছুতেই তাদের প্রাণে শান্তি নাই। কোরিয়ার শান্ত, নিরীহ অধিবাসীরা জগতের এক কোণে প'ড়ে ছিল নির্জীব, মৃতপ্রায়। শ্রীভগবানের ইঙ্গিতে প্রথমে রাশিয়া, পরে জাপান কোরিয়া দখল ক'রে ব'সল। জাপান দেশের অনেক উন্নতি বিধান ক'রেছে। রেল, রাস্তাঘাট, কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে, শিক্ষার নূতন বন্দোবস্ত হয়েছে। বর্ত্তমান সভ্যতার ধারার সঙ্গে কোরিয়ার অধিবাসীদের যোগ স্থাপন হয়েছে। কিন্তু পরাধীনতায় জাতির প্রাণের বিকাশ হতে পারে না। তারা স্বাধীনতা চায়। কিন্তু জাপান কঠোর শাসনে জাতির এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে নিষ্পেষিত করবার চেষ্টা ক'রছে। বাহিরের এই আঘাতে জাতির প্রাণশক্তি আরও জাগ্রত হচ্চে, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্চে, জাতির প্রাণপুরুষ আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

সমস্ত এসিয়াব্যাপী এ কি মহাজাগরণ! একই সঙ্গে এই কোটী কোটী নরনারী কি ক'রে সচেতন হয়ে উঠলো? কোন অমৃত সিঞ্চনে এই অগণিত জনগণ জাগ্রত হয়ে উঠেছে? কে তাদের মোহ কেটে দিল? কে তাদের কাণে এই স্বাধীনতার বীজমন্ত্র দিল। কোন্ মহাশক্তি আজ তাদের প্রাণে শক্তি ঢেলে দিচ্চে, যে শক্তির বলে তারা মরণকে তুচ্ছ ক'রেছে, অসম্ভবকে সম্ভব ক'রেছে? পাশ্চাত্য জাতিসকলের গুলি গোলায়, তাদের শাসনে বা দুঃশাসনে, বাহিরের কোনও আঘাতে তো এত বড় জাগরণ সম্ভব নয়। এ যে প্রাণের জাগরণ,

এ যে মরাদেহে প্রাণসঞ্চার। প্রাণ দিয়েই প্রাণ জাগে, ভাব দিয়েই ভাব জাগে। কোন্ মহাপ্রাণের মহাভাব আজ এশিয়ার কোটী কোটী নরনারীকে প্রাণ দিল? কে তাদের প্রাণে এই মহাভাব জাগিয়ে দিল?

আজ সমস্ত জগদ্বাসীদেরই প্রাণে বিরাট কল্পনা, মহাভাব খেলচে, ক্ষুদ্র স্বার্থ আজ তলায় পড়ে থাকচে, বহুজনের কল্যাণ সাধনই মানুষের সাধ্য হয়েছে। মানুষের প্রাণ আজ মহামিলন চাচ্চে। ভাবুক যারা, তারা চাইচে ভাবের দিক দিয়ে, প্রেমিক যারা তারা চাইচে প্রেমের দিক দিয়ে। যারা স্থূল ছাড়া সূক্ষ্মভাব, সূক্ষ্মতত্ত্ব, প্রেমের তত্ত্ব ধ'রতে পারে না, তারাও চাইচে মিলন—স্বার্থের দিক দিয়ে, সুখসুবিধার দিক দিয়ে, মহাশক্তিশালী জাগতিক অবস্থায় বাধ্য হয়ে। সকলেই চলেছে দয়ানন্দ-স্কীম অভিমুখে—স্কীম প্রতিষ্ঠার দিকে।

জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত জাতির এ এক মহামিলন, স্বার্থের খাতিরে, জাগতিক অবস্থায় বাধ্য হয়ে। এতে অনেক গলদ রয়েছে, অসংখ্য ভুলভ্রান্তি, দোষত্রুটি রয়েছে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও এ সমস্ত মানবজাতির মিলন। যে সহজ সুন্দর প্রেমের মহামিলন দয়ানন্দ জগতে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চান এ তাহার প্রথম অঙ্কুর, পূর্ব্বাভাষ, তার ছায়া। অশুদ্ধ, অসংস্কৃত আধারে বড় ভাব নামলে সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ সুন্দর হয় না। তাতে বহু দোষত্রুটি থাকেই। ক্রমে আধার যত শুদ্ধ ও সংস্কৃত হয় ভাবেরও তত গভীরত্ব হয় এবং তার প্রকাশও সুন্দর হয়।

আর এক দিক দিয়ে এই মহামিলনের চেষ্টা হচ্চে। তাহা

হচ্চে ইউরোপের সমস্ত দেশগুলিকে মিলিয়ে এক যুক্তরাজ্যে পরিণত করার চেষ্টা। যুদ্ধের পর থেকে কি ক'রে ইয়োরোপ থেকে যুদ্ধ দূর করা যায়, কি ক'রে বিভিন্ন দেশগুলির স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান ক'রে সকলে নিরুপদ্রবে বাস ক'রতে পারে এই চিন্তা ক'রতে ক'রতে ইয়োরোপের মনীষীরা এই চিন্তায় এসেছেন যে ইয়োরোপের সব দেশগুলিকে মিলিয়ে একটি অর্থনীতিক সমবায় (Economic Union of Europe) গঠন করা নিতান্ত প্রয়োজন। আর অর্থনীতিক সমবায় হ'লে তার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় মিলনও এসে প'ড়বে। তাই তাঁরা ব'লছেন ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতিগুলির পরস্পরের মধ্যে যে দ্বেষ, হিংসা, রেষারেষি, অপরকে উচ্ছেদ ক'রে নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের যে চেষ্টা সে সবের হাত থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় এই সমবায়। জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) ইয়োরোপের সব জাতিগুলিকে একই ক্ষেত্রে মিলিয়েছে বটে কিন্তু তাদের ভিতর যুদ্ধের যে মূল কারণগুলি তাহা সবই রয়ে গেছে। পুনরায় যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁরা বুঝছেন জাতি-সঙ্ঘ যে মিলন ঘটিয়েছে তাহা কিছুই নয়, এর চেয়ে নিবিড়তর, আরও ঘনিষ্ঠ, আরও ব্যাপক ভাবে মিলন চাই। তাঁরা বুঝেছেন লীগ্ অব্ নেশনস্ উপর থেকে, ভাসাভাসা ভাবে, যেরূপে যুদ্ধ বন্ধ করবার চেষ্টা ক'রছে, তাতে যুদ্ধ বন্ধ হয় নাই, হতে পারে না। আরও মূলে যেতে হবে। সব দেশে বিচ্ছিন্ন অর্থনীতিক স্বার্থগুলি মিলিয়ে এক অর্থনীতিক সমবায় গঠন না ক'রলে যুদ্ধ বন্ধ হবে না।

ইয়োরোপকে এই এক যুক্তরাজ্যে পরিণত করার চেষ্টায়

অগ্রণী হয়েছেন ভিয়েনার অধ্যাপক কাউণ্ট কাডেনহোব্ ক্যালার্গি। ফরাসীদেশের মন্ত্রী ব্রায়াণ্ডও এ বিষয়ে পরম উৎসাহী হয়েছেন। তাঁরা ইয়োরোপের সব দেশের লোকদের বুঝাচ্ছেন এই ইয়োরোপীয় যুক্তরাজ্য একান্ত আবশ্যক। কাউণ্ট ক্যালার্গি বলেন, ইয়োরোপের রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন এই প্যান-ইয়োরোপ বা ইয়োরোপীয় যুক্তরাজ্য স্থাপনের পক্ষে। ফরাসীদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী এডওয়ার্ড হেরিয়ট, ইতালির ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী সিনর নিটি, জেকোস্লোভেকিয়ার পররাষ্ট্র সচিব এডওয়ার্ড বেণিস্, পোলাণ্ডের পররাষ্ট্র সচিব কাউণ্ট স্ক্রীজন্স্কি, অষ্ট্রিয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী হার্ সিপেল, জার্ম্মাণ ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি ডাক্তার লক, জার্ম্মান গণতন্ত্রদলের নেতা ডাঃ লক্, বার্লিনের ভসিস্ জিটাং কাগজের সম্পাদক জর্জ্জ বার্ণার্ড, ফরাসীদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী পেনলিভ, অর্থ-সচিব জোসেফ্ ক্যালাক্স এবং লুসার, ডি জুভেনাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজনীতিকরা ইয়োরোপকে সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রস্তাব সমর্থন করেন।

ইংলণ্ডের একজন আইনজ্ঞ স্যার ম্যাক্স উইকটার (Sir Max Weachter) বলেছেন, "যুদ্ধনিবারণের যদি কোনও উপায় থাকে তা'হ'লে তাহা এই মিলিতরাজ্য গঠন (Such a federation, I am convinced, is the only possible alternative to war")। ইয়োরোপকে এই ভাবে একত্রিত করবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রত্যেক দেশে ভ্রমণ করেছেন, প্রত্যেক দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এই ভাবে সকলকে অনুপ্রাণিত করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মত, ইয়োরোপ এইভাবে

সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সঙ্গে মিলিত হবে এবং দুজনে মিলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে আহ্বান ক'রবে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পৃথিবী থেকে যুদ্ধ উঠিয়ে দিতে।

ইয়োরোপবাসীদের চিন্তা শান্তির পথে কিরূপ অগ্রসর হয়েছে তাহা বুঝবার জন্য এবং তাদের প্রাণে শান্তির চিন্তা প্রবলতর করবার জন্য আমেরিকার ধনী ব্যবসায়ী এড্‌ওয়ার্ড ফাইলিন (Edward Filene) ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানি এবং ইত্বালিতে, প্রত্যেক দেশে ১০ হাজার ডলার ক'রে পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।—কি ক'রে ইয়োরোপে শান্তি হতে পারে, এই সম্বন্ধে যিনি বা যাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্দেশ ক'রে প্রবন্ধ লিখতে পারবেন তাঁকে বা তাঁহাদিগকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। ইয়োরোপের চিন্তাশীল লোকদের মধ্যে ১৫ হাজার লোক প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। অর্দ্ধেক লোক মত দিয়েছেন ইয়োরোপকে মিলিতরাজ্যে পরিণত করার পক্ষে (United States of Europe)। আর অর্দ্ধেক লোক বলেছেন, অস্ত্রশস্ত্র সমূলে ধ্বংস ক'রলেই ইয়োরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

ইয়োরোপের মনীষীরা আজ ক্ষুদ্র জাতীয়ভাবের (Nation idea) উপরে উঠেছেন, বৃহত্তর ভাবে, ইয়োরোপীয় ভাবে (European idea) এসেছেন। তাঁদের চিন্তা ধাপে ধাপে উঠছে। কিন্তু এই ইয়োরোপীয় মিলিতরাজ্যের (European federation) ভাব (Idea) কার্য্যকরী হতে পারে না। আজ ইয়োরোপীয় জাতিদের স্বার্থ জগদ্ব্যাপী। নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য তারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তা'হ'লে ইয়োরোপীয়দের হাত থেকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য এসিয়ার অধিবাসীরাও সঙ্ঘবদ্ধ

হবে, এবং উভয়ের হাত থেকে তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিও সঙ্ঘবদ্ধ হবে। কার্য্যতঃও তাহাই প্রস্তাব হয়েছে। এসিয়ার জাতিগুলি মিলিত হয়ে এসিয়াবাসীদের এক মিলিতরাজ্য (Asiatic federation) স্থাপন করার প্রস্তাব হয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্য (U. S. A.) এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি (Latin-American states) ও পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন ক'রে একতাবদ্ধ হবার চেষ্টা ক'রছে। তা'হ'লে আবার, এক সম্মিলিত শক্তির (Confederation) সঙ্গে আর এক সম্মিলিত শক্তির (Confederation) সংঘর্ষ অনিবার্য্য। এ তো পৃথিবী থেকে যুদ্ধ উঠিয়ে দেবার পথ নয়। এ আরও বড় ক'রে যুদ্ধ বাঁধাবার পথ। চিন্তান্তরের আর এক ধাপ উপরে উঠলেই ইয়োরোপ, এসিয়া এবং আমেরিকার মনীষীরা বুঝতে পারবেন যে, ইয়োরোপের বা কোনও দেশের স্বার্থ সমস্ত পৃথিবীর লোকের স্বার্থ থেকে ভিন্ন নয়। শ্রীভগবানের বিচিত্র বিধানে আজ ইয়োরোপ, এসিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা—সকলের স্বার্থই এক অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক স্বার্থ এক, পার্থিব স্বার্থও এক এবং অবিভাজ্য। যুদ্ধের সর্ব্বনাশের হাত থেকে ইয়োরোপ যদি সত্যই বাঁচতে চায়, তা'হ'লে ইয়োরোপকে মিলিতরাজ্যে পরিণত ক'রে ইয়োরোপীয়দের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের পথ বন্ধ ক'রলেও ইয়োরোপ তো যুদ্ধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না। বহুদেশকে নিয়ে এক মিলিতরাজ্য গঠন করাই যদি তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধনিবারণের পথ হয়, তা'হ'লে পৃথিবীর সবদেশগুলিকেই—এই মিলিতরাজ্যের

ভিতর নিতে হবে। একজনকেও বাদ দেবার উপায় নাই। ইয়োরোপের মনীষীদের মধ্যে অনেকেই এই চিন্তায় এসেছেন। বারট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel), এনাটোল ফ্রান্স (Anatole France), রোমে রোলা (Romain Rolland) এইচ্ জি ওয়েলস্ (H. G. Wells) প্রভৃতি বহু চিন্তাশীল লোক আজ এই বিশ্বসাধারণতন্ত্র (World Republic) বা বিশ্বমিলিত রাজ্যের (United States of the World) চিন্তা পোষণ এবং প্রচার করছেন।

জগতের সমস্ত চিন্তাশীল লোকই আজ এ কথাটি স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর রূপে বুঝছেন যে পৃথিবী থেকে যুদ্ধকে চিরতরে নির্ব্বাসন দিতে হ'লে সমস্ত দেশগুলির পার্থিব স্বার্থের একটি সামঞ্জস্য বিধান করা নিতান্ত আবশ্যক। চিন্তাজগতের বিরাট চিন্তা সকলের মনকে এই দিকে ফিরিয়েছে, সকলকে বাধ্য করছে এই চিন্তা ক'রতে। জাতিতে জাতিতে যে হিংসাবিদ্বেষ ও সংঘর্ষ তাহা এই পার্থিব স্বার্থ (economic interest) নিয়ে, ব্যবসায় প্রতিযোগিতা (trade competition) নিয়ে, কাঁচা মাল (raw materials) সংগ্রহ করা নিয়ে, প্রত্যেকের তৈরী মাল অবাধে বিক্রয় করার বাজার (market) নিয়ে। ইয়োরোপের বড় বড় দেশগুলি শিল্প বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ক'রে দ্রব্যাদি উৎপাদনের চরম উৎকর্ষ সাধন করেছে। তাদের দেখাদেখি ইয়োরোপ, আমেরিকার, এশিয়ার সব জাতিগুলি শিল্প বাণিজ্যে মন দিয়েছে, সবাই চায় মাল উৎপন্ন ক'রতে, নিজ নিজ পণ্য বিক্রয় ক'রতে, অপরের পণ্য কেহ কিনতে ইচ্ছুক নয়; প্রত্যেকেই চায় অপর দেশের পণ্য নিজের দেশে ঢুকতে না দিতে। প্রত্যেকেই চায়

অবাধে কাঁচা মাল সংগ্রহ ক'রতে, প্রত্যেকেই চায় নিজস্ব বাজার (market)। নিজ নিজ স্বার্থের প্রসার এবং নিজ নিজ লাভের গণ্ডা বাড়াবার চেষ্টাই সকলে ক'রছে। একজনের স্বার্থ বজায় রাখতে গেলে আর একজনের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবেই।

পৃথিবীর রবারের চাষ (rubber production) প্রধানতঃ ইংরাজের হাতে, আমেরিকা এবং অন্যান্য জাতির স্বার্থ তাতে ক্ষুণ্ণ হয়। এই নিয়ে ইংরাজ ও আমেরিকার মধ্যে বেশ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছে। রবার আমেরিকার নিতান্ত প্রয়োজন, তাকে রবার সংগ্রহের জন্য সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকতে হয়, ইংরাজের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। বর্ত্তমানে খনিজ তৈল একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার কয়েকটি বড় বড় কোম্পানীর হাতে পৃথিবীর সব তেলের খনি চলে গিয়েছে। তারা নিজেদের লাভ ষোল আনা বজায় রেখে ইচ্ছামত চড়া দরে বাজারে তাদের পণ্য বিক্রয় করে। ফরাসীর অনেক লৌহ কারখানা আছে কিন্তু লৌহ কারখানার যাহা অত্যাবশ্যক—কয়লা, তাহা তার নাই। ইংলণ্ডের অপর্য্যাপ্ত কয়লা আছে। কিন্তু যুদ্ধের পর কয়লার অভাবে ফ্রান্সের লৌহ কারবারগুলি যখন মুস্কিলে পড়েছিল, তখন ইংলণ্ডের খনিওয়ালারা বেশ চড়া দরে তাদের কয়লা ফ্রান্সকে বিক্রয় করেছিল। এতে একজনের লাভ, আর এক জনের ক্ষতি নিশ্চিত। পৃথিবীর তূলা, গম, চিনি প্রভৃতি নিয়েও এইরূপ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছে। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ স্যার যোশিয়া ষ্ট্যাম্প (Sir Josiah Stamp) বলেন, "বর্ত্তমানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য

জগতের সকল জাতির অত্যাবশ্যক কাঁচামাল নিজেদের কর-তলগত ক'রে রেখেছে—বাদ আছে শুধু ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ পটাশ, এবং চিলিদেশের নাইট্রেট্।" * এই সব অবস্থা দেখে তিনি বলছেন, "কাঁচামাল নিয়ে প্রতিযোগিতার ফলে এমনই এক অবস্থা দাঁড়িয়েছে যাতে জগতের শান্তিভঙ্গের বিশেষ আশঙ্কা রয়েছে।" †

পৃথিবীর এই সব কাঁচামাল দুই একটি জাতির বা ধনিকদের করায়ত্ত না রেখে দয়ানন্দ-স্কীমের নির্দ্দেশ মত জগতের সকল জাতির মধ্যে প্রত্যেকের ন্যায্য প্রয়োজনানুসারে ভাগ ক'রে দিলে কাহারও মনঃকষ্টের কারণ ঘটে না, জগতের অশান্তি ঘটে না। জগতের অর্থনীতিক অসামঞ্জস্য দূর ক'রে সামঞ্জস্যবিধান করার এই একমাত্র উপায়। বুদ্ধির দিক্ দিয়ে, ন্যায়ের দিক্ দিয়ে, ধর্ম্মের দিক দিয়ে এর চেয়ে সুমীমাংসা হতে পারে না। অবস্থার তাড়নায় বাধ্য হয়ে জগৎ এই পথে আসছে। ইটালি প্রভৃতি কয়েকটি দেশ লীগ্ অব্ নেশনস্ এর কাছে এই প্রস্তাব করেছেন ‡ যে এই সব কাঁচামাল জাতিবিশেষের একচেটিয়া না রেখে প্রত্যেক জাতির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হ'ক—প্রত্যেকের প্রয়োজন বিচার ক'রে ("to each according to its

* "At present America and the British Empire controlled all the leading raw materials, the most important exception being Franco-German potash and Chilean nitrates."

† "The situation created by the competition for raw materials is fraught with danger to international peace."

‡ Christian Science Monitor, July 22, 1926.

need")। দয়ানন্দ-স্কীমকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। বিশ্বের সমস্ত নর-নারীর মনের দুয়ারে এই প্রবল চিন্তা প্রতি-নিয়ত আঘাত ক'রছে। যেদিন বিশ্বের নর-নারী প্রাণের দুয়ার খুলে এই স্কীমকে সানন্দে বরণ ক'রে নেবে, সেইদিনই জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

ইংলণ্ডের বড় বড় কল কারখানা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যবসা আছে কিন্তু তার ঘরে খাদ্য নাই। যাহা আছে তাহা মাত্র ৬ সপ্তাহ চলে। ঐই খাদ্যের চিন্তায় সে আকুল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ দিলে তবে সে খেতে পায়। কিন্তু তার এ চিন্তার তো কোনও আবশ্যক নাই। যদি এক সার্ব্বজাতিক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের (Central Organisation) নির্দ্দেশ মত সে তার তৈরী মাল (finished goods) যে যে দেশের ঐ সব জিনিষের প্রয়োজন, তাদের দেয় এবং যাদের ঘরে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য আছে, তারাও যদি ইংলণ্ডকে তার প্রয়োজন মত খাদ্য দেয় তা' হ'লে সকলেরই সুবিধা হয়। যার খাদ্যের অভাব সে খাদ্য পায়, যার যে তৈরী মালের দরকার সে তাহা পায়। একটি জাতিরও ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এক ভাবে এই আদান প্রদান হচ্চে কিন্তু তার মাঝখানে রয়েছে এক দুরতিক্রম্য অন্তরায়—ব্যক্তিগত লাভের চেষ্টা। এখনকার যে আদান প্রদান, তাহা হচ্চে লাভ লোকসানের দিক দিয়ে, মানুষের প্রয়োজনের দিক দিয়ে নয়। ইংলণ্ড তার তৈরী বস্ত্র বা কয়লা যার প্রয়োজন তাকে দেবে না, যাকে বিক্রয় করে তার লাভের পরিমাণ বেশী হবে তাকেই দেবে। তাকে যে আহার্য্য দেয় সেও দেখে তার নিজের লাভের দিকটাই।

তার চেয়ে কেহই যদি এই লাভ লোকসানের দিকে না তাকিয়ে যার যতখানি প্রয়োজন তাহা চায় ও পায়, পরস্পরের জিনিষ পরস্পরকে দিয়ে পরস্পরের অভাব পূরণ করে, তা' হ'লে আর বিসম্বাদের কোনও কারণ থাকে না। আর এমন সুব্যবস্থা যদি জগতে থাকে যে যার যতটুকু প্রয়োজন সে পাবেই তা' হ'লে প্রয়োজনাতিরিক্ত কাহারও চাওয়ার প্রয়োজন হয় না। সঞ্চয় করারও দরকার হয় না, কারও লোকসান ক'রে নিজের লাভের পরিমাণ বাড়াবার চেষ্টা করার প্রয়োজন হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হওয়ায় মানুষ তাহা তার কাজে লাগাচ্চে। প্রত্যেক দেশে প্রচুর মাল উৎপন্ন হচ্চে। একই জিনিষ বহুদেশে প্রস্তুত হচ্চে। তাতে অযথা শক্তিক্ষয় হচ্চে। সকলেই চায় বিক্রয় ক'রতে, ক্রয় করবার লোকের অভাব। মাল প্রস্তুত না ক'রে কারখানা বন্ধ রেখে লাভ নাই, মাল প্রস্তুত ক'রে ধরে রেখেও লাভ নাই, বিক্রয় করতেই হবে। একজন চায় কম দামে বিক্রয় ক'রে নিজের মাল বাজারে চালাতে। এতে ন্যায় অন্যায়ের ধার কেহ ধারে না, নিজের পণ্য বিক্রয় হলেই হ'ল। এই মূল্য কমিয়ে বিক্রয় করার চেষ্টা (price-cutting war) জগতে বহু অশান্তির সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা তার কয়লা নিয়ে এসে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালাদের সস্তায় বিক্রয় ক'রছে। বাংলার কয়লার কারবারীরা এত সস্তায় দিতে পারছে না। তাই বাংলার কয়লার খনিগুলি কাজ বন্ধ ক'রে ব'সে থাকতে বাধ্য হচ্চে। জাপান চীনে এবং নিজের দেশে অনেক কাপড়ের কল বসিয়েছে। ভারতের কাপড়ের বাজারে সে

এমনই প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে যে ভারতীয় এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্রব্যবসায়ীরা তাদের কাছে পরাস্ত হয়ে যাচ্চে। এর ফলে সকলেরই লোকসান। চাহিদা (demand) যদি বেশী না থাকে, জোগানও কম ক'রতে হবে। ৮ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে হয়ত কারখানা ৫ ঘণ্টা চালাতে হয়, ৭ দিনের পরিবর্ত্তে ৪ দিন চালাতে হয়। অনেক সময় সপ্তাহের পর সপ্তাহ একেবারে বন্ধ দিতে হয়। তা' না হ'লে লোকসানের অঙ্ক বেড়ে যায়। এর ফলে মজুরদের নিরন্ন থাকতে হয়।

এর অর্থ এমন নয় যে পৃথিবীতে মানুষের অভাব নাই, বা এই সব পণ্যের প্রয়োজন নাই। তা আছে। কিন্তু ব্যবসায়ীর লাভের কড়ি দিয়ে কেনবার মানুষ কম। পৃথিবীতে যে বস্ত্র উৎপন্ন হয় বা হতে পারে তার সবটাই প্রয়োজন হয়।

পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ আছে যারা বিবস্ত্র বা বস্ত্রহীন, বস্ত্রাভাবে লজ্জানিবারণ ক'রতে পারে না। বস্ত্র উৎপাদনের উপায় রয়েছে, অথচ মানুষ বস্ত্রহীন। অদৃষ্টের এ কি পরিহাস। জগতের বর্ত্তমান অর্থনীতিক বিধিব্যবস্থার এইই ফল। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, ইজিপ্টে অপর্য্যাপ্ত তুলা উৎপন্ন হয়, সময় সময় ক্রেতা না থাকায় বা অল্পমাল বেশী দরে বিক্রয় করার জন্য কিছু তুলা আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করাও হয়। ইংলণ্ডে উৎকৃষ্ট কাপড়ের কলকারখানা আছে। পৃথিবীতে বস্ত্রের হাহাকারও আছে। আমেরিকা চায় লাভ ক'রে তুলা বিক্রয় ক'রতে। ইংলণ্ড চায় সুবিধায় তুলা কিনে বেশী লাভে বস্ত্র বিক্রয় ক'রতে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এই লাভ দিয়ে উঠতে পারে না। খোদায় দিলেও জোলা দিতে

চায় না, সে বলে এ তার লাভের ব্যবসায়, এ exchange for profit.

আমেরিকাতে এবং ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হয়, সময় সময় কতক অংশ পুড়িয়ে ফেলা হয়। ইংলণ্ড তার খাদ্যের চিন্তায় আকুল, রুশিয়াতে, চীনে দুর্ভিক্ষে মানুষ খেতে না পেয়ে ম'রে যায়, ভারতের থেকেও নাই, তার এক তৃতীয়াংশ লোক একবেলা খেয়ে থাকে। কেন এমন হয়? এতো শুধু ব্যবস্থার দোষে। মানুষের প্রকৃত অভাব সীমাবদ্ধ, কিন্তু তার লাভের আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন। এই মিথ্যা লাভের মায়াতে কতকগুলি মানুষ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে। ভগবান তো মানুষকে দিতে কম করেন নাই। পৃথিবীর উৎপন্ন দ্রব্যে প্রত্যেকেরই অভাব পূরণ হয়, আর অভাব পূরণ হবার সুব্যবস্থা হ'লে মানুষের নিজের ও সন্তান-সন্ততির জন্য সঞ্চয় করার প্রয়োজন হয় না। শ্রীভগবানের কৃপায় মানুষের এই মায়া কেটে যাচ্চে, প্রত্যেক নর-নারীর প্রাণে দয়ানন্দ-স্কীম মূর্ত্ত হয়ে উঠছে। প্রত্যেক চিন্তাশীল লোকের চিন্তার ভিতর দিয়ে এই স্কীম ফুটে উঠছে; অবস্থার তাড়নায় সকলেই এই স্কীমকে কার্য্যে পরিণত করার চিন্তা ও চেষ্টা করছে।

মিঃ গ্যারেট গ্যারেট (Mr. Garet Garett) তাঁহার "Ouroboros or the Mechanical extension of Mankind" গ্রন্থে বলছেন *

* "The work of the world must be divided up among the several peoples according to their aptitudes and environments, each exchanging its products with the others solely for mutual advantage and without hope of profit."

"মানবজাতির সুখ সুবিধার জন্য যতপ্রকার কাজ মানুষকে ক'রতে হয়, তাহা একই জাতি করবার চেষ্টা না ক'রে সকল জাতির ভিতর সেই কাজ ভাগ ক'রে দিতে হবে। যে যে কাজের উপযুক্ত, যে কাজ করবার যার প্রকৃতিদত্ত সুবিধা আছে সে সেই কাজ ক'রবে। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ উৎপন্ন দ্রব্য পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় ক'রে নেবে—লাভের কোনও আশা না ক'রে—শুধু পরস্পরের সুখ সুবিধার জন্য।"

এই হ'ল দয়ানন্দ স্কীমের কথা। শ্রীভগবান একই দেশের মানুষকে সকল গুণের অধিকারী করেন নাই। একই দেশে মানুষের প্রয়োজনীয় সব জিনিষ উৎপন্ন হয় না। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশকে তিনি পরস্পরমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন। মনুষ্যজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যে সব গুণের প্রয়োজন তাহা এক জাতি না এক জাতির ভিতর আছে। যত কিছু পার্থিব বস্তুর প্রয়োজন তাহা এক দেশে না এক দেশে আছে। মানুষ শুধু শ্রীভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্য উপলব্ধি ক'রে সেইমত চ'ললেই তার শান্তিলাভ হয়, সে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস ক'রতে পারে।

মনস্বী এনাটোল ফ্রান্স (Anatole France) ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলেছেন,

"যুদ্ধে চরম সাফল্যলাভ করবার জন্য ইয়োরোপীয় জাতিগুলি সে সময়ে নিজ নিজ দেশের ভিতর সমস্ত ব্যক্তিগত শক্তি ও পার্থিব সম্পদ একত্র ক'রেছিল। সে সময়ে প্রত্যেক দেশের লোক যেন এক পরিবার হয়ে গিয়েছিল। ইয়োরোপীয় জাতিগুলির পক্ষেও ঠিক সেই ভাবে পরস্পরের সঙ্গে এক

পরিবারভুক্ত হয়ে যাওয়াই ইয়োরোপের একমাত্র আশার পথ" *

ইয়োরোপের যাহা একমাত্র আশার পথ সমস্ত জগতের পক্ষেও তাহাই—তাহা হচ্চে দয়ানন্দ স্কীম।

ইংলণ্ডের একজন প্রধান ব্যবসায়ী স্যার এলফ্রেড্ মণ্ড (Sir Alfred Mond, now Lord Melchett) বলছেন, আজ পৃথিবীর প্রয়োজন হয়েছে একটি সার্ব্বজাতিক মাল-উৎপাদন সঙ্ঘের ("League of Nations in industry")। আজ এই উপায়টিই মানুষের কাছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলে মনে হচ্চে। অজ্ঞাতসারে, জগতের সমস্ত মাল-উৎপাদন-যন্ত্রগুলি (economic units) পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাচ্চে। কি ভাবে দয়ানন্দ-স্কীম বাস্তবে পরিণত হচ্চে স্যার এলফ্রেড্ মণ্ড তাহারই সাক্ষ্য দিতেছেন। তিনি বলছেন,

"জগতের বর্ত্তমান অর্থনীতিক ধারা যদি কেহ পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখেন তা' হ'লে এ ধারণা তাঁর বদ্ধমূল হবে যে, জগতের বিভিন্ন স্বার্থ এবং উৎপাদন-যন্ত্রগুলি ক্রমে ক্রমে এক হয়ে যাচ্চে। এই মিলনের ফলে, উৎপাদন-যন্ত্রগুলি বৃহৎ হতে বৃহত্তর হয়ে যাচ্চে। সবগুলি একই কেন্দ্র হতে একই বৃহত্তম উৎপাদন-ব্যবস্থার অঙ্গরূপে চালিত হওয়ার দিকে চলেছে" †

* "For the maximum effort in the war, each nation pooled all its resources and its strength and theoretically, at least, the people of that nation were for the time being but one family. This sort of action on an international plane seems to be the only hope for Europe."

† "Anyone who studies the economic trend of the world of the present day has borne in on him the obvious

এ সবই হচ্চে দয়ানন্দ-স্কীমকে কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা। পৃথিবীর সমস্ত কয়লা-উৎপাদন-যন্ত্রগুলি যোগযুক্ত হয়ে যাওয়া চাই। একদিকে পৃথিবীর সমস্ত কয়লার খনিগুলি একযোগে কয়লা উত্তোলন ক'রবে, অপরদিকে প্রত্যেক দেশের প্রয়োজন মত তাহা প্রত্যেককে ভাগ ক'রে দেবার বন্দোবস্ত ক'রতে হবে। পৃথিবীর সমস্ত লৌহ-কারখানাগুলি এক হয়ে গিয়ে পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রয়োজন মত লৌহ উৎপন্ন ক'রবে, অপরদিকে এক বিশ্ব-কেন্দ্রের নির্দ্দেশমৃত তাহা প্রত্যেক দেশকে বেঁটে দিতে হবে। সেইদিকে জগতের সমস্ত শিল্পবাণিজ্য, সমস্ত উৎপাদন-যন্ত্রগুলি,—জগতের সমস্ত কর্ম্মধারা চলেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্যার এলফ্রেড্ বলছেন,

"জগতের সব উৎপাদন-যন্ত্রগুলি যে ক্রমে ক্রমে মিলিত হয়ে এক বৃহৎ উৎপাদন-ব্যবস্থার অঙ্গরূপে পরিণত হচ্চে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্চে জার্ম্মাণ, বেলজিয়ান ও ফরাসী লৌহ কারবারগুলির, অল্পদিন হ'ল যে মিলন হয়েছে, তাহা থেকে। পটাশ্ এবং রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন কারবারগুলিও মিলিত করবার কথাবার্ত্তা চলছে। আরও প্রমাণ পাওয়া যায় সম্প্রতি ইংরাজ এবং জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদের (এইরূপ মিলন উদ্দেশ্যে) যে পরামর্শসভা হয়েছিল তাহা হতে"। *

---

fact of a continuously growing concentration of interests and industry. Economic units become larger and larger. Industries become more and more operated as units."

* "There is evidence of this (concentration) in combinations recently effected between the German steel trust and the Belgian and French steel industry, negotiations of similar combinations between potash and chemical firms and the recent Anglo-German business conference."

তা' হ'লে আমরা দেখছি দয়ানন্দ-স্কীম শুধু চিন্তাজগতেই রয়েছে না, তাহা মানবজাতির জীবনের ধারাই বদলে দিয়েছে। এই চিন্তাশক্তিই পুরাতন বিধিব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নূতন ক'রে গ'ড়ছে। এই চিন্তাশক্তিকে ঠেকিয়ে রাখবার উপায় নাই। তার শক্তি অমোঘ। সে সৃষ্টির নিয়ম (Law) অনুসারে কাজ ক'রে যাচ্চে। ব্রিটীশ কোল কমিশনের (British Coal Commission) সম্মুখে সাক্ষ্য দেবার সময় আন্তর্জাতিক খনিক-সভার (International Federation of Miners) সেক্রেটারী ফ্র্যাঙ্ক হজেস্ (Frank Hodges) যে প্রস্তাব করেছেন, তাহা এই—

"কয়লার ব্যবসাতে প্রতিযোগিতার দাম কমিয়ে কয়লা বিক্রয় করা নিয়ে যে উপদ্রবের সৃষ্টি হয়েছে তাহা নিবারণের একমাত্র উপায়, একটি সার্ব্বজাতিক কোল-কাউন্সিল গঠন ক'রে, সব দেশের প্রয়োজন মত কয়লা সরবরাহের ভার সেই কাউন্সিলের উপর দেওয়া"। *

পৃথিবীর সমস্ত কয়লার খনিগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করে, প্রত্যেক দেশের প্রয়োজন মত কয়লা ভাগ ক'রে দেওয়ার দিকেই এই প্রস্তাব। হজেস্ যদি ব'লতেন, "An International Coal Council to be charged with the duty of organising the production of Coal in each country, and its distribution amongst all the countries,

* "To establish an international Coal Council to be charged with the duty of organising the distribution of coal exports, with the object of eliminating price-cutting competition."

according to the need of each—"তা'হলে সম্পূর্ণরূপে স্কীমের কথাই বলা হত। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির প্রথা এখনও রয়েছে, তাই সেইদিক দিয়েই তিনি দেখছেন। জগতে ব্যক্তিগত লাভের আদানপ্রদান এখনও চলেছে তাই তিনি 'মূল্য' এবং প্রতিযোগিতার দিক দিয়েই দেখছেন। বর্ত্তমান মানবসমাজব্যবস্থায় যে মহাত্রুটী রয়েছে তাহা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে ইহার আমূল সংস্কার না ক'রলে এই জীর্ণ সমাজ প্রথা (capitalistic system) আর দাঁড়াতেই পারে না। ইহার সংস্কার ক'রতে গিয়ে জগৎ আজ স্কীমের দিকেই ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হচ্চে।

এই ভাবে এই চিন্তা যে শুধু একজন মণ্ড বা একজন হজেসের প্রাণেই খেলছে তা' নয়, অবস্থায় বাধ্য হয়ে জগতের সকলজাতির লোকের মনই উপায় চিন্তা করছে, আর সেই অবসরে স্কীমের বিরাট চিন্তাই সকলের মনকে অভিভূত করছে। বোষ্টনের Christian Science Monitor সংবাদপত্র লিখেছেন:—

"(জার্ম্মাণির) ওয়েষ্টফ্যালিয়া প্রদেশে গিয়ে তিনি (মিঃ হজেস্) জার্ম্মাণ বণিকদের এবং অন্যান্যের সঙ্গে এই বিষয়ে (আন্তর্জাতিক কোল কাউন্সিল) আলাপ আলোচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে গভীর আলোচনা হয়েছিল। প্রতিবন্ধকের দিকটাই বড় করে দেখানো হয়েছিল। তবুও বর্ত্তমান জাগতিক অর্থনীতিক সমস্যার উপায় নির্দ্দেশক ব'লে এই প্রস্তাবকে সসম্মানে গ্রহণ করা হয়েছিল।" *

* "In a visit to Westphalia he (Hodges) discussed this with German miners and others concerned in the industry. Keen discussion followed. Difficulties were stressed but the proposal was treated with respect as a serious contribution to the industrial thought."

কালপ্রভাবে সকলেরই প্রাণে এই স্কীমের বিরাট চিন্তারই প্রতিধ্বনি হচ্চে। কে ইহাকে বারণ করে রাখতে পারে? হজেস্ তাদের বুঝালেন :—

"জগতে যে পরিমাণ কয়লা ব্যবহারে লাগে তার চেয়ে বেশী পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করার ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে, কয়লার ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা অনিবার্য্য। অন্যথায়, তাদের ভিতর সহযোগিতা স্থাপন ক'রতে হবে, কে কোন্ বাজারে এবং কি মূল্যে কয়লা বিক্রয় ক'রবে তাহা নির্দ্ধারিত করে দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে খণিকদের সঙ্গতরূপ উচ্চজীবন যাপনের ব্যবস্থা ক'রতে হবে, আবার যারা কয়লা ব্যবহার ক'রবে তাদের স্বার্থও দেখতে হবে।" *

প্রতিযোগিতাই প্রতিযোগিতার বিনাশসাধন ক'রছে, আর তা' থেকে উদ্ভূত হচ্চে স্কীমের আদর্শানুযায়ী বিধিব্যবস্থা—বিশ্বমানবের সহযোগিতা। হজেস বলছেন, কোন্ কয়লার খনি কোন্ কোন্ দেশকে কয়লা দেবে তাহা ঠিক ক'রে দিতে হবে। আর কয়লা যারা উৎপন্ন ক'রবে সেই শ্রমিকদের সুখ-সুবিধাস্বাচ্ছন্দ্য দেখতে হবে, আর যারা কয়লা নেবে তাদের স্বার্থও দেখতে হবে। এ সব স্কীমেরই পূর্ব্বাভাষ। শুধু মূল নীতিটি হজেস্ এখনও ধ'রতে পারেন নাই ব'লে স্কীমের কার্য্যের

---

* "Productive capacity is increasing more quickly than consumption. In these circumstances, Mr. Hodges argues, competition must grow fiercer. Or, there must be co-operation, allocation of markets on a fair basis and price fixing, providing reasonable standard of life for the miners with due safeguards for the consumers.

সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবের একটু প্রভেদ হচ্ছে। তা' না হ'লে, হজেসের মুখ দিয়ে স্কীমের কথাই বাহির হয়েছে, স্কীমকে কার্য্যে পরিণত করার প্রস্তাবই তিনি করেছেন।

জার্ম্মাণরা হজেস্‌কে জানিয়ে দিল, এ পথে তারাই বেশী অগ্রসর হয়েছে, শুধু ইংরাজজাতি পিছিয়ে রয়েছে। Monitor লিখেছেন:

"জার্ম্মাণরা এই কথাটির উপরই জোর দিল যে, এ বিষয়ে প্রধান অসুবিধা হয়েছে গ্রেটব্রিটেনে কয়লার কারবারগুলি একতাবদ্ধ ও একই কেন্দ্রীয় সমিতির অধীন নয়। ব্রিটিশ কারবারগুলি অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে চালিত হচ্ছে, শত শত কারবারীরা স্বদেশে এবং দেশের বাহিরে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে প্রতিযোগিতা ক'রছে বলে তারা মনে করে।" *

এই ভাবে ইয়োরোপের এক এক দেশের এক এক জিনিষের কারবারীরা নিজেরা এবং অন্যান্য দেশের সেই সেই জিনিষের কারবারীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাচ্ছে। তাদের চেষ্টা চাহিদা অনুসারে মাল উৎপন্ন করা এবং কে কোন্ দেশে কি পরিমাণ মাল দেবে তাহা স্থির ক'রে সেই মত মাল দেওয়ার। এইরূপে একই জিনিষের ব্যবসায়ীদের ১৫৩টী সঙ্ঘ (Cartels) ইয়োরোপে স্থাপিত হয়েছে। প্রস্তাব হয়েছে ইয়োরোপের সমস্ত রেলওয়ে-

* "The main difficulty stressed by Germans is the absence in Great Britain of any central organisation in the coal industry. They regarded the British industry as chaotic with hundreds of individual owners all competing keenly, one against the other both for the domestic and export trade."

গুলিকে মিলিত ক'রে সকলে একযোগে কার্য্য করার, যাতে মাল ও যাত্রী চলাচলের আরও বেশী সুবিধা হয়, সকলের সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রত্যেক দেশের রেলওয়ে-গুলির একই সঙ্গে উন্নতি হয়।

আজ আমরা এ কি দেখছি ? এতকাল যে সব ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগতলাভের জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে পরস্পরের শক্তিক্ষয় করছিল, দেশে দেশে হিংসাবিদ্বেষের, অশান্তির, যুদ্ধের সৃষ্টি করছিল, আজ তাদের কার্য্যের ধারা সম্পূর্ণরূপে বদলে গিয়েছে। আজ তারা সকলে মিলিত হয়ে যাচ্চে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সকলে একযোগে কাজ ক'রতে চাইছে, শুধু চাইছে নয়, কাজ আরম্ভ ক'রেছে। তা'হ'লে দেখা যাচ্চে তাদের চিন্তার ধারাই সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে, তারা এক নূতনদৃষ্টি লাভ করেছে, তাদের প্রাণে আজ এক নূতনভাব খেলছে। যুদ্ধের যেখানে মূল কারণ, দেখা যাচ্চে আজ সেখানেই শান্তিস্থাপনের চেষ্টা, ভেদকে মিলনে পরিণত করবার চেষ্টা। এ তো শুধু বাহিরের মিলন নয়, এ মিলন আসছে জাতির প্রাণের ভিতর থেকে। কোন্ মহাপ্রাণ আজ সমস্ত মানবজাতিকে এমন ক'রে প্রাণে প্রাণে মিলিয়ে দিল ?

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ও একই জাতীয় সমস্ত কারবারগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে লৌহসঙ্ঘ (steel trust), তৈলসঙ্ঘ (oil trust) শস্যসঙ্ঘ (Corn trust) ইত্যাদি স্থাপন করেছে। এখন তারা সঙ্ঘবদ্ধ হচ্চে ব্যক্তিগত লাভের জন্য। কিন্তু এই ব্যক্তিগত লাভের মায়া শীঘ্রই কেটে যাবে। সেদিন এই সব সঙ্ঘগুলি পৃথিবীর সমস্ত লোকের উপকারে আসবে। আমেরিকা জগতের

সমস্ত লোককে মোটরগাড়ী জোগাবার ভার পেয়েছে। এই কার্য্যে তারা বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছে। তাদের দেশের প্রধান প্রধান মোটরগাড়ীর কারবারগুলি মিলিত হয়ে এক বিরাট কারবার গড়ে তুলেছে। যেদিন দয়ানন্দ-স্কীম পূর্ণভাবে জগতের লোক ধ'রতে পারবে, সজ্ঞানে, পরমানন্দে এই স্কীমকে কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টা ক'রবে, সেইদিনের জন্যই শ্রীভগবান এই সব সঙ্ঘগুলি গ'ড়ে তুলছেন।

পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ, ভেদবিসম্বাদের গোড়ায় রয়েছে ব্যক্তিগত লাভের চেষ্টা, ব্যক্তিগত স্বার্থ। একদেশ চাচ্চে আর একদেশের কাছ থেকে লাভ ক'রতে। ধনী সম্প্রদায় চাচ্চে সস্তায় শ্রমিকদের খাটিয়ে, তাদের দিয়ে মাল উৎপন্ন ক'রে, পৃথিবীর বাজারে বাজারে তাদের মাল বিক্রয় ক'রে লাভের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে। পৃথিবীর সমস্ত অশান্তির মূলে রয়েছে এই আর্থিক সমাজব্যবস্থা (Economic order of the world)।

এই স্বার্থের তাড়নায়, এই ব্যক্তিগত লাভের লোভে, নিরুপদ্রবে কাঁচামাল (raw materials) সংগ্রহ করবার, অবাধে মাল বিক্রয় করবার লোভে একদেশ আর একদেশকে পরাধীন ক'রে রেখেছে। কিন্তু পরাধীন জাতিগুলির প্রাণে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বলবান্ হয়ে উঠেছে, তারা কিছুতেই পরাধীন থাকতে চাইছে না। আজ জগৎ জুড়ে জেতা-বিজিতের সংঘর্ষ চলেছে। স্বাধীনতা তাদের দিতেই হবে। বিজেতারা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যুদ্ধ ক'রতে শিখেছে, তাদের অসংখ্য সুশিক্ষিত সৈন্য, অফুরন্ত অস্ত্রশস্ত্র। আজকার যুদ্ধ পূর্ব্বের ঢাল তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ নয়। বিজেতার শক্তির কাছে বিজিতের শক্তি অতি নগণ্য, তুচ্ছ, কিছুই

নয়। বিজেতার প্রবল শক্তিকে পরাজয় ক'রে যে বিজিত তার নষ্টস্বাধীনতা উদ্ধার করবে তার পথ নাই। সে পথ শ্রীভগবান বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

একদিকে পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু জোর ক'রে নষ্টস্বাধীনতা উদ্ধার করার শক্তি তাদের নাই। পরাধীন জাতিদের উভয়সঙ্কট। অপরদিকে যত বড় প্রবল শক্তিই হ'ক, মানুষের প্রাণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা চিরদিন কেহ দমন করে রাখতে পারে না। কিন্তু পরাধীন জাতিদের পরাধীন রেখে তাদের সুখসুবিধা অপহরণ ক'রে, বহুদিন ধরে ভোগ ক'রতে ক'রতে বিজেতাদের জীবন একভাবে গ'ড়ে উঠেছে। পরাধীন জাতিদের স্বাধীনতার দাবী যতই ন্যায্য হ'ক, এক কথায় তারা এতখানি সুখসুবিধা ছেড়ে চলে যেতে পারে না। বিজেতার পক্ষেও আজ উভয়সঙ্কট।

বিজিত ও বিজেতার এই উভয়সঙ্কট থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় দয়ানন্দ-স্কীম। যে সমস্যা ধ'রে মানুষ চিন্তা করুক না কেন, এই স্কীমে তাকে আসতেই হবে। সব জলপ্রবাহ সমুদ্রের দিকেই চলেছে। এই স্কীমের প্রতিধ্বনি ক'রে আমেরিকার অধ্যাপক হ্যারি এফ্‌ ওয়ার্ড (Professor Harry F. Ward) বলেছেন *

---

*"The end of the colonial period has come. One race will no longer consent to be governed by another. It is no longer possible to do good that way. If there is any statesmanship left in the white race, it will frankly abandon the attempt and seek to discover what self-determination for all peoples may mean in all the aspects of

"রাজ্যবিস্তারের যুগের অবসান হয়েছে। একজাতি আর অপরজাতির দ্বারা শাসিত হতে চাচ্চে না। এইভাবে জোর ক'রে আর কেহ কাহারও মঙ্গলসাধন ক'রতে পারবে না। শ্বেত-

---

organised life, not only in Europe but *clear to the ends of the earth.*

"Such an attempt will necessarily involve *the abandonment of the idea of profit* and the practice of economic exploitation. It is a commonplace that the points of hottest conflicts between the races, as between the classes, are the points where profit is highest.

If there were no profit for the white man in China or India or the Phillipines, *there would be no objection to their Independence.* If we can not accept the idea that *the earth is for the development of all the children of man if we cannot learn how to administer it for purposes of mutual aid,* then we must resign ourselves to a future of increasing conflict between the races.

"Unless we can construct its *economic base,* the ideal of world fellowship will remain only an ideal; the possibilities of fusion that now exist in the realm of mind and spirit will remain unrealised.

"For the development of these two basic concepts—self-government for all peoples and the earth as the source of our commonwealth—the next practical steps are the announcement by the great powers of their intention of *restoring full sovereignty to all subject peoples,* with a definite date set and methods of transfer of control specified, and the *calling of a world-wide economic conference to arrange for the development and distribution of basic necessities, according to need.* Until these two steps are taken, there will be no diminution of inter-racial antagonism and conflict."

জাতিদের যদি রাজনীতিক বুদ্ধির কিছুমাত্র অবশিষ্ট' থাকে, তা'হ'লে তারা সে বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে, মানবসমাজে, শৃঙ্খলা বজায় রেখে, প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক জাতিকে, শুধু ইয়োরোপের নয়, পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলিকেই কতখানি আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে, এই কথাটিই বুঝে দেখবার চেষ্টা ক'রবে।

"এই ভাবে সকল জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিতে গেলে (ব্যক্তিগত) লাভের কথা কাজে কাজেই একেবারে বাদ দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের লাভের জন্য এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে খাটিয়ে নেওয়া বা একজাতি অপর জাতির ধনসম্পদ অপহরণ করা, যাহা এতদিন ধরে চলে আসছে, তাহাও বন্ধ ক'রতে হবে। সাধারণ ভাবেই বুঝা যায়, যেখানে এই লাভের পরিমাণ সকলের চেয়ে বেশী সেখানেই সংঘর্ষ সকলের চেয়ে বেশী হবে, তা' শ্রেণীতে শ্রেণীতেই হ'ক, বা জাতিতে জাতিতেই হ'ক।

"চীনে বা ভারতবর্ষে বা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে, শ্বেতজাতিদের যদি কোনও লাভ না থাকে, তা' হ'লে তাদের স্বাধীনতা দেবার কোনও আপত্তি থাকবে না। পৃথিবীর সমস্ত ধনসম্পদ সমস্ত মানবজাতির, সকলের সুখ ও উন্নতির জন্যই তাহা ব্যবহৃত হবে, এ কথাটি যদি আমরা মেনে না নিতে পারি, পরস্পরের সুবিধার জন্য যদি আমরা তাহার বিলিব্যবস্থা না করতে শিখি, তা'হলে ভবিষ্যতে জাতিতে জাতিতে এই যে সংঘর্ষ তাহা ক্রমে বাড়তেই থাকবে আর এই সংঘর্ষের কাছেই আমাদের আত্মসমর্পণ ক'রতে হবে।

"বিশ্বমৈত্রী যতদিন না এক অর্থনীতিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্চে ততদিন বিশ্বমৈত্রী অবাস্তব আদর্শই থেকে যাবে; অন্তর রাজ্যে এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যে মানবজাতির মিলনের আশাও স্বপ্নে পরিণত হবে।

"প্রত্যেক জাতি স্বরাজ লাভের অধিকারী এবং এই পৃথিবী সমস্ত মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি, এই দুটি মূল সত্য স্বীকার ক'রে নিলে, তার পরের কাজ হচ্চে, বড় বড় শক্তিসমূহকে ঘোষণা করতে হবে যে পরাধীন জাতিগুলিকে তাঁহারা পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন। কতদিন পর পর এবং কি ভাবে তাঁরা তাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন তাহাও এই ঘোষণাতে উল্লেখ ক'রতে হবে। আর এই সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে এক অর্থনীতিক সভাতে আহ্বান ক'রে, সকলে মিলে মানবজাতির সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি উৎপন্ন করার এবং প্রয়োজনমত সকলকে ভাগ ক'রে দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। এই দুই ব্যবস্থা যতদিন না হচ্চে ততদিন জাতিতে জাতিতে যে অবিশ্রাম সংঘর্ষ চলেছে তার একটুও হ্রাস হবে না।"

গভীরভাবে জগৎ-সমস্যা চিন্তা ক'রতে ক'রতে অধ্যাপক ওয়ার্ড যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন, আর একদিক দিয়ে ইয়োরোপের একজন চিন্তাশীল লোক সেই একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন। জগতের সকল চিন্তাশীল লোকের মুখে আজ একই কথা। কেন না, চিন্তাজগতে আজ একটী চিন্তাই প্রবল হয়ে উঠেছে—দয়ানন্দ-স্ত্রীষ্টের চিন্তা। বিলাতের "নাইনটিন্থ সেন্টুরি এণ্ড আফ্টার" পত্রিকায় (Nineteenth Century

& After) ক্যাপ্টেন লুস্‌বি (Captain Loseby) লিখছেন :—*

"ইয়োরোপের প্রধান সমস্যাগুলি এতই সুস্পষ্ট যে সেগুলির তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করি। সেগুলি হচ্চে সার্ব্বজনীন দারিদ্র্য,—ব্যবসা-ক্ষেত্রে কাহারও উপর কাহারও বিশ্বাস নাই, জাতিগুলি সর্ব্বদা পরস্পরের ভয়ে পরস্পরে ভীত,—ফলে অস্ত্রশস্ত্র ও ব্যয় বৃদ্ধি; বাণিজ্য নিয়ে জাতিগুলির ভিতর হিংসা—ফলে উচ্চ কর বসিয়ে পরস্পরের দেশের জিনিষের আমদানী বন্ধ করার চেষ্টা।"

এই সব অবস্থার হাত থেকে ইয়োরোপকে উদ্ধার করার জন্য মিঃ লুস্‌বি এক "স্কীম" চেয়েছেন। তিনি বলছেন : †

"আমাদের এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য একটী স্কীম চাই।"

কি রকম স্কীম ?

"যে স্কীম অনুসারে চল্‌লে পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি ক'রে মরার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আর, কোনও দেশের লোকদের না খেয়ে মরার ভয় দূর হয়। এমন একটি

* "The outstanding embarrassment of Europe at the present time are so obvious that I hesitate to ennmerate them. They are: universal poverty, lack of credit, mutual fear of nations exhibiting itself in still swollen armaments and consequent expenditure; commercial jealousy of nations exhibiting itself in tariff walls etc."

† "To solve our difficulties *we want a scheme*—any scheme which insures against death by violence or starvation of any of the parts, which guarantees scope for the genius, the inventive capacity and industry of all our peoples and the reduction of waste to a minimum."

স্কীম চাই যাহা প্রত্যেক জাতির জাতীয় প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ও সুবিধা দেবে, যাতে প্রত্যেক জাতির জাতীয় উদ্ভাবনী শক্তির এবং নির্ম্মাণকুশলতার উপযুক্ত ক্ষেত্র থাকবে, যাতে প্রত্যেক জাতির কর্ম্ম প্রচেষ্টা এমন ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত হবে যাতে কোনও দিকে শক্তির অপচয় না ঘটে।"

ঠিক এমনই একটী স্কীম জগৎকে দেওয়া হয়েছে বলেই ক্যাপ্টেন্ লুস্‌বি এমন স্কীম চাইতে পেরেছেন। দয়ানন্দ-স্কীম আজ মানুষের প্রাণের উপর অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে। জগৎ-সমস্যা নিয়ে আজ যে যেখানে চিন্তা ক'রতে বসছে, তারই প্রাণে এই স্কীমের ছবি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এই বিরাট স্কীমই মানুষের প্রাণে স্কীমের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে তুলছে। এই স্কীমের প্রেরণায় মানুষ স্কীমের অনুসন্ধান ক'রছে। ক্যাপ্টেন লুস্‌বি নিজেও একটী স্কীমের আভাষ দিয়েছেন। তিনি বলছেন :*

"এই সকল সমস্যার মূলে রয়েছে একটী মহাভ্রান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত—তাহা হচ্চে যে, জাতীয় স্বার্থগুলি মূলতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায়, এক দেশের আর্থিক অবস্থার

* "These (difficulties) have arisen out of a deep-rooted fallacy, *viz.*, that the interests of nations are essentially antagonistic. The prosperity or depression of the different European states react one on the other. Failure to recognise this truism might mean complete disaster. It has at last been appreciated by the vast majority of people that prosperity no less than depression reacts, that every individual is concerned with the well-being of the whole and that what applies to individuals applies to nations."

উন্নতিতে প্রত্যেক দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়, এক দেশের আর্থিক অবস্থা যদি মন্দ হয়, সকলকেই তার ফলভোগ ক'রতে হয়। এই সহজ সত্যকে স্বীকার ক'রে না নিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে। ইয়োরোপের অধিকাংশ লোকই পরিষ্কাররূপে বুঝতে পেরেছে যে, মানব-সমাজের অবনতির যেমন প্রতিক্রিয়া হয়, উন্নতিরও সেইরকম প্রতিক্রিয়া হয়—যে, সমষ্টির মঙ্গলের সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল জড়িত হয়ে রয়েছে—ব্যক্তিগতভাবেও যেমন জাতিগত ভাবেও ঠিক তেমনই।"

এই সব অবস্থার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ক্যাপ্টেন লুস্‌বি প্রস্তাব করেছেন সমস্ত রাষ্ট্রের মিলন (Federation)। যদিও ইয়োরোপকে লক্ষ্য ক'রেই তিনি এই প্রস্তাব করেছেন, তবুও যে সব যুক্তি দিয়ে তিনি ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলির মিলন সমর্থন করেছেন, সেই যুক্তিগুলি মেনে নিলে তাঁকে বিশ্বমিলনীতেই (World Federation) যেতে হবে। শুধু ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলির মিলনের কথা বললেও তাঁর আসল লক্ষ্য হচ্চে বিশ্বমিলন। তিনি বলছেন :*

* "The spirit of Locarno will have been carried to its logical conclusion when the common interest is recognised by the surrender and definite delegation of powers to a central body whose discretion is exercised by a council consisting of representatives of all but not dependent on the good will or good faith of any single individual or group; when the duty of suppressing violence and anarchy even against themselves is accepted by the whole and that the central body alone has the right to use armed force.

"There are certain matters in regard to which a

"লোকার্নো সন্ধি যে ভাবের পরিচায়ক, সেই ভাবকে পূর্ণরূপে মূর্ত্ত ক'রে তোলা হবে তখন যখন সকল জাতির স্বার্থ এক এই সত্য স্বীকার ক'রে নিয়ে সকলে মিলে একটী সার্ব্বজাতিক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলবে এবং প্রত্যেক রাষ্ট্র অবাধ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের দাবী ত্যাগ ক'রে, এই সঙ্ঘকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ক্ষমতা প্রদান করবে। এই সঙ্ঘের কার্য্য নির্ব্বাহ হবে একটী কাউন্সিলের দ্বারা। প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধি নিয়ে এই কাউন্সিল গঠিত হবে, কিন্তু জাতি-বিশেষের বা জাতি সমষ্টি বিশেষের অনুরাগ বিরাগের উপর এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব

---

satisfactory conclusion can only be reached by a central council, truly representative.

"The proposal contemplates a federation of nations loosely bound together for one main purpose, *viz.*, to reduce the huge burden of armaments and at the same time give added security.

"The ideal solution would be the complete surrender of the right and power to wage war by every potential war-maker to a Central Body representative of every part. Nothing short of this can bring about a real and final solution.

"We have already created a League of Nations, any weakening of whose influence would be universally deplored. A council of the same League with powers to enforce its decisions would be a Government of the Federation contemplated.

"It is sublime opportunity for statesmanship. The soil is well prepared. Imagination coupled with courage alone is needed. A call for common sacrifice and a common effort in response to a common danger would meet a surprising and almost universal response. If England led the way the result would be assured."

নির্ভর ক'রবে না। জাতিগুলির মধ্যে যে কেহ মারামারি কাটাকাটিতে প্রবৃত্ত হ'লে বা মানবসমাজে অরাজকতা ঘটে এমন কিছু ক'রতে উদ্যত হলে তখন তাদের প্রত্যেককে দমন ক'রবার অধিকার এই সার্ব্বজাতিক সঙ্ঘের আছে এবং একমাত্র এই সঙ্ঘই অস্ত্রবল ব্যবহার ক'রতে পারবে—ইহা স্বীকার ক'রে নিতে হবে।

"এমন সব আন্তর্জাতিক বিষয় রয়েছে, যে সব বিষয়ে, যদি প্রকৃতভাবে এই কাউন্সিল পৃথিবীর সমস্ত জাতির প্রতিনিধি হয়, তাহ'লে একমাত্র এই কাউন্সিলের দ্বারাই সেগুলির সুমীমাংসা হতে পারে।

"এই প্রস্তাবের লক্ষ্য হচ্চে, জাতিগুলিকে পরস্পর সংলগ্ন ক'রে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা। এই যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হবে অস্ত্রশস্ত্রের দুর্ব্বহ বোঝা কমিয়ে দেওয়া এবং প্রত্যেককে অভয় দেওয়া।

"জাতিগুলি অসংলগ্নভাবে থাকলে প্রত্যেকের দ্বারাই যুদ্ধ ঘটতে পারে। বর্ত্তমান সমস্যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মীমাংসা হবে, প্রত্যেক জাতির যুদ্ধ করার ক্ষমতা এবং অধিকার প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধি স্বরূপ এই সার্ব্বজাতিক সঙ্ঘের হাতে নিঃশেষে সমর্পণ করা। ইহা ছাড়া আর কোনও উপায়েই জগৎসমস্যার প্রকৃত এবং চরম মীমাংসা হতে পারে না।

"লীগ্ অব্ নেশনস্ গঠিত হয়েছে। এই লীগের শক্তিহ্রাস ক'রতে চাইলে সকলেই সে কার্য্যের নিন্দা ক'রবে। এই লীগের অধীনে একটী কাউন্সিল গঠন ক'রে, কাউন্সিল যাতে তাহার সিদ্ধান্তগুলিকে সকল জাতিকেই মানতে বাধ্য করতে পারে

এমন ক্ষমতা ইহাকে দিলে এই কাউন্সিলই জাতিসঙ্ঘের গভর্ণমেণ্টে পরিণত হবে।

"রাজনীতিজ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করার পরম সুযোগ উপস্থিত। ক্ষেত্র সুন্দররূপে প্রস্তুত হয়েছে। এখন একমাত্র প্রয়োজন গভীর দৃষ্টির ও সৎসাহসের। মানবজাতির সম্মুখে যে বিপদ উপস্থিত তাহার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য মানবজাতিকে ত্যাগ স্বীকার ক'রতে এবং সকলকে একযোগে কাজ ক'রতে আহ্বান ক'রলে প্রায় সমস্ত মানবজাতির কাছ থেকে আশ্চর্য্যরূপ সাড়া পাওয়া যাবে। ইংলণ্ড যদি এ বিষয়ে অগ্রণী হয় তা'হ'লে নিশ্চয়ই সুফল পাওয়া যাবে।"

মনস্বী এইচ্ জি, ওয়েলস্ (H. G. Wells) তাঁর অপূর্ব্ব গ্রন্থরাজির ভিতর দিয়ে দয়ানন্দ স্কীমের ভাবই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। ভবিষ্যতের আভাষ তিনি পেয়েছেন, কিন্তু তাহা বুদ্ধির দিক্ দিয়ে, বিচারের দিক্ দিয়ে, গভীর চিন্তার ফলে। হাজার হাজার বৎসরের মনুষ্যজাতির ইতিহাসের ধারাকে অনুসরণ ক'রে তিনি (United States of the World) বিশ্বমিলিতরাজ্যে এসে পৌঁছেচেন। এই স্কীমের আলো তাঁর মনশ্চক্ষুর উপর পড়েছে। তিনি তাঁর মানবজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে (Outline of History) এই বিশ্বমিলিতরাজ্য কি আকার নেবে তার আভাষ দিয়েছেন।

আদিম কাল থেকে মানবজাতির ইতিহাসের ধারা অনুসরণ ক'রে জগতের বর্ত্তমান পরিণতি পর্য্যন্ত এসে ওয়েলস্ ব'লছেন :*

---

* "The next stage in history is the possible unification of the world into one community of knowledge and will

"মানবজাতির ইতিহাসে ইহার পরের পরিণতি সম্ভবতঃ যে আকার গ্রহণ ক'রবে তাহা হচ্চে মানবজাতিকে মিলিত ক'রে এমন একটি সমাজে পরিণত করা—যাতে সকলে একই লক্ষ্য ধ'রে চলবে এবং সকল প্রচেষ্টার গতি হবে একই দিকে। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে মানবজাতির ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে আমরা আমাদের বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এসেছি, কিন্তু যেখানে ইহার চরম পরিণতি সেখানে আমরা এখনও পৌঁছিতে পারি নাই। বহুলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে জীবন ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে, পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মানবজাতি যে দুঃসাহসিক যাত্রা আরম্ভ করেছিল তাহা আজকার দিনের মহাসমস্যায় পরিণত

. . . . We have brought this outline of History to our own times but we brought it to no conclusion. The story of life which began millions of years ago, the adventure of mankind already afoot half a million years ago, rises to a crisis in the immense interrogation of to-day. Our history has traced a steady growth of the social and political units into which men have combined. These units have grown from the small family tribe to the vast united realms—vast, yet too small and partial of the present time. The telegraph and telephone, the aeroplane, the continued progress of land and sea transit, are now insisting upon a still larger political organisation. We are engaged upon an immense task of adjustment to these great lines upon which our affairs are moving. Our wars, our social conflicts, our enormous economic stresses, are all aspects of that adjustment.

"Our true state, this state that is already beginning, this state to which every man owes his utmost political effort, must be now this nascent Federal World State, to which human necessities point. Our true God is now

হয়েছে—আজ এই প্রশ্নই বার বার উঠ্‌ছে, "ততঃ কিম্? ততঃ কিম্?" সমাজ এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে, পরস্পরের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে মিলিত হতে হতে মানুষ কোন্ একত্বে এসে পৌঁছেচে তাহা আমাদের ইতিহাস দেখিয়েছে। আদিম কালের ক্ষুদ্র গোষ্ঠী হতে এই সব সঙ্ঘগুলি বর্ত্তমান কালের বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এই সব রাষ্ট্রগুলি বৃহৎ হলেও সমগ্র পৃথিবীর তুলনায় অতি ক্ষুদ্র এবং আংশিক মাত্র। টেলিগ্রাফ্, টেলিফোন্, এরোপ্লেন্, যানবাহনাদির ধারাবাহিক উন্নতি, জলে স্থলে যাতায়াতের অশেষ সুবিধা—এই সব আজ এক বৃহত্তম রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়রূপে মানুষকে বুঝিয়ে দিচ্চে। এই বিশাল ধারাগুলি অবলম্বন ক'রে মানবজাতির জীবন প্রবাহ চলেছে, আর ইহার সঙ্গে মিল

---

the God of all men. Nationalism as a god must follow the tribal gods to limbo. Our true nationality is mankind.

"How far will they (modern men) remain dark, obdurate, habitual and traditional resisting the convergent forces that offer them either unity or misery? Sooner or later that unity must come or else, plainly, men must perish by their own inventions.

"We find ourselves compelled to reject the latter possibility. (But) the way to the former may be very long and tedious or it may be travelled over swiftly in the course of a generation or so. That depends upon Forces, whose nature we understand to some extent now, but not their power.

But out of the trouble and tragedy of this present time there may emerge a moral and intellectual revival to draw together men of alien races into one common and sustained way of living for the world's service. We cannot foretell the scope and power of such a revival. We cannot even produce evidence of its onset."

রাখবার জন্যই মানবজাতির এক বিপুল চেষ্টা চলেছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, সামাজিক সংঘর্ষ, অর্থনীতিক নিষ্পেশন—এই সবের ভিতর দিয়েই সেই মিল রক্ষা হচ্চে।

"মানবজাতির সত্যকার রাষ্ট্র, যাহা সবে মাত্র আরম্ভ হয়েছে, এবং যাহা গ'ড়ে তোলবার জন্য প্রত্যেক মানুষের প্রাণপণ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য—সেই রাষ্ট্র হবে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে এক মিলিতরাষ্ট্র। মানবজাতির আজ প্রয়োজন হয়েছে এই মিলিত-মহারাষ্ট্রের। আজ সমস্ত মানবজাতির বিধাতা পুরুষই আমাদের উপাস্য দেবতা। কালক্রমে, আদিম কালের উপজাতি-গুলির দেবতারা আজ যেমন বিস্মৃতির গর্ভে লুক্কায়িত হয়ে গিয়েছে জাতীয়তারূপ দেবতাকেও সেইরূপ লুক্কায়িত হয়ে যেতে হবে। আজ আমাদের প্রকৃত জাতীয়তা মানবজাতীয়তা।

"আর কতদিন বর্ত্তমান যুগের মানুষ এমন ক'রে অন্ধকারে পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াবে? মানুষ কতকাল এমন একগুঁয়ে, অভ্যাসের বশীভূত হয়ে, গতানুগতিক ভাবে চলবে? যে শক্তি-সমূহের বশে মানবজাতি চালিত হচ্চে, সেই শক্তিসমূহের গতি এই বিশ্বরাষ্ট্রের অভিমুখে। আজ মানবজাতি হয় স্বেচ্ছায় এই শক্তিসমূহের বশে চ'লে একতাবদ্ধ হবে, না হয় দুঃখ ভোগ ক'রবে। আর কতদিন মানুষ এই শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে চলবার চেষ্টা করবে? দুদিন আগে কিংবা পরে মানবজাতির এই মিলন সাধন করতেই হবে, না হলে, পরিষ্কার দেখা যাচ্চে মানবজাতি নিজের আবিষ্কৃত অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারাই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

"এই শেষোক্ত সম্ভাবনা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। কিন্তু মিলনের পথে যাত্রাও দীর্ঘদিনব্যাপী হতে পারে।

অথবা দ্রুতগতিতে,—একপুরুষ বা তার কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই এই পথ মানুষ অতিক্রম করে যেতে পারে। কিন্তু তাহা নির্ভর করছে এমন শক্তিসমূহের উপর, যে সবের প্রকৃতি এখন আমরা কিছু কিছু বুঝলেও সে সবের প্রকৃত বল কতখানি তাহা আমরা জানি না।

"কিংবা বর্ত্তমান সময়ের দুঃখ কষ্ট এবং বিষাদময় অবস্থার ভিতর থেকেই এমন এক নৈতিক, মানসিক এবং ধর্ম্মের পুনর্জাগরণ ঘটতে পারে যাহা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগুলিকে এক ক'রে দিয়ে, মানবজাতির সেবাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ক'রে চ'লতে সকলকে অনুপ্রাণিত ক'রতে পারে। এই পুনর্জাগরণের শক্তি কতখানি হবে, বা ইহা কোন্ দিকে কি ভাবে প্রকাশ পাবে সে সম্বন্ধে আমরা কোনও ভবিষ্যদ্বাণী ক'রতে অক্ষম। এই পুনরভ্যুত্থান আরম্ভ হওয়ার কোন লক্ষণও আমরা দেখাতে পারবো না।"

১৯২১ সালে ওয়েলস্ প্রমাণ দিতে পারেন নাই, কিন্তু আজ ১৯২৯ সালে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখা যাচ্চে। ওয়েলস্ তারপর বলছেন :—*

---

* "The beginnings of such things are never conspicuous. Great movements of the racial soul come at first "like a thief in the night" and then suddenly are discovered to be powerful and worldwide. *Religious emotion, stripped of corruptions and freed from its last priestly entanglements—may presently blow through life again like a great wind, bursting the doors and flinging open the shutters of individual life, and making many things possible* and easy that in these present days of exhaustion seem' almost too difficult to desire."

"এই সব পরিবর্ত্তনের প্রথম আরম্ভ বড় দৃষ্টিগোচর হয় না। মানবজাতির প্রাণের ধারার পরিবর্ত্তন যখন ঘটে, তখন প্রথমে তাহা থাকে অগোচর। তার পর হঠাৎ একদিন তাহা যখন দেখা যায় তখন তাহা অতি বেগবান্, সমগ্র জগদ্ব্যাপী। প্রবল ঝড় যেমন হঠাৎ উঠে মুহূর্ত্তের মধ্যে বদ্ধ দরজা জানালা জোর ক'রে মুক্ত ক'রে দিয়ে অভাবনীয় কাণ্ড ঘটায়, সেইরূপ অনাবিল এবং সকল প্রকার সংস্কারবিমুক্ত ধর্ম্মভাব মানুষের প্রাণে যে কোনও মুহূর্ত্তে জাগ্রত হয়ে উঠতে পারে এবং ব্যক্তিগত জীবনের বদ্ধ দুয়ার জানালা উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে বহু অসম্ভবকে সম্ভব ও সহজ করে দিতে পারে—আজকার (১৯২১ সালের) এই অবসাদের দিনে এত বড় পরিবর্ত্তন আকাঙ্ক্ষা করাও একরূপ অসম্ভব বলে মনে হয়।"

ওয়েল্‌স্ কথাগুলি বলেছেন, একটু ভয়ে ভয়ে। কেন না, তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তি সুদৃঢ় নয়। ধর্ম্মের ভিত্তির উপর তাঁর বিশ্বাস দাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু তাঁর লেখনী দিয়ে সত্যই প্রকাশ হয়েছে। এত বড় পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে তিনি একটু ইতস্ততঃ করলেও এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রাণে জেগেছে। আর এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রাণে জেগেছে, জগতে এই পরিবর্ত্তন ঘটেছে বলে। বদ্ধ স্থানে জলধারা ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হয়; তার পর একদিন বাঁধ ভেঙ্গে সেই জলপ্রবাহ ছুটে বাহির হয়, তার সামনে তখন কোনও বাধা বিঘ্নই দাঁড়ায় না। স্রোতের মুখে সব ভেসে যায়। দয়ানন্দের মহাভাব জগতে সঞ্চারিত হয়েছে। মানবজাতির প্রাণে এই ভাব সঞ্চিত হচ্চে। সময় সন্নিকট যখন এই মহাভাবপ্রবাহ মানব-প্রাণের সমস্ত বাঁধ ভেঙ্গে ছুটে

বাহির হবে। মানবজাতির মহামিলনের পথে যে সব প্রতিবন্ধক দুরতিক্রম্য ব'লে আজ মনে হচ্চে, মানব-প্রাণের ভাব যেদিন ছুটবে সেদিন সে স্রোতের মুখে সে সমস্ত বাধাবিঘ্ন কোথায় ভেসে যাবে।

ওয়েল্‌স্‌ তারপর বলছেন, বর্ত্তমান লীগ্‌ অব্‌ নেশন্‌সের দ্বারা জগতের কোনও কাজ হবে না। এই বিশ্বরাষ্ট্র (World State) মানবজাতিকে গ'ড়ে তুলতেই হবে। এই বিশ্বরাষ্ট্র কিরূপ হবে ওয়েল্‌স্‌ সে সম্বন্ধেও কতকগুলি মূলসূত্র ("Broad fundamentals") দিয়েছেন : *

"(১) এই বিশ্বরাষ্ট্র এক ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

"(1) It will be based upon a common world religion, very much simplified and universalized and better understood. This will not be Christianity nor Islam nor Buddhism nor any such specialised form of religion, but religion itself, pure and undefiled; the Eightfold Way, the kingdom of Heaven, brotherhood, creative service and self-forgetfulness etc.,

(2) And this world state will be sustained by universal education etc.

(3) There will be no armies, no navies and no classes of unemployed people, wealthy or poor.

(4) The world's political organisation will be democratic, that is to say, the government and direction of affairs will be in immediate touch with and responsive to the general thought of the educated whole population.

(5) Its Economic organisation will be an exploitation of all natural wealth and every fresh possibility science reveals by the agents and servants of the common government for the common good. Private enterprise will be the servant—a useful, valued and well-rewarded servant—and no longer the robber-master of the commonweal.

হবে। সে ধর্ম্মে আচার অনুষ্ঠানের আড়ম্বর থাকবে না—সে ধর্ম্ম হবে সহজ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা সকলেই ধারণা ক'রতে পারবে এবং সর্ব্বসাধারণে পালন ক'রতে পারবে। ইহা খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম বা মুসলমান ধর্ম্ম বা বৌদ্ধধর্ম্ম বা অন্য কোনও প্রকার বিশিষ্ট ধর্ম্ম নয়। সে ধর্ম্ম খাঁটি, অনাবিল ধর্ম্ম—সাধুজনপ্রদর্শিত উন্নত জীবন লাভের অষ্টমার্গ :—স্বর্গরাজ্যের সাধনা—মহাভ্রাতৃত্ব সাধন—জীবসেবা, যাহা দ্বারা প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়—সে ধর্ম্ম আত্মবিস্মৃতি।

(২) এই বিশ্বরাষ্ট্র দাঁড়াবে সার্ব্বজনীন শিক্ষার ভিত্তির উপর।

(৩) এই বিশ্বরাষ্ট্রে কোন সৈন্যবিভাগ থাকবে না, নৌবহর থাকবে না—বেকার শ্রমজীবীর দল থাকবে না, ধনী বা নির্ধন সম্প্রদায় থাকবে না।

(৪) পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হবে, অর্থাৎ রাষ্ট্র-পরিচালন কার্য্য এবং মানবীয় সমস্ত ব্যাপার চালিত হবে সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষিত ক'রে—তাদের চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে,—তাদের ইচ্ছার আনুগত্য ক'রে।

(৫) ইহার অর্থনীতিক বিধিব্যবস্থা এমন হবে যাতে প্রকৃতি মানুষকে যে সমস্ত ধনসম্পদ দিয়েছেন আর বিজ্ঞানের যে সব নূতন নূতন রহস্য নিত্য উদ্ঘাটিত হচ্চে সে সব সমস্ত মানব-জাতির সুখ সুবিধার জন্য কাজে লাগানো যায়। রাষ্ট্রের কর্ম্ম-চারীরা সর্ব্বদা এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকবেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা

---

(6) Political well-being demands that electoral methods shall be used, and economic well-being requires that a currency shall be used."

থাকবে কিন্তু তাহা রাষ্ট্রের অধিবাসীদের বিত্তাপহারক হবে না। তাহা থাকবে সর্ব্বসাধারণের দাস হয়ে। সমাজ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মূল্য স্বীকার করবে এবং ব্যক্তিকে ইহার জন্য উপযুক্ত পুরস্কার দিতে কুণ্ঠিত হবে না।

(৬) রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য নির্ব্বাচন প্রথা থাকবে। এবং আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে।"

অধ্যাপক বারট্রাণ্ড রাসেল তাঁহার "প্রস্‌পেক্ট্‌স্‌ অব্‌ ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল সিভিলিজেশন". (Prospects of Industrial Civilisation) গ্রন্থে ব'লছেন :— *

"যুদ্ধ নিবারণের চরম উপায় হচ্ছে শক্তিশালী এক বিশ্বরাষ্ট্র গঠন। এই বিশ্বরাষ্ট্র আইনের বিধান অনুযায়ী জাতিগুলির পরস্পরের মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে দেবে। এই বিশ্বরাষ্ট্র তখনই সম্ভব যখন পৃথিবীর সব দেশগুলি পরস্পরের সঙ্গে এমন ভাবে মিলিত হয়েছে যে এক দেশের ভালমন্দ ঘটলে অন্য দেশগুলি তাতে উদাসীন না থাকতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে সেই অবস্থায় পৃথিবী এসে উপনীত হয়েছে।"

তার পর অধ্যাপক রাসেল ব'লছেন, পৃথিবীকে মানবজাতির

---

* "The only ultimate cure for war is the creation of a world-state or super-state, strong enough to decide by law all disputes between nations. And a world-state is only conceivable after the different parts of the world have become so intimately related that no part can be indifferent to what happens in any other part. This stage has now been reached."

সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত ক'রতে হবে এবং তাহাই হবে এই বিশ্বরাষ্ট্রের ভিত্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ব'লছেন :— *

"জর্জ্জিয়াদেশে তেলের খনি আছে। তাই নিয়ে ব্রিটীশ এবং ফরাসীর সঙ্গে রাশিয়ার বিবাদ উপস্থিত হয়েছিল। এই তেল জর্জ্জিয়ার দেশগত সম্পত্তি হ'লে তাহা প্রকৃত সাম্যনীতি-বিরুদ্ধ হবে। কিন্তু ইহা যে সোভিয়েট্ রাশিয়ারই হবে তারও কোনও ন্যায্য কারণ নাই। ইহা হওয়া উচিত সমস্ত মানব-জাতির এক সমবায়ের। এই সমবায় প্রত্যেক দেশের প্রয়োজন মত এবং এ তেল সকলের কাজে লাগবে কিনা বিচার ক'রে সকল দেশকে ভাগ ক'রে দেবে।"

অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়ে জগতের চিন্তাধারার কতখানি পরিবর্ত্তন হয়েছে, এবং সে চিন্তা যে দয়ানন্দ-স্কীমকেই কার্য্যে পরিণত করতে চাইছে তাহা আমরা দেখলাম। মনস্বী ওয়েল্‌স্ এবং আচার্য্য রাসেল যাহা বলেছেন আজ জগতের চিন্তাশীল লোকদের ভিতর শত শত লোক এই ধারাতে চিন্তা করছেন, এই কথা বলছেন। চিন্তা বাক্যে এসেছে। আর এই চিন্তা ও বাক্য সমস্ত মানবজাতির শত কর্ম্মপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। মানবজাতির প্রাণে আজ ভাব জাগ্রত

* "Georgia contains oil; therefore the Russians conflicted with the British and the French for possession of the oil. It is contrary to all sound socialist doctrine that the oil should be the private property of Georgia, but there is no better reason why it should belong to Soviet Russia. It ought to belong to a world-wide combination which would ration it to the various countries, according to their needs and their economic suitability for using it."

হয়েছে, প্রেম ফুটে উঠ্‌ছে, মহামিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছে। আর এক দিক দিয়ে, আর এক ভাবে দয়ানন্দ-স্কীমের বিরাট চিন্তার কাজ চলছে, তাহা হচ্চে মানসিক উৎকর্ষের (culture) ক্ষেত্রে। দয়ানন্দ-স্কীমকে আর এক ভাবে মূর্ত্তি দিয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশ্বভারতীতে। এখানে বিভিন্ন কাল্‌চারের ধারাগুলির অনুসন্ধান চলছে এবং সকল কাল্‌চারের ভিতর ঐক্যসাধন চেষ্টা চলছে। বিশ্বভারতী মানবজাতির মিলনকে পূর্ণ এবং নিবিড় ক'রে তুলবার চেষ্টা ক'রছে। লীগ্ অব্ নেশন্স্ তাহার কার্য্যের সহায়তার জন্য প্রত্যেক দেশের জ্ঞানী ও শিক্ষিত লোকদের মধ্য হতে কয়েকজন ক'রে বেছে নিয়ে এক সভা বসিয়েছে।

জগতের বিজ্ঞানবিদ্‌রা, চিকিৎসকরা, দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকরা, সংবাদপত্রসেবীরাও বিশ্বসভাতে মিলিত হয়ে পরস্পর জ্ঞানের ও ভাবের আদানপ্রদান করছেন। এই মিলনের ভাব দিন দিন গভীর হতে গভীরতর হচ্চে, বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্চে, চিন্তা প্রখর হচ্চে, কর্ম্মশক্তি জাগ্রত হচ্চে। দয়ানন্দ-স্কীম লোকচক্ষুর অগোচরে থেকেও সমস্ত মানবজাতির চিন্তাধারাকে পরিবর্ত্তন ক'রে দিয়েছে, জগতের কর্ম্মধারাতে এক মহাপরিবর্ত্তন এনেছে। দয়ানন্দ-স্কীম আজ পুরাতন জগৎকে ভেঙ্গে নূতন ক'রে গড়ে তুলছে। জ্ঞানে হ'ক, অজ্ঞানে হ'ক, ইচ্ছায় হ'ক, অনিচ্ছায় হ'ক, সমস্ত জগৎ আজ এই অতিমানবের বিরাট চিন্তার বশে চলেছে, এই চিন্তাকে মানবজীবনে সফল ক'রে তুলে ধরাতলে স্বর্গরাজ্যস্থাপনের দিকেই চলেছে।

অষ্টম অধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা

মুক্তিই নবযুগের মুলমন্ত্র

জগতে আজ নবযুগ, সত্যযুগ এসেছে। মানবজাতির জীবন ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। বিশ্বের সমস্ত নরনারীর চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে সত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট দেখা যাচ্চে। মানুষের প্রাণের দেবতা আজ জাগ্রত হয়েছেন। জগতে মহাশক্তির আবির্ভাব হয়েছে। যারা সুপ্ত ছিল তারা জাগ্রত হয়েছে, যারা মূক ছিল তারা বাচাল হয়েছে, যারা পঙ্গু ছিল তারা পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

মানবজাতির প্রাণমনের উপর এক মহা পরিবর্ত্তন এসেছে। মানুষের প্রাণে নূতন ভাব, নূতন আশা, নূতন আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। মানুষ আজ সকল প্রকার বন্ধনের বেদনা নিবিড়ভাবে উপলব্ধি ক'রছে। মানুষের প্রাণ আজ সকল বন্ধন ছিন্ন ক'রে অখণ্ড মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। মানুষ আজ আর আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান ক'রতে চায় না। মানুষ আজ আপনাকে সত্যরূপে, সুন্দররূপে, বৃহত্তমরূপে পেতে চায়। মানুষ আজ আপনাকে সকল বন্ধন হতে মুক্ত ক'রে পরিপূর্ণরূপে পেতে চায়।

বিশ্বের সমস্ত নরনারীর ভিতর দিয়ে এক বিপুল ভাবের স্রোত বয়ে যাচ্চে। এই ভাবের তরঙ্গে মানুষের প্রাণ চঞ্চল হয়ে

উঠেছে। মানুষ আর পুরাতন প্রথাকে অনিবার্য্য ব'লে মেনে নিতে পারছে না। মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব, নারীর উপর পুরুষের প্রভুত্ব, এক শ্রেণীর উপর আর এক শ্রেণীর প্রভুত্ব,—তামসযুগের এই বর্ব্বর প্রথা আজ মানুষের কাছে অতি অশোভন, অতি হেয়, নিতান্ত অসহনীয় মনে হচ্চে। জগতে কেহ আর পরাধীন থাকতে চাইছে না; কেহ কাহাকেও পরাধীন রাখতেও পারছে না,—পরাধীন রাখার ইচ্ছাও ক্রমে দূর হয়ে যাচ্চে। নব-জাগ্রত মানুষের মন থেকে দাস-মনোভাব মুছে যাচ্চে। বিশ্বের যে সব নরনারী তাদের জন্মগত অধিকার হতে বঞ্চিত, তারা প্রত্যেকে সমান স্বাধীনতা, সমান অধিকার দাবী ক'রছে। মুক্তিই এই নবযুগের মূলমন্ত্র।

জগতে আজ বহু সমস্যা। স্বাধীনতা-পরাধীনতা-সমস্যা আজ জগতের এক প্রধান সমস্যা। ইয়োরোপের বলদৃপ্ত জাতিরা নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনের জন্য এশিয়ার ও আফ্রিকার দুর্ব্বল জাতিগুলিকে অধীন ক'রে রেখেছে। তা' হ'তে জগতে অশেষ অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এতদিন পরাধীন দুর্ব্বল জাতিগুলি প্রবল বিজেতা জাতিদের দাসত্ব নিরুপায় হ'য়ে সহ্য করে এসেছিল। আজ যুগপ্রভাবে বিজিত জাতিগুলির ভিতর আত্মসম্মান-জ্ঞান জেগে উঠেছে। তাদের প্রাণে স্বাধীনতাস্পৃহা প্রবল হ'য়ে উঠেছে। তারা বিজেতাদের সমকক্ষ হ'তে চাইছে, বিজেতাদের মত সমান স্বাধীনতার, সমান অধিকারের দাবী করছে। এক জাতিকে আর একজাতির অধীন ক'রে রাখার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতির জন্মগত অধিকার, কেহ কাহাকেও এই অধিকার হ'তে বঞ্চিত ক'রতে পারে না। মানুষের

আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং দৈহিক বিকাশের জন্য স্বাধীনতা একান্ত আবশ্যক। কোনও জাতি কোনও জাতিকে অধীন ক'রে রাখতে চাইলে ন্যায়ের বিধান লঙ্ঘন করা হয়, ধর্ম্মের অবমাননা হয়। কিন্তু ন্যায়ের চেয়ে, ধর্ম্মের চেয়ে বিজেতা জাতিগুলি তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থকেই বড় ক'রে দেখছে। তারা অন্যজাতিকে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনের জন্য অধীন ক'রে রাখ্‌লেও সে কথা জগতের সভ্য সমাজে প্রকাশ ক'রতে চাইছে না। অন্তরের হীনতাকে পরোপকারস্পৃহারূপ মিথ্যার পোষাক পরিয়ে তারা সাধুতার ভান ক'রছে। তারা বিজিত জাতিদের ব'লছে, "তোমরা এখনও স্বাধীনতার উপযুক্ত হও নাই, তোমাদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার জন্যই আমরা তোমাদের দেশে রাজত্ব করছি, যখন তোমরা সম্পূর্ণরূপে যোগ্যতা লাভ ক'রবে তখন তোমাদের স্বাধীন ক'রে দিব।" যুগপ্রভাবে গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে সকল বিজেতা-জাতিকেই এই মহাসত্য স্বীকার ক'রতে হয়েছে যে প্রত্যেক জাতির নিজের শাসনযন্ত্র নিজে নিয়ন্ত্রিত করবার অধিকার (right of self-determination) আছে। কিন্তু তখন প্রতিকূল অবস্থায় বাধ্য হয়ে এই সত্য স্বীকার ক'রলেও, আজ তারা কার্য্যতঃ স্বীকার করতে নারাজ। যুদ্ধের সময় বড় বড় রাজনীতিকরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে জগতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই তাঁদের লক্ষ্য (a world safe for democracy)। কিন্তু আজও তাঁরা পৃথিবীকে পরাধীনতার নাগপাশ হ'তে মুক্ত করেন নাই। আজও অর্দ্ধ পৃথিবী জুড়ে বিজিত-বিজেতার মহা সংঘর্ষ চলেছে।

পরাধীনতা মানুষের পক্ষে অতি অস্বাভাবিক অবস্থা। যে

মানুষের নিজের কোনও শক্তি নাই, যাকে পরের আদেশ পালন ক'রে পরের ইচ্ছার অধীন হয়ে চলতে হয়, তার হৃদয় মনের বিকাশ হতে পারে না। প্রতিনিয়তই যার ইচ্ছা প্রতিহত হয়, তার ভিতর সদিচ্ছা, বড় আকাঙ্ক্ষা, বড় ভাব জাগ্রত হয় না। তার মন চিন্তাজগতের নিম্নস্তরেই প'ড়ে থাকে। তার প্রাণ সঙ্কুচিত হয়ে যায়, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। ব্যক্তির পক্ষে যেমন জাতির পক্ষেও তেমনি। যে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নাই, অপর জাতির ইচ্ছা অনুসারে যাকে গ'ড়ে উঠতে হয়, নিজের ভাবকে ক্ষুণ্ণ ক'রে অপরের ভাবকে প্রাধান্য দিতে হয়, অপরের ভাবের বশে চ'লতে হয় সে জাতির প্রাণের পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। সে জাতির প্রাণ-ধারা বদ্ধ হয়ে যায়, তার কর্ম্মশক্তি পঙ্গু হয়ে যায়। ক্রমে, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল প্রকার দুর্গতি তার ঘটে।

জগতে যদি একটী জাতিও এরূপ অধঃপতিত হয়, তাতে সমস্ত বিশ্বের অকল্যাণ হয়। সে জাতির পঙ্গুতা ও অক্ষমতা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে দূষিত ক'রে তোলে। তার অন্তরের সদ্‌গুণগুলির বিকাশ না হওয়ায় জগৎ তার বিশিষ্ট দান হ'তে বঞ্চিত হয়। বিজেতা জাতিগুলিও ধনসম্পদে, ঐশ্বর্য্যপ্রভুত্বে বড় হলেও, অন্যজাতির উপর অন্যায় অত্যাচার ক'রে, অন্তরের মলিনতায়, হৃদয়ের দৈন্যে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। ফলে, বিজিত ও বিজেতা উভয় জাতিরই দুর্দ্দশা হয়, কারও কম কারও বেশী। তাই প্রত্যেক জাতির ও সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। জলবায়ু রৌদ্র যেমন মানুষের জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন, স্বাধীনতাও

তেমনি তার একান্ত প্রয়োজন। জল বায়ু রৌদ্র যেমন মানুষের ভগবদ্দত্ত দান, স্বাধীনতাও তেমনি মানুষের ভগবদ্দত্ত দান। জল বায়ু রৌদ্র হ'তে যেমন একজন অপরকে বঞ্চিত করতে পারে না, স্বাধীনতা হ'তেও তেমনি একজন আর একজনকে বঞ্চিত ক'রতে পারে না। ইহাই ন্যায় ও ধর্ম্মের বিধান।

জগতে এতদিন এক দানবী শক্তি রাজত্ব করছিল। আজ মহাশক্তির আবির্ভাবে এই দানবী শক্তি সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্চে। দেবতারা যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। বলদৃপ্ত যে সকল জাতি অন্যান্য জাতিদের অধীন করে রেখেছিল, তাদের বজ্রমুষ্টি ক্রমেই শিথিল হ'য়ে যাচ্চে। মহাশক্তির প্রেরণায় আজ পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন জাতিই একসঙ্গে পরাধীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছে। ইজিপ্টে, মিশরে, তুর্কীতে, আরবে, পারস্যে, আফগানিস্থানে, ভারতে, চীনে, ইণ্ডোনেশিয়ায়, কোরিয়ায়, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে সর্ব্বত্রই আমরা একই মহাশক্তির খেলা দেখতে পাচ্ছি।

জগতে এত বড় পরিবর্ত্তন আর কখনও হয় নাই। আজ কোন্ এক মন্ত্রশক্তি-বলে সমস্ত পরাধীন জাতিগুলি সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে, মৃত্যুকেও তুচ্ছ ক'রে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে, মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক দেশ ভিন্ন, প্রত্যেকের ভাব ও ভাষা ভিন্ন, প্রত্যেকের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার ভিন্ন; লৌকিকভাবে কারও সঙ্গে কারও ঘনিষ্ঠ যোগ নাই। কিন্তু তবুও একই সময়ে তারা জাগ্রত হয়ে উঠেছে, একই ভাবে তারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। তাদের চিন্তা ও কার্য্যকলাপের ভিতর একই ইচ্ছা পরিস্ফুট হয়ে দেখা দিচ্ছে। একই সঙ্গে, এক কণ্ঠে তারা স্বাধীনতা চাইছে। যেন সকলে পরামর্শ ক'রে, সকলে সঙ্ঘবদ্ধ

হয়ে পরাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। যেন কোনও বাজিকর অলক্ষিতে কোটী কোটী মানুষকে একসূত্রে গ্রথিত ক'রে নিজের ইচ্ছামত সকলকে নাচাচ্ছে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন

ভারতেও মহাশক্তির আবির্ভাব হয়েছে। ভারতের বত্রিশ কোটী নরনারীর প্রাণেও স্বাধীনতালাভের প্রবল ইচ্ছা জেগেছে। আজ ৪৫ বৎসর ধরে ভারতে স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলন চলেছে। প্রথমে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লক্ষ্য হ'লেও ভারতের নেতাদের দৃষ্টি ছিল তৎকালীন শাসনপদ্ধতির সংস্কারে। তাঁরা কংগ্রেস করতেন, শাসনপদ্ধতির সংস্কারের জন্য রেজল্যুশান্ পাশ করতেন ও গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঠাতেন। বহুবৎসর ধ'রে আন্দোলনের ফলে গভর্ণমেণ্ট কখনও কখনও কিছু কিছু সংস্কার করতেন। তখন ভারতের নেতারা আইনসঙ্গত আন্দোলনকেই (Constitutional agitation) স্বাধীনতালাভের একমাত্র উপায় ব'লে মনে করতেন। কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা স্বাধীনতালাভ হয় না। ইংরাজের কাছে ভিক্ষা ক'রে ভারত স্বাধীনতা পায় নাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রুশ-জাপান-যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করায় এশিয়ার ঘুম ভাঙ্গলো; এশিয়ার সমস্ত পরাধীন জাতির মধ্যে ইউরোপের অধীনতা হ'তে মুক্তিলাভের জন্য প্রবল ইচ্ছা জেগে উঠলো। ভারতের প্রাণেও সে তরঙ্গের ঢেউ এসে লাগলো। বঙ্গব্যবচ্ছেদকে উপলক্ষ্য করে ভারতে এক নবজাগরণ আরম্ভ হল। মুষ্টিমেয় যুবক বোমার সাহায্যে, গুপ্তহত্যার দ্বারা, ভয়প্রদর্শনের (terrorism) দ্বারা স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করলো। কিন্তু এ চেষ্টা

সম্পূর্ণ নিষ্ফল হলো। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বিশাল সুসংবদ্ধ শক্তির কাছে এই ক্ষুদ্র, অসংবদ্ধ শক্তি অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। প্রবল রাজশক্তি মুহূর্ত্তে এসব দমন করে ফেলতে পারে। এসব ক'রে রাজশক্তিকে একটুখানি ব্যতিব্যস্ত করা যায় বটে, কিন্তু তাকে দমান যায় না। তাই এই ভয়প্রদর্শনের দ্বারাও ভারতের স্বাধীনতালাভ হলো না। স্বাধীনতালাভের এই পন্থায় মুষ্টিমেয় যুবকেরাই বিশ্বাস করতেন। ভারতের জনসাধারণ ও নেতারা এ পন্থায় আস্থা স্থাপন করেন নাই। নেতারা বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন ক'রে ইংরাজ জাতিকে জব্দ করার চেষ্টা করলেন। নানা স্থানে কাপড়ের কল স্থাপিত হলো; বিলাতী কাপড় বর্জ্জন করার প্রবল উদ্যম চলতে লাগলো। ভারত কিছু পরিমাণে কৃতকার্য্যও হলো। কিন্তু ইহার দ্বারাও তার স্বাধীনতালাভ হলো না। তারপর, ভারত "অহিংস অসহযোগ"কে (non-violent non-cooperation) স্বাধীনতালাভের উপায় বলে বরণ করলো। ভারত ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কিছুমাত্র সহযোগিতা করবে না। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কাউন্সিলে ভারত প্রতিনিধি পাঠাবে না। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বিচারালয়ে উকিল মোক্তাররা কাজ করবেন না। আর ভারতের বালকবালিকা যুবক যুবতীরা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়বে না। এই অহিংস অসহযোগের সঙ্গে থাকলো বৃটিশবস্ত্রবর্জ্জন ও খদ্দর প্রচার। এই আন্দোলন সমস্ত ভারতকে নাড়া দিল। ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে স্বাধীনতার চিন্তা করতে শিখ্‌লো। কিন্তু এ পন্থাও কার্য্যকরী হলো না। অসহযোগ আন্দোলনের বেগ ক্রমে মন্দীভূত হলো; স্বাধীনতা

লাভের এ চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। নেতাদের ইচ্ছা ছিল অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশের সমস্ত লোক যখন প্রস্তুত হবে, তখন দেশব্যাপী শান্তভাবে আইন অমান্য দ্বারা (mass civil disobedience) বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে অচল করবেন। কিন্তু অসহযোগ "অহিংস" না হওয়ায় এরূপ আইন অমান্য করা আর সম্ভবপর হয়ে উঠলো না। দুই একটি দাঙ্গা হাঙ্গামা হওয়ায় নেতাদের এ দুরাশা ত্যাগ ক'রতে হলো।

আর সভাসমিতি, কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স, আন্দোলন, সত্যাগ্রহ শান্তভাবে আইন অমান্য, এমন কি করবন্ধ, এ সব ক'রে ইংরাজের কাছ থেকে কতখানি আদায় করা যেতে পারে? এ সব করার উদ্দেশ্য কি? এ সবের মুখ্য উদ্দেশ্য ইংরাজের মন গলানো, তাকে বুঝানো যে আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নই, আমরা আরও অনেকখানি অধিকার না পেলে ক্রমাগত এই রকম আন্দোলন ক'রতে থাক্‌বো, তোমার শান্তিভঙ্গ ক'রতে থাকবো, তোমার বিরক্তি উৎপাদন করতে থাকবো। এখানে গ্রহীতা আমরা, ইংরাজ দাতা। সে নিজে ইচ্ছা ক'রে নিজের হাতে যতখানি দিবে ততখানিই আমরা পাবো। তার বেশী আমরা পেতে পারি না। ইংরাজ কতখানি দিতে পারে? দাতা কখনও আত্মঘাতী হতে পারে না। সে নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিতে পারে না। সে ততখানিই দিতে পারে যতখানি দিলে তার স্বার্থের বিশেষ ক্ষতি না হয়। ছোটো খাটো বিষয়ে সে নিজের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ ক'রতে পারে, কিন্তু আসল বিষয়ে সে কিছুতেই তার স্বার্থ ছাড়তে পারে না। সে নিজের সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতকে দিতে পারে না।

ভারত তা' হ'লে কি ক'রে স্বাধীন হবে? প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও যুদ্ধের দ্বারা ভারতের স্বাধীন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে পথ তার রুদ্ধ। শ্রীভগবান কৃপা ক'রে তাকে নিরস্ত্র ক'রে রেখেছেন। অস্ত্রবল সংগ্রহ ক'রে যে সে কোনও দিন ইংরাজের সমকক্ষ হতে পারবে, ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করার উপযুক্ত শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে, সে আশা নাই। বহুদিন ধরে যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে যুদ্ধব্যবসায়ে ইংরাজ এমনই ওস্তাদ হয়েছে যে তার সুসংবদ্ধ প্রবল শক্তিকে ভারত কোনও দিন পরাজয় ক'রতে পারবে এরূপ কল্পনা করাও বাতুলতা মাত্র। পশুবল দ্বারা রাজশক্তিকে পরাভূত করার চিন্তা করাও বৃথা। ইংরাজের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন অন্য কোনও জাতির সাহায্যে যে ভারত স্বাধীন হবে, তাহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেহ কেহ হয়তো মনে ক'রতে পারেন যে প্রধান প্রধান রাজশক্তিগুলির পরস্পরের ভিতর হিংসাবিদ্বেষের ফলে ভারত হয়তো কোনও দিন স্বাধীনতালাভের সুযোগ পাবে। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে প্রবেশ ক'রে রুশ যদি কোনও দিন হানা দেয় তা' হ'লে ইংরাজ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে, ইংরাজ তখন বাধ্য হয়ে ভারতকে স্বাধীনতা দিবে, বা সেই সুযোগে ভারত স্বাধীনতালাভ ক'রবে। হাওয়ার উপর যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা গ'ড়ে তুলতে চান তাঁদের কথা বাদ দেওয়াই ভাল।

বোমা বা গুপ্তহত্যার দ্বারা ভারতের স্বাধীনতালাভ হতে পারে না। প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও যুদ্ধের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা-লাভ হ'তে পারে না। সভাসমিতি, কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স, আইনসঙ্গত আন্দোলন দ্বারা ভারতের স্বাধীনতালাভ হ'ল না,

হ'তে পারে না। অহিংস অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, শান্তভাবে আইন অমান্য দ্বারাও ভারতের স্বাধীনতালাভ হ'তে পারে না। তা হ'লে ভারত কি করবে? স্বাধীনতার আশাকে দুরাশা ব'লে বর্জ্জন ক'রে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সন্তুষ্ট ক'রে তার কাছ হতে যতটা আদায় করতে পারে তারই চেষ্টা করবে? বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টের দুয়ারে ধর্‌ণা দিবে? বা নানা রকমের অর্থ-নৈতিক চাপ দিয়ে তাকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দিতে বাধ্য করবে?

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন

কংগ্রেসের জন্মাবধি দুই বৎসর আগে পর্য্যন্ত কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। গত বৎসর সর্ব্বদল সম্মেলনও (All parties convention) ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনকে ভারতের লক্ষ্য ব'লে স্থির করেছে ও তারই উপর ভারতের রাষ্ট্রের স্বরূপ নির্ণয় করেছে। গত বৎসর কলিকাতা কংগ্রেস এই রেজল্যুশান্ পাশ করেছে যে যদি ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন না দেয় তবে ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রবে।

ইংরাজ জাতি ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়ার মত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভারতকে দিতে পারে না। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার অর্থ সমস্ত সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রবল, নৌবহর, যুদ্ধের এরোপ্লেন বহর সবই ভারতীয়দের হাতে দেওয়া। তা'হলে ভারত যেদিন ইচ্ছা ইংরাজের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন ক'রে ফেলতে পারে। পূর্ণ স্বায়ত্ত

শাসন দেওয়া আর পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া একই কথা। ক্যানাডা, দক্ষিণআফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর ইংরাজের সঙ্গে সমান আসন (equal status) পেয়েছে। নিজেদেরই স্বার্থের খাতিরে তারা ইংরাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অর্দ্ধেক লোক সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। জাপানের ভয় না থাকলে অষ্ট্রেলিয়াও হয়তো বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে চলে যেত। ক্যানাডার অর্দ্ধেক অধিবাসী ফরাসী দেশীয়, ক্যানাডার কাজ কারবার, ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে মেলা মেশা ইংরাজের চেয়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সঙ্গেই বেশী। ক্যানাডা যে কোন মুহূর্ত্তে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদন ক'রে ফেলতে পারে, শুধু নিজের স্বার্থের জন্য করে না। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিয়ে, নিজের সঙ্গে সমান পদবী (equal status) দিয়ে ইংরাজ কোনও মতে তাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে ধরে রেখেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। এরূপ স্বায়ত্তশাসন ইংরাজ ভারতকে কোনও দিনই দিবে না, দিতে পারে না।

মুখে বললেও কার্য্যতঃ সে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন কখনই দিবে না। এক হাত দিয়ে যাহা দিবে, আর এক হাত দিয়ে তাহা ধরে রাখবে। একটুখানি দিয়ে বলবে আবার দশ বৎসর পরে দেখা যাবে। এই ভাবে নানা অছিলায় সে কালক্ষেপ ক'রবে। ইংরাজের দানের বহর কতখানি তাহা আমরা ইজিপ্টের দৃষ্টান্ত থেকেই বেশ বুঝতে পারি। সে সবই দিবে, কিন্তু চাবিকাটিটি তার নিজের হাতে রেখে দিবে। ইজিপ্ট তার ঘরের কাছে; জিব্রল্টারে, মাল্টায় তার বলশালী নৌবহর রয়েছে, প্যালেষ্টাইনে

তার সৈন্যসামন্ত রয়েছে; তাই সে প্রস্তাব করেছে ইজিপ্ট থেকে তার সৈন্যসামন্ত একটুখানি সরিয়ে সুয়েজ খালের পারে রাখবে। ইজিপ্টকে সে যতখানি দিতে পারে, ভারতকে ততখানিও দিতে পারে না। ইজিপ্টকে যে কোনও মুহূর্ত্তে সে নিগ্রহ ক'রতে পারবে, কিন্তু ভারত একবার তার হাতছাড়া হলে তার সর্ব্বনাশ। এমন কাজ সে কিছুতেই ক'রবে না। যদি কেহ আশা ক'রে থাকেন ইংরাজ ভারতকে ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়ার তুল্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিবে, তা' হ'লে তিনি নিতান্তই ভ্রান্ত।

এ কথাটা আমাদের পরিষ্কার বুঝতে হবে যে ইংরাজের দিবার সীমা আছে। ভারতের সঙ্গে ইংরাজ জাতির রাজনীতিক অর্থনীতিক স্বার্থ অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত হয়ে রয়েছে। ভারতকে পেয়ে ইংরাজ জগতে বড় হয়েছে। ভারত তার করায়ত্ত থাকায় ভারতের কাঁচামাল সে অবাধে সংগ্রহ ক'রে তার কলকারখানা চালাতে পারছে, ভারতের বাজারে তার তৈরী মাল সহজে বিক্রী ক'রতে পারছে, তার শ্রমজীবিরা কাজ পাচ্চে ও উদরান্নের সংস্থান ক'রতে পারছে। তার দেশের বহুলোক ভারতে চাকরি ক'রে, ব্যবসা ক'রে ধনী হচ্চে। ভারতকে ছেড়ে দিলে ইংরাজের জাতীয় জীবন আধখানা পঙ্গু হয়ে যাবে। ভারত তার বিশাল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ। ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটি প্রধান ঘাঁটী। ভারতে দৃঢ়রূপে বসে সে একদিকে অষ্ট্রেলিয়াকে জাপানের হাত থেকে রক্ষা ক'রছে, অপরদিকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পাহারা দিচ্চে,—ইরাকে, চীনে, এশিয়ার সর্ব্বত্র তার বাণিজ্য, তার প্রাধান্য বজায় রাখছে। এমন ভারতকে সে কিছুতেই ছাড়তে পারে না।

ইংরাজ ভারতে তার স্বার্থ, তার প্রাধান্য যেমন ক'রেই হোক্ বজায় রাখবে। শত আন্দোলনেও সে বিচলিত হ'বে না, সহস্র যতীন দাস জেলে ম'রলেও সে তার দেশের পাঁচ কোটী লোকের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিবে না, তাদের অন্ন বস্ত্র মারবে না। একজন যতীন দাসের অবস্থা দেখে যখন তার প্রাণ একটু নরম হবে, তখন তার মনে এ চিন্তারও উদয় হবে, ভারতকে স্বাধীন ক'রে দিলে, তার দেশের অর্দ্ধেক লোকেরও যতীন দাসের অবস্থা ঘটবে। ভারতের দাবী অতি ন্যায্য একথা সে শতবার স্বীকার করবে, কিন্তু তার দেশের অর্দ্ধেক লোকের বেঁচে থাকার দাবী সে কিছুতেই ছাড়তে পারে না। এ কথা ধ্রুব নিশ্চিত। অন্নবস্ত্র সংস্থানের এমন সহজ সুন্দর উপায় হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে, শুধু তার পক্ষে কেন, কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। আশার ছলনায় ভুলে ভারতের লোক যদি এ কথাটী এখনও না বুঝে, এখনও আশা করে হয়তো ইংরাজ মহত্ত্ব প্রকাশ ক'রে ভারতকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিবে, তা হ'লে বুঝতে হবে ভারতের দুর্গতির এখনও কিছু বাকী আছে।

আর যদি ইংরাজ ভারতকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনই দেয়, তা হ'লেই কি ভারত তাহা গ্রহণ করবে ?

ইংরাজ যদি এদেশ থেকে তার সমস্ত সৈন্য সামন্ত উঠিয়ে নিয়ে যায়, দেশ রক্ষার ভার দেশবাসীদের দিয়ে, দেশের শাসন-তন্ত্র দেশের লোকের হাতে দিয়ে, সাম্রাজ্যের একতার চিহ্ন স্বরূপ মাত্র একজন শাসনকর্ত্তা পাঠায়, তা হলে কি ভারত সে স্বায়ত্তশাসন গ্রহণ ক'রবে ? না, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনও ভারতবর্ষ গ্রহণ ক'রতে পারে না।

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে ভারতের সুবিধা

বড় বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চললে অনেক বিষয়ে সুবিধা হয় কিন্তু সে সুবিধাও ভারতকে ছাড়তে হবে। বর্ত্তমান কালে জগতে কোনও জাতিরই স্বাধীনতা নিরাপদ নহে, নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে জাতি সকলের মধ্যে সর্ব্বদাই সংঘর্ষ চলছে, কাহারও সঙ্গে কাহারও সদ্ভাব নাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে শত্রু মনে ক'রছে, কে কখন কার দেশ আক্রমণ করে তার স্থিরতা নাই। এরূপ অবস্থায় সাম্রাজ্যের ভিতর থাকলে ভারতের কিছু সুবিধা আছে। বহিঃশত্রু আক্রমণ ক'রলে সে সাম্রাজ্যের কাছ থেকে সাহায্য পাবে, ইংরাজের বিশাল নৌবাহিনী তার বিস্তৃত সমুদ্র তীর রক্ষা ক'রবে। Imperial Navyর ব্যয়ের কিছু অংশ দিলেই সে সুবিধা সে পাবে। আর স্বাধীন বা অর্দ্ধ স্বাধীন হলে তারও ইচ্ছা জাগবে,—ইংরাজও তাতে উৎসাহ দিবে—সে ধীরে ধীরে একখানি দুখানি ক'রে ক্রুজার, ডেষ্ট্রয়ার, সাবমেরিণ তৈরী ক'রে ছোট খাটো একটী নৌবহর গ'ড়ে তুলতে পারবে। এ সুবিধা দেশের অধিকাংশ রাজনীতিজ্ঞের কাছেই বড় বলে মনে হয়। স্বায়ত্তশাসন পাওয়াকে তাঁরা পরম সৌভাগ্য ব'লে মনে করেন। এই স্বায়ত্তশাসনই এতদিন জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য হয়ে আছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা গভীর চিন্তা ও বিচার করে যে নেহরু রিপোর্ট প্রস্তুত করেছেন তাতেও তাঁরা স্বায়ত্তশাসনকেই ভারতের কাম্য বস্তু বলে নির্দ্দেশ করেছেন। হায়রে পরাধীনতা! দাঁড়ের পাখী খাঁচার সুখসুবিধাকেই বড়

মনে করে, স্বাধীনতার দুঃখকে সে বরণ ক'রে নিতে ভয় পায়।

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে ভারতের অসুবিধা

স্বায়ত্তশাসন পেলে বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় থেকে ভারত কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে, কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের অসুবিধাও অনেক আছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের নিজস্ব বহির্ব্বাণিজ্য নাই বললেই হয়, যাহা আছে তাহা ইংরাজের ও অন্যান্য জাতিদের হাতে। কোনও জাতির সঙ্গে তার রেষারেষি নাই, সকলকেই সে সমান চক্ষে দেখে, তার প্রতিও কাহারও বিদ্বেষ নাই। কিন্তু দলের সঙ্গে গেলেই দলের শত্রু তার শত্রু হবে। ইংরাজের সঙ্গে সখ্য হেতু ইংরাজের শত্রু তার শত্রু হবে। আর জগতে ইংরাজের মিত্র অপেক্ষা শত্রুর সংখ্যাই বেশী। ইংরাজের সঙ্গে জাপানের যদি যুদ্ধ হয়, তা' হ'লে জাপান ভারত আক্রমণ ক'রবে, অথচ জাপানের সঙ্গে ভারতের কোনও শত্রুতা নাই। জাপান যদি অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণ করে, তা' হ'লে ভারতকে গিয়ে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে, কেননা সে সাম্রাজ্যের ভিতর আছে। সাম্রাজ্যের কোনও অংশ বিপন্ন হ'লে তাকে সাহায্য ক'রতে হবে, নইলে তার বিপদে অষ্ট্রেলিয়া তাকে সাহায্য ক'রবে না। তা' না হ'লে সাম্রাজ্যের ভিতর থাকার কোনও অর্থ থাকে না। ইংরাজের সঙ্গে রুশের যদি যুদ্ধ বাঁধে, তা' হলে ইংরাজকে জব্দ করার জন্য রুশ ভারত আক্রমণ ক'রবে। স্বায়ত্তশাসন পেলে ভারতের শত্রুভয় দূর হওয়া অপেক্ষা তার শত্রুবৃদ্ধির সম্ভাবনাই বেশী।

তারপর, পৃথিবীতে বহু জাতির বাস। সকলকে ছেড়ে কেন ভারত ইংরাজের সঙ্গেই বেশী ক'রে ঘনিষ্ঠতা ক'রবে? তার সুখ দুঃখের ভাগী হবে, তার জন্য অপর জাতির সঙ্গে বিবাদ ক'রবে, যুদ্ধে গিয়ে প্রাণ দেবে? ইংরাজের সঙ্গে তার রক্তের সম্বন্ধ নাই, আচার, ব্যবহার, ভাব, ভাষা, ধর্ম্ম কোন ও কিছুরই মিল নাই। অন্যান্য জাতির সঙ্গে যেমন, ইংরাজের সঙ্গেও তেমনি। ব্যক্তিগত এবং জাতিগত হিসাবে ইংরাজের সঙ্গে ভারতের লক্ষ্যের মিল নাই। ইংরাজের লক্ষ্য পার্থিব সম্পদ আহরণ, জগতে বড় হওয়া, শক্তিশালী হওয়া। ভারত পার্থিব সম্পদকে কোনও দিনই জীবনের লক্ষ্য করে নাই, অন্তরের সম্পদকেই সে বড় মনে করে। তবে ইংরাজকেই ভারত বেশী ক'রে তার আপনার মনে ক'রবে কেন?

ভারত কি চায়? তার সাধনার ধারা কোন্ পথে? তার অতীত ইতিহাস কি সাক্ষ্য দিচ্চে? ভারত জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত জাতিকেই আপনার মনে করে, সকলের প্রতিই তার সমান শ্রদ্ধা, সকলের সঙ্গেই সে মিলন চায়, সকলের সঙ্গেই সে ভাবের আদানপ্রদান, জ্ঞানবিজ্ঞানের বিনিময় চায়। সকলের সঙ্গেই সে মিত্রতা চায়, কাহাকেও সে উদ্বেগ দিতে চায় না, তাহাকে কেহ উদ্বেগ দেয় ইহাও সে চায় না। শান্তিতে, নিরুপদ্রবে সে সকলের সঙ্গেই বসবাস ক'রতে চায়। জগতের প্রত্যেক জাতির আনন্দ সে বাড়াতে চায়, কাহারও নিরানন্দের কারণ সে হতে চায় না।

যেখানে বহু জাতির বাস, সেখানে একজনের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা ক'রলে, অপর সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার হ্রাস হয়, এক-

জনের প্রতি বেশী আস্থা দেখালে, অপর সকলের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ হয়, একজনকে বেশী আদর ক'রলে, অপর সকলের প্রতি অনাদর প্রকাশ হয়, একজনের প্রতি বেশী প্রেম দেখালে অপর সকলের সঙ্গে প্রেমের বন্ধন শিথিল হয়। ভারত তো তাহা চায় না। তবে কেন ভারত ইংরাজের প্রতি বেশী ক'রে প্রেম দেখাবে?

বর্ত্তমান সময়ে জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা চেষ্টা ক'রছেন মানবজাতির ঐক্য সাধন ক'রতে। জগদ্ব্যাপী এই আলাপ, এই আলোচনা, এই চেষ্টা চলেছে—ভাবের মিলন, শিক্ষার মিলন, সভ্যতার মিলন, ধর্ম্মের মিলন। এমন সময়ে ভারত ইংরাজকে নিয়ে কেন দল বাঁধবে? জাতিসঙ্ঘের ভিতরও সে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি ক'রবে? বৃটিশ সাম্রাজ্যের চেয়ে সমস্ত মানবজাতি বড়। কেন সে বড়কে ছেড়ে ছোটকে আশ্রয় ক'রবে? সম্প্রদায় চিরদিনই হীন জিনিষ। কেন ভারত সে হীনতা স্বীকার ক'রবে? কেন সে অখণ্ড মানবজাতির কল্যাণ চিন্তা না ক'রে সাম্রাজ্যের কল্যাণ চিন্তা ক'রবে? সাম্রাজ্যের জালে জড়িত হ'লে তার চিন্তা, তার ভাব, তার কার্য্য সাম্প্রদায়িকতাদোষ দুষ্ট হবে। তার চিরন্তন উদার দৃষ্টি, তার বিশ্বজনীন ভাব খর্ব্ব হবে, তার প্রাণটাই ছোট হয়ে যাবে। তার পূর্ব্বপিতামহরা বলেছেন "বসুধৈব কুটুম্বকম্"। কেন সে ইংরাজের সঙ্গেই বেশী ক'রে কুটুম্বিতা ক'রে নিজেকে ছোট ক'রবে?

ভারত চায় জগতে সত্যের প্রতিষ্ঠা। ন্যায়ের সিংহাসন সুদৃঢ় করাই তার জীবনের ব্রত। ইংরাজ যখন ফরাসীর প্রতি অন্যায়

আচরণ ক'রবে, তখন ইংরাজকেই তার সমর্থন ক'রতে হবে। ইংরাজ যখন ইজিপ্টের প্রতি অন্যায় ক'রবে, তখন মৌন থেকে ভারত তাতে সম্মতি দেবে। ইংরাজ যখন ইরাককে তার স্বাধীনতা ছেড়ে দেবে না তখন ভারত তাতে প্রতিবাদ ক'রতে পারবে না। সাম্রাজ্যের জালে নিজেকে জড়িয়ে ভারত কেন এমন ক'রে তার হাত পা আবদ্ধ ক'রবে? তার স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন উক্তি, স্বাধীন কার্য্যের পথ রুদ্ধ ক'রবে? কোথায় থাকবে তার স্বাধীনতা? স্বাধীন হয়েও সে পরাধীন হয়ে থাকবে। ভগবান ভারতকে সে দুর্গতি হতে রক্ষা করুন।

তার পর, বিশ্বমানব সভাতে যখন সে গিয়ে দাঁড়াবে, তখন তার কপালে থাকবে ইংরাজের ছাপ। এখন সেই ছাপটা একটু মোটা রকমের, অসুন্দর। তখন তাহা হবে বেশ পরিপাটী, সুন্দর, একেবারে নিখুঁত। কিন্তু সে ইংরাজেরই ছাপ। ২০০ বৎসর ধ'রে যে ছাপ সে কপালে ধারণ ক'রে আসছে, সে ছাপ মুছে যাবে না, একটু সুন্দর হবে। সেখানে অন্যান্য জাতিরা ভারতকে জানবে কি বলে? ভারতকে তারা ভারত ব'লে দেখবে না, ইংরাজের সাম্রাজ্যের একজন ব'লে দেখবে। ভারতও তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার ক'রবে? সাম্রাজ্যের ভিতর সে সর্ব্বাগ্রে দেখবে নিজের স্বার্থ। কিন্তু সাম্রাজ্যের বাহিরে সে হবে সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি, সে আগে দেখবে সাম্রাজ্যের স্বার্থ। কি প্রয়োজন তার সাম্রাজ্যের স্বার্থ নিয়ে অন্য জাতির সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডায়, মনোমালিন্যে প্রবৃত্ত হওয়ার? এতে কি লাভ হবে? এতে এই হবে যে জগতের প্রত্যেক

জাতির সঙ্গে ভারতের যে সহজ সত্য সম্বন্ধ তাহা ফুটে উঠবে না। তারা ভারতকে সত্যরূপে বুঝবে না, ভারতও সাম্রাজ্যের চশমা চোখে দিয়ে বিকৃত ক'রে তাদের দেখবে। ফলে, ভারতের সঙ্গে তাদের প্রাণের সহজ আদানপ্রদান হবে না। ভারত তার অন্তরের ধনসম্পদ কোনও জাতিকে সহজ ভাবে দিতে পারবে না, তারাও গ্রহণ ক'রতে পারবে না। তাদের যাহা দেবার ভারতও প্রাণের সঙ্গে তাহা গ্রহণ ক'রতে পারবে না। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের বিনিময় হবে না।

ভারত এখন আছে ইংরাজের দাস। তখন হবে ইংরাজের অনুচর বা সহচর। ইংরাজের সহচর হয়ে, ইংরাজের ছাপ কপালে প'রে ভারত বিশ্বমানব সভাতে গেলে তার মর্য্যাদার হানি হবে, তার মনুষ্যত্বের অপমান হবে। ভারত বিশ্বমানব সভাতে যাবে ইংরাজের অনুচর হয়ে নয়, ভারত হয়ে, অতীত গৌরবময় ভারতের উত্তরাধিকারীরূপে, বিশ্বপ্রেমিক পূর্ব্বপিতামহগণের উপযুক্ত সন্তান হয়ে, অনাবিল হৃদয় নিয়ে, পরিপূর্ণ প্রাণ নিয়ে। সে বিশ্বমানবসভাতে যাবে ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা ক'রতে নয়, সে যাবে তার প্রেমধন বিতরণ ক'রতে। জগতের প্রত্যেক জাতির সঙ্গে, প্রত্যেক নরনারীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধকে খর্ব্ব ক'রে কেন সে ইংরাজের সঙ্গে নূতন ক'রে সম্বন্ধ পাতাবে ?

যে ভাবেই হ'ক ইংরাজের সঙ্গে ভগবান ভারতকে মিলিত করেছেন। ইংরাজকে সে ছাড়তে চায় না, কিন্তু বিশ্বমানবকেই সে চায়। ইংরাজের সঙ্গে সম্বন্ধ সে ছিন্ন ক'রতে চায় না। সে সম্বন্ধ এখন বিকৃত। এই সম্বন্ধকে সে সত্য, সহজ সম্বন্ধে

পরিণত ক'রতে চায়। ইংরাজের সঙ্গে সে মিলন চায়, কিন্তু সে মিলন প্রভুদাসের মিলন নয়, সে মিলন মানুষে মানুষে মিলন, মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে, ন্যায়ের ভিত্তিতে, স্বাধীনতার ভিত্তিতে, সমতার ক্ষেত্রে মিলন। ইংরাজের সঙ্গে সে সর্ব্বান্তঃকরণে মিলন চায়, কিন্তু সে মিলন যদি অন্য সব জাতির সঙ্গে মিলনের পথে বিঘ্ন হয়, তা' হ'লে সে মিলনে সে রাজি নয়। ভারত চায় ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, রুশ, আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্থান, চীন, জাপান,—জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমস্ত মানবজাতির সঙ্গে মিলন। তাহার বিশাল প্রাণ শুধু ইংরাজকে পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে না, সমস্ত বিশ্বমানবকে সে তার প্রাণের ভিতর পূরে নিতে চায়। তাহার প্রাণের ঠাকুর প্রত্যেক জাতির ভিতর, প্রত্যেক মানুষের ভিতর বসে খেলা করছেন। কেমন ক'রে সে একজনকে ছেড়ে একজনকে ধ'রবে? সবাই যে তার প্রাণের দেবতার রূপ, সবাই যে তিনি। সবাইকে না পেলে তার প্রাণের তৃপ্তি হবে না।

স্বায়ত্তশাসন ভারত কিছুতেই গ্রহণ ক'রতে পারে না। স্বায়ত্তশাসন পেলে তার শত্রু ভয় দূর হবে না, তার শত্রু বৃদ্ধি হবে। সুবিধার চেয়ে তার অসুবিধাই বেশী হবে। সাম্প্রদায়িক ভাবে তার মানসিক, আধ্যাত্মিক অধোগতি ঘটবে। অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে তার মিলন সহজ সুন্দর হবে না। স্বায়ত্তশাসন গ্রহণে রাজি হ'লে ভারতের পক্ষে নিতান্ত অপরিণামদর্শিতার কাজ হবে। এ পথ তার ভগবদ্‌-নির্দ্দিষ্ট পথ নয়। এ পথে চ'লতে চাইলে তার অদৃষ্টে দুঃখ ভোগ আছে। শেষে দুঃখের তাড়নায় তাকে এ পথ ছাড়তে হবে।

পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের মুক্তির পথ

পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের মুক্তির পথ। পূর্ণ স্বাধীনতাই তার আত্মবিকাশের, তার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ। ভারত স্বাধীন না হ'লে তার প্রাণ মনের বিকাশ হবে না, তার অন্তরের সদ্‌বৃত্তিগুলির উন্মেষ হবে না, তার বিশিষ্ট দান সে জগতকে দিতে পারবে না। ভারত স্বাধীন না হ'লে বিশ্ব-মানবের সঙ্গে তার মিলন হবে না, তার দেহ-মন-প্রাণের সবখানি শক্তি দিয়ে সে বিশ্বহিত সাধন ক'রতে পারবে না। ভারত স্বাধীন না হ'লে তার খাওয়া পরার অভাব ঘুচবে না, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অসংখ্য প্রাণহানি ঘুচবে না। ভারত স্বাধীন না হ'লে তার প্রত্যেক সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদনের, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা হবে না, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ পরিষ্কার হবে না। ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ও সমস্ত বিশ্বের কল্যাণের জন্য ভারতের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন।

পূর্ণ স্বাধীনতার পথই ভারতের ভগবদ্ নির্দ্দিষ্ট পথ। এই পথে চলবার জন্যই তার বিধাতাপুরুষ তাকে ইঙ্গিত ক'রছেন। এই পথে চ'লতে হয়ত তাঁকে অনেক দুঃখ পেতে হবে, বহু ত্যাগ স্বীকার ক'রতে হবে কিন্তু এই পথেই তাকে চ'লতে হবে। এই পথে চ'ললেই ভারত পূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে, তার জাতীয় সাধনার সিদ্ধিলাভ হবে। ভারতকে সম্পূর্ণ রূপে ইংরাজের অধীনতাপাশ হতে মুক্ত হয়ে বিশ্বমানব-সভাতে যেতে হবে। তা' না হ'লে তার সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে,

তার বেঁচে থাকার কোন সার্থকতাই থাকবে না। জগতের মাঝে হেয়, অকিঞ্চিৎকর হয়ে তাকে থাকতে হবে। পরাধীন হয়ে জগতে তার থাকা না থাকা দুইই সমান হবে। ভারতকে স্বাধীন হতেই হবে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের প্রকৃত উপায় স্থির করার আগে ভারতকে গভীর ভাবে চিন্তা ক'রে দেখতে হবে যে প্রকৃত স্বাধীনতা কি? ভারত যে স্বাধীনতা চায় তাহা কিরূপ স্বাধীনতা?

বর্ত্তমান স্বাধীন জাতিদের স্বাধীনতাই কি প্রকৃত "স্বাধীনতা"?

বর্ত্তমান জগতের স্বাধীন জাতিদের যে স্বাধীনতা তাহা কি প্রকৃত স্বাধীনতা? ভারত কি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকার মত স্বাধীন হতে চায়? সেই স্বাধীনতাই কি ভারতের লক্ষ্য? এই স্বাধীন দেশগুলির অবস্থা পরাধীন দেশগুলির অপেক্ষা অনেক ভাল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ স্বাধীনতার ফলে কি ঐ সব দেশের জনসাধারণ স্বাধীন হয়েছে? এ স্বাধীনতায় কি সেই সব দেশের সর্ব্বসাধারণের অন্ন-বস্ত্র-সমস্যার সুমীমাংসা হয়েছে? সেই সব দেশের নিরন্নরা কি অন্ন পেয়েছে? বস্ত্রহীনরা কি বস্ত্র পেয়েছে? গৃহহীনরা কি নিরুদ্বেগে স্বগৃহে বাস ক'রতে পেয়েছে? সেই সব দেশে কি মানুষের দুঃখদারিদ্র্য বিতাড়িত হয়েছে? এ স্বাধীনতার ফলে সেই সব দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রা কতটুকু সহজ ও আরামপূর্ণ হয়েছে? তারা কতখানি সুখ, শান্তি, আনন্দ ভোগ করছে? আজকার উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফল সর্ব্বসাধারণে

কতখানি ভোগ করছে? যে স্বাধীনতায় দেশের প্রত্যেক নর-নারী খেয়ে প'রে বেঁচে থাকার ও শীত গ্রীষ্মের কঠোরতা হতে আত্মরক্ষা করার সুযোগ না পায়, উদ্বেগ অশান্তি হতে অব্যাহতি না পায় সে স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু? ভারত কেন বৃথা এই মরীচিকার পিছনে ঘুরে মরছে?

বর্ত্তমান জগতের "স্বাধীনতা" পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনও জাতিই কোনও জাতিকে বিশ্বাস করে না। কে কখন্ কাকে আক্রমণ করে এই ভয়ে প্রত্যেক স্বাধীন জাতিই আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সেজে বসে আছে। সর্ব্বদাই সকলে সন্ত্রস্ত ও যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত। প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে সর্ব্বদা সেনা, নৌবহর, বিমানপোত বৃদ্ধি করার প্রতিযোগিতা চলেছে। এর নাম কি স্বাধীনতা? পদে পদে যে স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চল্‌তে হয়, পদে পদে যার জন্য উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ভোগ ক'রতে হয়, সে স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু? জনসাধারণের দারিদ্র্যের মূল্যে যে স্বাধীনতা ক্রয় ক'রতে হয়, লক্ষ লক্ষ লোককে নিরন্ন, বস্ত্রহীন ও গৃহহীন * রেখে যে স্বাধীনতার অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি যোগাতে হয়, জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুখ, সুবিধা, আরাম, আনন্দ সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে যে স্বাধীনতা বজায় রাখতে হয়, তাহা "স্বাধীনতা" না "পরাধীনতা"? এই স্বাধীনতার জন্য ভারত লালায়িত!

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বর্ব্বর পার্ব্বত্য জাতিগুলিও

---

* ইং ১৯১৯—১৯২৬ সালের মধ্যে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ৩২০৫ লক্ষ পাউণ্ড যুদ্ধ বাবদ খরচ করেছে, আর মাত্র ৩৯০ লক্ষ পাউণ্ড গৃহ নির্ম্মাণ বাবদ খরচ করেছে। Statement by I. L. P.—"No More War."

স্বাধীন। তারা সুযোগ পেলেই এক দল অপর দলের ঘরবাড়ী লুট করে। শস্য, পশু যাহা কিছু পায় নিয়ে পালিয়ে যায়। বর্ত্তমান সভ্য জগতে যে স্বাধীনতা দেখা যায় তাহাও এই রকমের স্বাধীনতা, এর একটু উন্নত সংস্করণ মাত্র। বর্ব্বর যুগের স্বাধীনতার প্রথাই এ পর্য্যন্ত চলে এসেছে। এরূপ স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয় কি না মানুষের তাহা ভেবে দেখবার সময় নাই। ভারতও এমন স্বাধীনতা পেয়ে কতখানি প্রকৃত লাভবান হবে তাহা ভেবে দেখে না, চিন্তা করে না। স্বাধীনতার নামে ভারত যাহা চায়, তাতে ভারতের বস্তুতঃ কতখানি স্বাধীনতা হবে আর কতখানি পরাধীনতা হবে তাহা চিন্তা করে দেখার অবসরও বুঝি তার নাই।

অন্য জাতির মত স্বাধীন হয়ে ভারতের কি লাভ?

ভারত আজ যদি কোন উপায়ে ইংলণ্ড, ফ্রান্সের মত স্বাধীন হয়, তা' হ'লে তাকে অস্ত্রবলে অন্যান্য স্বাধীন জাতিদের সমান হতে হবে। অস্ত্রবলে স্বাধীনতা রক্ষা ক'রতে হলে, বর্ত্তমান কালে কিরূপ অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয় তাহা সকলেই জানেন। নিত্য নূতন কামান, বন্দুক, বিষাক্ত গ্যাস, গোলাগুলি, সাজোয়া গাড়ী (armoured car); ড্রেড্‌নট্, ক্রুজার, ডেষ্ট্রয়ার, সবমেরিণ্, এরোপ্লেন্ প্রভৃতির প্রয়োজন। পৃথিবীর বড় বড় ধনশালী জাতিরাই যুদ্ধের সরঞ্জামের এই গুরু ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হয়ে পড়েছে; দরিদ্র ভারত কেমন ক'রে সে ব্যয়ভার বহন ক'রবে? কোথায় তার ব্যবসা? কোথায়

তার বাণিজ্য? দেশে কল কারখানার প্রতিষ্ঠা ক'রে, কঠোর প্রতিযোগিতার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ক'রে তায় প্রচুর অর্থাগম হওয়া সুদূরপরাহত। আজ ৫৫ কোটী সামরিক ব্যয়ের বোঝা বহিতে ভারত কুব্জপৃষ্ঠ হয়ে পড়েছে। অস্ত্রবলকেই যদি সে আত্মরক্ষার উপায় করে, তা হ'লে অস্ত্রবলে তাকে অন্য জাতিদের সমতুল্য হতে হবে। তাকে প্রকাণ্ড নৌবহর, অসংখ্য যুদ্ধের এরোপ্লেন ক'রতে হবে। ৫৫ কোটী সামরিক ব্যয় তখন কত ৫৫ কোটীতে গিয়ে দাঁড়াবে! ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের আয়ের প্রতি পাউণ্ডে ১৬ * শিলিং ৮ পেন্স (শতকরা ৮৩ ভাগ) তার অতীত যুদ্ধ বাবদে ও ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে খরচ হয়। যুক্তরাজ্যের গভর্ণমেণ্টের আয়ের শতকরা ৮০ † ভাগেরও বেশী তার অতীত যুদ্ধ বাবদ এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে খরচ হয়। ভারত ইংলণ্ড, যুক্তরাজ্যের মত স্বাধীন হলে ও অস্ত্রবলে স্বাধীনতা রক্ষা ক'রলে, তাকেও তার আয়ের অধিকাংশই সামরিক ব্যাপারে খরচ ক'রতে হবে; না হ'লে তার স্বাধীনতা বজায় থাকবে না।

তখন কোথায় থাকবে ভারতের জাতিগঠন? কোথায় থাকবে তার সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা? কোথায় থাকবে তার স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার? কোথায় থাকবে তার কৃষি ও শিল্পের উন্নতি? কোথায় থাকবে তার স্বাস্থ্যের উন্নতি? কোথায় থাকবে তার জনসাধারণের সুখশান্তির ব্যবস্থা? কৃষিপ্রধান

* According to Mr. Philip Snowden, present Chancellor of the Exchequer.

† Speech of Hon. Lynn J. Frasier, in the Senate of the U.S.A. on 21st April, 1928.

ভারতের কৃষির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভারতব্যাপী কৃষির উন্নতি করতে যে কোটী কোটী টাকার প্রয়োজন হবে, সে টাকা তখন কোথা হ'তে আসবে? ভারতের খাল, বিল, নদী, নালার পঙ্কোদ্ধার ক'রতে যে কোটী কোটী টাকার প্রয়োজন হবে, সে টাকা তখন কোথা হ'তে আসবে? ভারতের এক তৃতীয়াংশ লোক দুবেলা খেতে পায় না, তাদের অন্নের ব্যবস্থা কি ক'রে হবে? বহু বিস্তীর্ণ দেশে নিত্য দুর্ভিক্ষ, বন্যা, শস্যহানি, এ সবের তখন কে প্রতীকার ক'রবে? ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, বেরি-বেরি, যক্ষ্মা আজ ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ ক'রছে। বহিঃশত্রুর হাত হ'তে দেশকে রক্ষা ক'রতে গিয়েই যদি তার আয়ের অধিকাংশ খরচ হয়ে যায়, তা' হ'লে এ সকল গৃহশত্রুর হাত থেকে জাতিকে বাঁচাবার জন্য যে অজস্র টাকার প্রয়োজন হবে, তাহা কোথা হ'তে আসবে?

আজকাল অর্থের অভাবে মিউনিসিপ্যালিটীগুলি সাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ কিছুই ক'রতে পারে না। অর্থের অভাবে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি পল্লীগ্রামের রাস্তাঘাট, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করতে পারে না। বিদেশী গভর্ণমেণ্ট অম্লান-বদনে ব'লে থাকে "আমাদের হাতে টাকা নাই।" দেশের লোকের হাতে গভর্ণমেণ্ট এলে এরূপ অবস্থায় তাঁদেরও ব'লতে হবে "আমাদের হাতে টাকা নাই, ভাই দেশবাসী তোমরা মরতেই থাক"। কর বৃদ্ধি ক'রে যে জাতিগঠন হবে, সে আশা নিষ্ফল। কে দিবে বর্দ্ধিত কর? আর করভারে প্রপীড়িত জনসাধারণের অবস্থা তখন কিরূপ দাঁড়াবে? বর্ত্তমানের চেয়ে ভাল না মন্দ?

অস্ত্রবলে আত্মরক্ষা ক'রতে গিয়ে তখন দেশের সমস্ত উন্নতির আশা স্বপ্নে পরিণত হবে। স্বাধীনতা বজায় রাখতেই তার প্রাণান্ত হবে। ভারতের জনসাধারণের অবস্থা "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" থাকবে। ভারত অন্যান্য জাতির মত স্বাধীন হ'লে তাকে অন্যজাতির মত অস্ত্রবলে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। আর এই "উন্নত" যুদ্ধ-বিজ্ঞানের দিনে, অস্ত্রবলে স্বাধীনতা রক্ষা ক'রতে গিয়ে ভারতের রাজ-কোষ নিঃশেষ হয়ে যাবে। ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থা হবে "যথা পূর্ব্বম্ তথা পরম্"। জনসাধারণের দারিদ্র্যের মূল্যে যে স্বাধীনতা ক্রয় ক'রতে হয় সে স্বাধীনতায় কি লাভ? কি জন্য ভারত স্বাধীন হতে চায়? কাদের জন্য এ স্বাধীনতা? মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য? তারা তো এখনও ভোগসুখে আছে। স্বাধীন ভারতে তারা প্রাধান্য ক'রবে ব'লে? তাদের ক্ষমতাপ্রিয়তার চরিতার্থতার জন্য ভারতকে স্বাধীন করার প্রস্তাব? তা' যদি না হয়, আর যুগ যুগ ধ'রে যারা দুঃখ কষ্ট ভোগ ক'রে আসছে তাদের সুখসুবিধার জন্যই যদি এ স্বাধীনতার দাবী, তা'হ'লে তো এ স্বাধীনতায় তাদের দুঃখদুর্গতি দূর হবে না।

ভারত যদি ইংলণ্ড, ফ্রান্সের মত স্বাধীন হয়, ও জগতের একটী প্রধান শক্তি ব'লেও গণ্য হয়, তাতে ভারতের জনসাধারণের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হবে না। তাতে জগতেরই বা বিশেষ কি লাভ হবে? জাপান স্বাধীন হয়ে, এশিয়ার কি উপকার করেছে? জগতেরই বা কি উপকার হয়েছে? আজকাল প্রধান শক্তিদের মধ্যে জাপান অন্যতম। জাপান স্বাধীন হওয়ায়

জগতে সাম্রাজ্যবাদী (impérialistic) জাতিদের দলবৃদ্ধি হয়েছে। তাতে জগতের নিরীহ, অসহায় জাতিদের অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হয়েছে। জাপান স্বাধীন হওয়ায় শান্তিপ্রিয় চীনকে সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকতে হচ্চে। চীনের জাতীয় উন্নতির পথে তার প্রতিবাসী জাপান চিরকণ্টক। জাপান স্বাধীন হওয়ায় কোরিয়া পরাধীন হয়েছে ও তার স্বাধীনতালাভ সুদূর পরাহত হয়েছে। জাপানের স্বাধীনতায় জাপানের মুষ্টিমেয় লোকের সুখ শান্তির বিনিময়ে জগৎকে বেশী ক'রে অশান্তি ভোগ ক'রতে হচ্চে। প্রশান্ত মহাসাগরের উপর কর্ত্তৃত্ব নিয়ে জাপানের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধের সম্ভাবনা সর্ব্বদাই রয়েছে। জাপানের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার যুদ্ধের সম্ভাবনাও যথেষ্ট। তাই ইংরাজ জাপানের ভয়ে সিঙ্গাপুরে নৌবহর রাখবার বন্দোবস্ত ক'রছে। যে কোন মুহূর্ত্তে জাপানে ইংরাজে, বা জাপানে আমেরিকাতে যুদ্ধ বাঁধতে পারে। জাপানের স্বাধীনতায় জাপানের মুষ্টিমেয় লোকের কিছু সুখসুবিধা হয়ে থাকতে পারে কিন্তু এশিয়ার বা জগতের কোন উপকার হয় নাই। সাম্রাজ্যবাদী জাপানের স্বাধীনতায় জগতে অশান্তির পরিমাণ ও সম্ভাবনা বেড়েছে, কিছুমাত্র কমে নাই।

ভারতও যদি জাপানের মত স্বাধীন হয় ও অন্য স্বাধীন জাতিদের মত অস্ত্রবলে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করে, তাতে ভারতের জনসাধারণেরও অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হবে না, জগতেরও কোনও উপকার হবে না। আজ জগতে যে কয়টী শক্তি আছে তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিদ্বেষের ফলে জগতে অশেষ অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আরও এমনি দু চারটী শক্তি বাড়লে জগতের অশান্তির মাত্রা বেড়েই

যাবে, বিন্দুমাত্র কমবে না। ভারতের দীন দরিদ্র জনসাধারণকে করভারে নিষ্পিষ্ট হয়ে স্বাধীন ভারতের যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম যোগাতে হবে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিনিময়ে জনসাধারণের দুঃখ দারিদ্র্যের বোঝাকে আরও ভারি করা হবে। সমস্ত জগৎ ভ্রান্ত পথে চ'লেছে বলে, আমাদেরও কি সেই ভ্রান্ত পথেই চ'লতে হবে? সমস্ত মানবজাতি ধ্বংসের পথে চ'লেছে বলে, আমাদেরও কি সেই ধ্বংসের পথই বরণ ক'রে নিতে হবে?

হীরকের মূল্য দিয়ে আমরাও কাঁচখণ্ড ক্রয় করতে যাচ্চি। জাতির অন্নবস্ত্র, সুখশান্তি, জাতির সর্ব্বস্ব দিয়ে আমরা ইয়োরোপের ঝুটামাল খরিদ ক'রতে যাচ্চি। চিন্তা ও ভাবের গভীরতায় ভারত একদিন জগতের শীর্ষস্থান গ্রহণ করেছিল। আজ আবার তাকে আত্মস্থ হতে হবে, তার সনাতন সাধনার ধারা অবলম্বন ক'রে কিসে তার শ্রেয় তাহা বিচার করে দেখতে হবে, আর সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই শ্রেয়কেই বরণ ক'রে নিতে হবে। স্বাধীনতার স্বরূপ কি, কোন্ স্বাধীনতায় তার ও সমস্ত মানবজাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ, অবাধ উন্নতি, ও অনন্ত-সুখলাভ হয় তাহা তাকে চিন্তা করে দেখতে হবে আর সেই স্বাধীনতা লাভের জন্য জীবনপণ করতে হবে।

ভারতের স্বাধীনতালাভের প্রকৃত উপায়

ভারতকে প্রকৃত স্বাধীনতালাভ ক'রতে হবে। স্বাধীনতা লাভ ক'রতে হ'লে তার পরাধীনতার কারণ কি তাই দেখতে হবে। ইংরাজ কেন ভারতকে স্বাধীনতা দিতে চায় না? কিসের আপত্তি তার? সে নিজে পরম স্বাধীনতাপ্রিয়; স্বাধীনতার মূল্য

সে খুবই বুঝে ; তবুও কেন সে ভারতকে স্বাধীনতা দিতে চায়-না ? ভারতকে সে ছাড়তে চায় না—অর্থনীতিক কারণে। ভারতকে ছাড়লে তার জীবনযাত্রা অচল হয়ে যাবে। ভারত তার বহু অভাব পূরণ ক'রছে, তার বহুলোককে খেতে পরতে দিচ্চে। যদি অন্য কোনও সহজ সুন্দর উপায়ে তার এই সব অভাব পূরণ হয় তা'হ'লে ভারতকে ছাড়তে তার কোনও আপত্তি হবে না। এখানে ভারতের স্বার্থে ও ইংরাজের স্বার্থে বিষম দ্বন্দ্ব বেঁধেছে। ভারতের স্বার্থ সম্পূর্ণ বজায় রাখতে হবে, কিন্তু ইংরাজের ন্যায্য দাবীকে একেবারে উড়িয়ে দিলে চ'লবে না। স্বাধীনতার দাবী ভারতের সম্পূর্ণ ন্যায্য। কিন্তু খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার দাবী ইংরাজেরও আছে। ভারতের দাবীকে অগ্রাহ্য ক'রলে ইংরাজের অপরাধ হবে। আবার ইংরাজের মুখের অন্ন কেড়ে নিলেও ভারতের অপরাধ হবে। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, বিধিদত্ত দান। ভারতকে তার এই জন্মগত অধিকার হ'তে বঞ্চিত ক'রলে ইংরাজের অধোগতি হবে। আবার জগতের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য শ্রীভগবানের দান, মানবপরিবারের প্রত্যেকের তার উপর দাবী আছে। ভারতের অন্ন ইংরাজকে দিতে পরাঙ্মুখ হলে ভারতের অধোগতি হবে। ভারতের স্বার্থের সঙ্গে ইংরাজের স্বার্থের সামঞ্জস্য ক'রতেই হবে। আবার ইংরাজ যে কারণে ভারতকে অধীন রেখেছে, অন্যান্য জাতিরাও ঠিক সেই কারণেই অন্য জাতিদের অধীন রেখেছে। এক জাতির আর একজাতিকে অধীন রাখার মূল কারণ হলো জগতের অর্থনীতিক বিধিব্যবস্থা—প্রত্যেকে দেখছে প্রত্যেকের স্বার্থকে ভিন্ন ক'রে। ছলে, বলে, কৌশলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ

স্বার্থসাধনে মত্ত। মানবসমাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ (organised) নয়। একজাতিকে অধীন রেখে যদি আর একজাতি লাভবান হয় আর কোনও জাতির অতিরিক্ত লোভকে সংযত করবার জন্য মাথার উপর যদি কোনও সার্ব্বজাতিক প্রতিষ্ঠান না থাকে, তা'হলে এক জাতি আর একজাতিকে অধীন করে রাখতে চেষ্টা করবেই। জগৎ হতে পরাধীনতাকে নির্ব্বাসন করার একমাত্র উপায়—সমস্ত জাতিগুলির স্বার্থের সামঞ্জস্য করা। আর সকল জাতির স্বার্থের সামঞ্জস্য ক'রতে হলে সমস্ত পৃথিবীকে মানবজাতির একটী অর্থনীতিক যৌথপরিবারে (One Commonwealth of Mankind) পরিণত ক'রতে হবে। জগতের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য শ্রীভগবানের দান ও সমগ্র মানবপরিবারের সম্পত্তি। এই বিশ্বভাণ্ডার হতে যে দেশের যা প্রয়োজন সে তাহা নিবে। এক দেশের কোন একরকম অভাব অন্য দেশ তার উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্য দিয়ে পূরণ করবে। আবার এ দেশের অন্য কোন রকম অভাব পূর্ব্বোক্ত দেশ পূরণ করবে। সব দেশেরই ন্যায্য অভাব যদি সহজে, শান্তিতে, নিরুদ্বেগে পূরণ হয়, তবে কোন দেশই নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাবার জন্য লোলুপ হবে না। এক জাতির আর এক জাতিকে অধীন রাখারও প্রয়োজন হবে না এবং এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির যুদ্ধেরও প্রয়োজন হবে না।

ইংরাজের সমস্ত অভাব সহজে, শান্তিতে পূরণ হ'লে ভারতকে কেন কোনও জাতিকেই সে অধীন রাখতে চাইবে না। সে ভারতকে স্বাধীন ক'রে দিবে, ইজিপ্টকে স্বাধীন ক'রে দিবে, ইরাকের উপর কর্ত্তৃত্ব ছেড়ে দিবে। ইণ্ডোনেশিয়াকে স্বাধীন ক'রে দিলে হল্যাণ্ডের তখন কোন ক্ষতি হবে না। মরোক্কো,

সিরিয়া, শ্যামদেশকে স্বাধীন ক'রে দিতে ফরাসীও কুণ্ঠিত হবে না। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীন ক'রে দিতে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যও তখন কাতর হবে না। জাপানও তখন নির্ব্বিবাদে কোরিয়াকে স্বাধীন ব'লে স্বীকার ক'রবে। রাজশক্তিগুলি তখন চীনের বন্দরগুলি দখল ক'রে রাখতে চাইবে না। শ্রীদয়ানন্দ স্কীম কার্য্যে পরিণত ক'রলেই পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতা লাভ হয় ও সকল জাতির সকল অভাব পূরণ হয়। জগতের পরাধীনতা সমস্যার একমাত্র উপায় এই স্কীম। দ্বিতীয় আর কোন পন্থা নাই।

ভারতকে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ ক'রতে হলে পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন জাতিগুলিকে স্বাধীন ক'রে দিতে হবে, পরাধীনতার মুলোৎপাটন ক'রতে হবে। যেখানে বহুমানবের বাস সেখানে সকলেই স্বাধীনতার মূল্য বুঝা চাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে নেওয়া চাই, প্রত্যেকে তার আচরণে প্রত্যেকের স্বাধীনতা মেনে চলা চাই। ভারত প্রকৃত স্বাধীনতা সেই দিন লাভ ক'রবে যে দিন সমস্ত বিশ্বমানব মিলিত হয়ে জগতের স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রবে, যে দিন কাহাকেও কাহারও অধীন রাখার প্রয়োজন হবে না, যে দিন প্রত্যেকে আনন্দের সঙ্গে প্রত্যেকের স্বাধীনতা মেনে চলবে।

ভারত একা স্বাধীন হয়ে কোন লাভ নাই। যদি অন্য সব পরাধীন দেশগুলিও সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন না হয়, তা'হ'লে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতালাভ হতে পারে না। প্রচণ্ড শীতে বসন্তের বায়ু উপভোগের আশা যেমন দুরাশা, পরাধীন জগতে স্বাধীনতা উপভোগের আশাও তেমনি দুরাশা। যতক্ষণ জগতের একটি

জাতিও পরাধীন থাকবে ততক্ষণ জগতে প্রকৃত স্বাধীনতা ফুটে উঠতে পারে না। পরাধীনতা জিনিষটাই জগৎ থেকে "উঠিয়ে দিতে হবে। মানব-সমাজের অর্থ-নীতিক বিধিব্যবস্থাকে এমন ভাবে পরিবর্তিত ক'রতে হবে যাতে এক জাতিকে আর এক জাতির অধীন রাখবার প্রয়োজন মাত্র না হয়। পরাধীনতার মূল যদি উৎপাটিত না হয় তা'হ'লে সেই মূল থেকে জগতে পুনরায় পরাধীনতারূপ বিষবৃক্ষ গজিয়ে উঠবে। উৎকট ব্যাধির মূল উৎপাটিত না হ'লে, পুনরায় ব্যাধির আক্রমণের সম্ভাবনা থাকবেই। জগতের একটি জাতিও যদি পরাধীন থেকে যায়, তা'হ'লে প্রত্যেক জাতিরই পরাধীন হওয়ার, সম্ভাবনা রয়ে গেল। এমন অবস্থায় প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের আশা নিষ্ফল।

জগতের প্রত্যেক জাতিকে স্বাধীন ক'রে তবে ভারতকে স্বাধীন হতে হবে। ইহাই হলো ভারতের স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পথ। জগৎ হতে "পরাধীনতা" চিরদিনের জন্য উঠিয়ে দিয়ে, এক জাতির আর এক জাতিকে অধীন রাখার প্রয়োজন মাত্র না হয় এমন এক নূতন অর্থ-নীতিক মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা ক'রে, পরাধীনতার মূলোৎপাটন ক'রে, তবে ভারতকে স্বাধীন হতে হবে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের ইহাই বিধিনির্দ্দিষ্ট পথ। ইহাই তার জীবনের মিশন। এই জন্যই সে জগতে এখনও বেঁচে আছে।

ভারতকে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ ক'রতে হলে, আত্মরক্ষার উদ্বেগ হতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে হ'লে, আত্মরক্ষার জন্য দেশের আয়ের অধিকাংশ খরচ করার দায় হতে অব্যাহতি পেতে হলে, পৃথিবী হতে যুদ্ধ প্রথাটাই উঠিয়ে দিতে হবে, অস্ত্রশস্ত্র চিরদিনের

জন্য বিসর্জ্জন দিতে হবে, যাতে কোনও জাতি কোনও দিন যুদ্ধ ক'রতে না পারে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের মূল কারণ উৎপাটিত করতে হবে। মানবসমাজকে এক যৌথপরিবারে (Common-wealth) পরিণত ক'রে, প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক নরনারীর অন্নবস্ত্রের সুবন্দোবস্ত ক'রতে হবে, প্রত্যেকের অভাবমোচনের ব্যবস্থা ক'রতে হবে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক জাতির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে, স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, যুদ্ধ করার প্রয়োজন কারও না হয়, যুদ্ধ করার চিন্তাও কারও প্রাণে না জাগে।

আর দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে মনোমালিন্যের অপর এক কারণ উৎকট দেশপ্রীতি (patriotism)। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যে, ইতিহাসে এই উৎকট দেশপ্রীতিকে জাগ্রত ক'রে রাখা হয়। দেশপ্রীতি ভাল ততক্ষণ, যতক্ষণ একজনের দেশপ্রীতি আর একজনের দেশপ্রীতিকে আঘাত না করে। স্বদেশের ও স্বজাতির আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ভাল ততক্ষণ, যতক্ষণ একজনের আত্মমর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে গিয়ে অন্য দেশের ও অন্যজাতির আত্মমর্য্যাদাকে আঘাত করতে না হয়। যে জাতি অন্যজাতির মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে জানে না তার প্রকৃত আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান হয় নাই। তাই দেশপ্রীতি যখন বিশ্বপ্রেমের পরিপন্থী হবে, তখন তাকে সংযত ক'রতে হবে। আজ রেল, ষ্টীমার, এরোপ্লেন সমস্ত বিশ্বকে এক ক'রে ফেলেছে, ব্যবধানকে দূর করে দিয়েছে, দেশের পরিধিকে বড় করে জগদ্ব্যাপী করে দিয়েছে। এখন আর মানুষের হৃদয়ের পরিধিকে নিজের দেশের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ ক'রে রাখলে চলবে না। মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাত্মবোধ জাগ্রত ক'রতে হবে।

সমস্ত মানবজাতির অখণ্ড কল্যাণের জন্য মানবপরিবারের প্রত্যেকের উন্নতির জন্য, পৃথিবীর সব দেশগুলিকে মিলিয়ে এক বিশ্বমিলনী (World-Union) বা বিশ্বসঙ্ঘ (World-federation) গড়তে হবে। জাতিগুলি পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন থাকলে, প্রত্যেকে নিজ নিজ সুখ, শান্তি, উন্নতিকে পৃথক ক'রে দেখলে, তাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদের সম্ভাবনা থেকে যাবে। আজ বাংলা দেশের কেহই বিহার বা পাঞ্জাবের সঙ্গে বিবাদ বা যুদ্ধ করার কল্পনাও করে না, কেন না তাদের সুখদুঃখ, শুভাশুভ অচ্ছেদ্য রূপে জড়িত। একই শাসনতন্ত্রের ভিতরে থাকলেই তাদের শান্তি অব্যাহত থাকবে, তাদের উন্নতি দ্রুত হবে। ভারতের সব প্রদেশগুলি মিলিয়ে যদি এক দেশে পরিণত করার প্রয়োজন থাকে, আমেরিকার সব রাজ্যগুলি মিলিয়ে যদি এক যুক্তরাজ্য গঠন করার প্রয়োজন থাকে, তা'হ'লে পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলিকেও মিলিয়ে এক বিশ্বমিলনী গঠন করার একান্ত প্রয়োজন। সকলে তখন এক দেশের লোক হয়ে যাবে, কে তখন কার সঙ্গে বিবাদ ক'রবে? সকলের উন্নতি, সুখশান্তি তখন এক অখণ্ড বস্তু হয়ে যাবে, একের উন্নতিতে সকলের উন্নতি হবে। সমস্ত বিশ্বমানবের সুখশান্তি বিধান ক'রলেই প্রত্যেকের সুখশান্তি বাড়বে।

ইহাই ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতার পথ। ইহাই ভারতের উন্নতির একমাত্র পথ। সমস্ত বিশ্বমানবকে স্বাধীন ক'রে তবে ভারত স্বাধীন হবে, সমস্ত বিশ্বমানবের সুখের পথ পরিস্কার ক'রে তবে ভারত সুখ পাবে, বিশ্বমানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথ মুক্ত ক'রে তবে সে তার উন্নতি বিধান ক'রতে পারবে। ইহাই হলো ভারতের সাধনা, ইহারই জন্য তাহার পরাধীনতা, তাহার অনন্ত দুঃখভোগ।

জগতের সমস্ত সমস্যা ভারতকে সুমীমাংসা করে দিতে হবে, সমস্ত অসামঞ্জস্যের ভিতর সামঞ্জস্য এনে দিতে হবে। অর্থনীতিক এবং রাজনীতিক ক্ষেত্রেও যেমন, ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও তেমনই। জগতে এই ধর্ম্ম নিয়ে কত বিবাদ, কত বিসম্বাদ, কত যুদ্ধ, কত গ্লানির সৃষ্টি হয়েছে। জমিজমা নিয়ে পার্থিব সম্পদ নিয়ে মানুষ যেমন দ্বন্দ্ব করে, ধর্ম্ম নিয়েও সেইরূপ দ্বন্দ্ব ক'রে ধর্ম্মের নামে জগতে কত নৃশংস ঘটনাই ঘটেছে। আজ এই নবযুগে, এই সত্যযুগে জগতের সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হবে। এই দন্দ্ব মিটাবার ভার ভারতের উপর। তাই শ্রীভগবান সকল ধর্ম্মকে এনে দিয়েছেন ভারতের ঘরে। তাই তিনি ভারতে মুসলমানকে এনেছেন, খৃষ্টানকে এনেছেন। ভারতকে তিনি কৃপা ক'রে এমনই অবস্থায় ফেলেছেন যে এই দ্বন্দ্বের সন্তোষজনক মীমাংসা না ক'রে ভারত এক পাও অগ্রসর হতে পারে না। হিন্দু-মুসলমানের বিসম্বাদ তার স্বাধীনতা লাভের পথে, তার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের পথে, তার পার্থিব, মানসিক, আধ্যাত্মিক সমস্ত উন্নতির পথে পরম বিঘ্ন স্বরূপ। এই বিঘ্ন তাকে দূর ক'রতে হবে। হিন্দুধর্ম্মের আর মুসলমান ধর্ম্মের বিরোধ মিটিয়ে, তাদের মিলন সাধন ক'রে, তাকে জগতের ধর্ম্মের বিরোধ দূর ক'রতে হবে, সমস্ত মানবজাতিকে ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তিতে মিলিত ক'রতে হবে। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ক'রতে হলে সকল ধর্ম্মের বিরোধ দূর ক'রতে হবে।

সমস্ত মুসলমানকে হিন্দু ক'রে, বা সমস্ত হিন্দুকে মুসলমান ক'রে ধর্ম্মের এই বিরোধের মীমাংসা হতে পারে না। তাহা কখনও সম্ভবপর নয়, আর তাহা বাঞ্ছনীয়ও

নয়। প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যে সনাতন সত্য আছে। তাই মুসলমানকে মুসলমানই রাখতে হবে, হিন্দুকে হিন্দুই রাখতে হবে, অথচ দুজনকেই কুসংস্কারমুক্ত ক'রে, এমনই এক উদার ভাবে অনুপ্রাণিত ক'রতে হবে, যাতে তারা উপলব্ধি ক'রতে পারে যে, তাদের শত বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা একই ধর্ম্মের লোক। তাদের ভিতর এই জ্ঞান জাগ্রত ক'রে তুলতে হবে যে, হিন্দুও যাকে চায়, মুসলমানও তাকেই চায়, সকল ধর্ম্মের বড় ধর্ম্ম হচ্চে শ্রীভগবানের পিতৃত্ব স্বীকার ক'রে, সমস্ত বিশ্বমানবকে তাঁহারই সন্তান জ্ঞান করা, সকলের সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে ব্যবহার করা। আজ সমস্ত মানবজাতির প্রাণে এই জ্ঞান বদ্ধমূল ক'রে দিতে হবে যে ধর্ম্ম যিনি, তাঁহার জাতি নাই তাঁকে হিন্দু ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম এই সব আখ্যা দিয়ে বিভাগ ক'রে ছোট করা হয়। মানুষের লক্ষ্য হিন্দু ধর্ম্ম বা মুসলমান ধর্ম্ম নয়, মানুষের জীবনের সাধনা ধর্ম্মকে লাভ করা, ধার্ম্মিক হওয়া।

ভারতের সাধনা ও সিদ্ধি

মানবজাতির ইতিহাসে কত জাতির উত্থান হলো, কত জাতির পতন হলো, কত জাতি ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে গেল। ভারত কিন্তু অচল অটল হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। অনন্ত কালস্রোত তার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্চে, বাহিরে তার কত পরিবর্ত্তন হচ্চে, কত ভাঙ্গাচূরা হচ্চে, কিন্তু তবুও ভারতের প্রাণপুরুষ কালকে জয় ক'রে গভীর ধ্যানে মগ্ন। সহস্র বৎসরের ঘাত প্রতিঘাতের ভিতরও ভগবান তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

যুগ যুগান্তর ধ'রে ভারত কিসের সাধন করছে? ভারতের সাধনের ধারাটী কোন্ পথ ধরে চলেছে? যুগ যুগান্তর ধরে ভারত একের সন্ধানে ফিরছে, একই তার লক্ষ্য, একই তার সাধ্য। জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যকে সে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে এককে খুঁজে পাওয়াই তার সাধনা। একের অভিব্যক্তিরূপে বহুকে ভারত গ্রহণ করেছে। বৈষম্যকে সে মুছে ফেলতে চায় নাই। বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠাই তার সাধনা। ভেদকে সে মেনে নিয়েছে, কেন না সমস্ত ভেদের মধ্যে অভেদ যিনি তাঁকে সে জেনেছে। সমস্ত বিশ্বের যিনি অন্তরাত্মা তাঁকে ভারত জেনেছে ও তাঁর ভিতর দিয়েই সে বিশ্বের সকলের সঙ্গে নিজকে এক ক'রে দেখেছে। ভারত বিশ্ব চরাচরের প্রত্যেকের সঙ্গে তার যে সহজ, সত্যকার যোগ তাহা খুঁজে পেয়েছে। বৈচিত্র্যের ভিতর ঐক্য স্থাপনই ভারতের সাধনার সনাতন ধারা। যুগ যুগান্তর ধরে ভারত এই ঐক্য মন্ত্রেরই সাধক। মৈত্রীই তার প্রাণের সহজ ধর্ম্ম।

ভারতের সহস্র বৎসরের পরাধীনতা তাহার সহস্র বৎসরের কঠোর সাধনা। ভারতের সহস্র বৎসর ব্যাপী পরাধীনতার লৌকিক কারণ অনেক থাকতে পারে; কিন্তু লৌকিক কারণও আপনা আপনি ঘটে না। তার পিছনে থাকে ভগবৎ ইচ্ছা। মানুষ যেখানে মূল কারণ খুঁজে পায় না সেখানে লৌকিক কারণ মাত্র দেখায়। ভারতের পরাধীনতার মূল কারণ ভগবৎ-ইচ্ছা। শ্রীভগবান এই সহস্র বৎসরের অশেষ নির্য্যাতনের ভিতর দিয়ে ভারতকে এক মহা তপস্যা করালেন। ভারতকে দিয়ে তিনি যে মহান কার্য্য সাধন করাবেন, তারই জন্য তাকে এই

মহা দুঃখ ভোগ করালেন। ভারতকে তিনি ভাল ক'রে, বড় ক'রে, মনের মত ক'রে, তাঁর বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত যন্ত্র ক'রে গ'ড়ে নিলেন। অশেষ দুঃখ কষ্টের ভিতরও ভারত চিরদিন তাঁকেই চেয়েছে, আর তাঁকেই পেয়েছে। যুগ যুগ ধ'রে এই ভারতের পুণ্য ভূমিতেই তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁর পাদস্পর্শে ভারতের ধূলিকণা পবিত্র হয়েছে। ভারত চিরদিন তাঁরই শরণাগত। ভারতকে তিনি অকারণে পরাধীনতার এই অনন্ত দুঃখ ভোগ করান নাই। ভারতের এই দুঃখ ভোগ তার নিজের জন্য নয়, ইহা সমস্ত জগতের জন্য। জগতের সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্যই ভারতের এই দুঃখ ভোগ। বিশ্বমানবের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের জন্যই, জগৎ হ'তে "পরাধীনতা" উঠিয়ে দিবার জন্যই ভারতের এই দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতা।

ভারতের প্রাণপুরুষ আজ জাগ্রত হয়েছেন। ভারতের নরনারীকে আশ্রয় ক'রে আজ দেবতারা কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছেন। দেবতারা তাদের দিয়ে জগতে কোন্ মহৎ কার্য্য সাধন করাতে চান? শ্রীভগবান ভারতের প্রাণতন্ত্রীতে কোন্ রাগিণীর ঝঙ্কার তুলতে চান, কোন্ ভাব ভারতের ভিতর ফুটিয়ে জগতের ভাব ধারাকে পুষ্ট ক'রতে চান, কোন্ বাণী ভারতকে দিয়ে জগৎকে শুনাতে চান, কোন্ বিরাট্ কার্য্য ভারতকে দিয়ে সাধন করাতে চান? ভারতের নরনারী দেবভাবে পূর্ণ হয়ে জগতের সমস্ত নরনারীর ভিতর দেবভাব উদ্বুদ্ধ ক'রবে—ইহাই হলো ভারতের বিধিনির্দ্দিষ্ট কার্য্য। ভারতের নরনারী ব্রহ্মবলে বলীয়ান্ হয়ে জগৎ হতে পাশবিক বলকে নির্ব্বাসিত ক'রবে, সমস্ত মানব-

জাতিকে "পরাধীনতা"র নাগপাশ হতে মুক্ত ক'রবে, জগৎ হতে অশান্তি অপ্রেমকে বিদূরিত ক'রে শান্তি ও প্রেম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ক'রবে—ইহাই ভারতের মিশন। ধরাতলে স্বর্গরাজ্য স্থাপনই ভারতের ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। এই বিরাট্ কার্য্য সাধনে দেবতারা ভারতের সহায়। যেদিন ভারতের নরনারী অনন্যচিত্ত ও অনন্যকর্ম্মা হয়ে, শ্রীভগবানের নিকট আত্মনিবেদন ক'রে, তাঁর শক্তিতে পূর্ণরূপে শক্তিমান্ হয়ে, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল শক্তি নিয়োজিত ক'রে, ধরাতলে স্বর্গরাজ্য স্থাপন ক'রবে, সেইদিন ভারতের সুদীর্ঘ সাধনার সিদ্ধিলাভ হবে। ভারত তার সাধনা দ্বারা, তার অনন্ত দুঃখ ভোগরূপ তপস্যা দ্বারা, সমস্ত জগতের পরাধীনতা দূর ক'রবে, সমস্ত মানবজাতির স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রবে ব'লে ভগবান ভারতকে সহস্র বৎসর ধ'রে পরাধীন রেখেছেন। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক্, সহস্র বৎসর ধ'রে ভারত ইহারই জন্য তপস্যা ক'রছে। আজ দেবতা প্রসন্ন হয়েছেন। তিনি বলছেন, "বর লও।" ভারত বর চাইল, "জগৎ হতে পরাধীনতা দূর হোক্, সমস্ত মানব জাতি স্বাধীন হোক্, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক্, সমস্ত মানব জাতি এক পরিবার হোক্, জগতে ধর্ম্মরাজ্য, শান্তিরাজ্য, প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক্।" দেবতা বলিলেন, "তথাস্তু"। আজ ভারতের সহস্র বৎসরের তপস্যা সার্থক হয়েছে। তার সুদীর্ঘ সাধনার সিদ্ধি করতলগত হয়েছে।

ভারতের কর্ত্তব্য

ভারত এখনও আত্মবিস্মৃত। তার জীবনের লক্ষ্য কি

আজও তাহা সে জানে না। তার সাধনার ধারাটী কোন্ পথে, এখনও সে বুঝতে পারছে না। সে চলেছে অন্যান্য জাতিদের নকল ক'রে, গড্ডালিকা প্রবাহে, নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে। তাই তার স্বাধীনতার সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্চে।

ভারত এখনও অন্ধের ন্যায় চলেছে। আপাত দৃষ্টিতে সে যাহা ভাল মনে ক'রছে তাকেই শ্রেয়ঃ ব'লে গ্রহণ ক'রছে। সে ভাবে না, চিন্তা করে না। সামনে সে ইংরাজকে দেখছে। ইংরাজের উপরই তার সমস্ত দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে। তার মন ইংরাজকে নিয়ে ব্যস্ত, তার সমস্ত চিন্তা ইংরাজকে কেন্দ্র ক'রে। 'ইংরাজ দেশের স্বাধীনতা হরণ করেছে'; 'ইংরাজের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা উদ্ধার ক'রতে হবে'—ইংরাজই তার মনের সবখানি দখল ক'রে বসেছে। ইংরাজের বিরুদ্ধেই তার অভাব অভিযোগ, সভাসমিতি, আন্দোলন। ইংরাজকে ভারত অত্যন্ত বড় ক'রে ও খুব বেশী ক'রে দেখছে। ইংরাজ ভারতের মনকেও জয় করেছে। তার মন ইংরাজকে ছেড়ে তার পরাধীনতার যেখানে মূল সেখানে যেতে পাচ্ছে না।

আজ ইংরাজের কাছ থেকে ভারতের মনকে মুক্ত ক'রতে হবে। ভারতের সম্বন্ধ শুধু ইংরাজের সঙ্গে নয়। সে বিশ্বের মাঝখানে বাস ক'রছে, তার সম্বন্ধ সমস্ত বিশ্ব-মানবের সঙ্গে। ইংরাজ মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকায় ভারতের সব দৃষ্টি তারই উপর গিয়ে পড়েছে। সে বিশ্ব-মানবকে ভাল ক'রে দেখতে পাচ্ছে না। আজ তাকে প্রকৃতিস্থ হতে হবে, তার মনকে ইংরাজের কাছ হতে ফিরিয়ে আনতে হবে, বিশ্ব-মানবের সঙ্গে তার সহজ সম্বন্ধ উপলব্ধি ক'রতে হবে। ভারতকে আজ মানব

জাতির স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে, বিশ্ব-মানবের মহামিলনের পুরোহিত হতে হবে।

ভারতকে আজ আত্মস্থ হতে হবে। ভারতকে আজ সর্ব্বাগ্রে শ্রীভগবানের চরণে আত্মনিবেদন ক'রে, সর্ব্বপ্রকারে তাঁরই শরণাপন্ন হয়ে, তাঁরই হাতের যন্ত্র হয়ে বাজতে হবে। ভারতকে আজ ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হতে হবে। ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ। ধর্ম্মই তার শ্বাস প্রশ্বাস, ধর্ম্মই তার জীবনী শক্তি। ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রেই ভারতের প্রাণশক্তিকে জাগ্রত ক'রতে হবে। ভিতরের বন্ধন যদি না টুটে তা' হ'লে বাহিরের বন্ধন খসবে কেমন ক'রে? ভিতরে যদি শক্তি জাগ্রত না হয়, তা হলে বাহিরের উত্তেজনা তাকে কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবে? ভারতের লক্ষ্য আজ ক্ষুদ্র, তাই তার স্বাধীনতা আন্দোলনকে নিত্য নূতন উত্তেজনায় জাগিয়ে রাখতে হচ্চে, সামান্য বাধা বিঘ্নে তাহা ভেঙ্গে পড়ছে। ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে, ভগবানকে ভুলে, ভারতের প্রাণ জাগবে না, ভারতের শক্তিলাভ হবে না। ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রেই ভারত পূর্ণ শক্তিমান্ হবে ও জগতে অসাধ্য সাধন ক'রবে।

ইং ১৯১১ সালের ৩০শে জুন, পুলিশ যখন ক্রমাগত অরুণাচলের উপর অত্যাচার ক'রতে লাগলো, মিশনের ধর্ম্মকার্য্যে পদে পদে বাধা দিতে লাগলো, যখন রাজপুরুষগণের কাছ হ'তে এমন কি সম্রাটের কাছ হ'তেও কোনও প্রতীকার পাওয়া গেল না, তখন শ্রীদয়ানন্দ ঘোষণা ক'রলেন, "একমাত্র ধর্ম্মকে লক্ষ্য ক'রে আমি রাজা প্রজা সম্বন্ধ রহিত করিলাম।"

আজ ভারতকেও একমাত্র ধর্ম্মকে লক্ষ্য ক'রে, বিশ্বের

কল্যাণ কামনায় স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রতে হবে। এ স্বাধীনতা কেবল তার নিজের জন্য নয়। তাকে সমস্ত জগতের "পরাধীনতার" বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রতে হবে। সমস্ত পরাধীন জাতির স্বাধীনতা, সমস্ত মানবজাতির স্বাধীনতা ভারত ঘোষণা করুক। ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের গণ্ডীর বাহিরে এসে ভারত বিশ্বমানবের সঙ্গে দাঁড়াক্।

ভারত ইংরাজকে বলুক, "এতদিন তোমার অধীনতা আমি সহ্য ক'রে এসেছি, আজ ৪৫ বৎসর ধরে তোমাকে আমার দাবী জানিয়েছি, তুমি তাতে কর্ণপাত কর নাই। পরাধীনতা মানবধর্ম্মের বিরোধী, জাতির পার্থিব, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল প্রকার উন্নতির বিরোধী। আজ আমার দেবতার বাণী পেয়েছি। ভারত যতদিন পরাধীনতাকে মেনে চ'লবে ততদিন জগতে পরাধীনতার অবসান হবে না। ধর্ম্মের নামে, সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য আজ আমি তোমার অধীনতা অস্বীকার ক'রলাম। আজ হতে আমি স্বাধীন।

"তুমি ভারতকে অধীন রেখে জগৎকে অধীন রেখেছ। ভারত ও অন্যান্য অনেক দেশকে অধীন রেখে জগতে পরাধীনতাকে অটুট ক'রে তুলেছ। তোমার এই কার্য্য অন্যায়, অধর্ম্ম, মানবধর্ম্মবিরোধী, মানবজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পরিপন্থী। আজ ধর্ম্মের নামে, তোমার এই পাশ আমি ছেদন ক'রলাম। আজ সমস্ত মানবজাতির নামে, আমি সমস্ত মানবজাতির স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রলাম। আজ হ'তে আমি কোনও জাতির অন্য জাতিকে অধীন রাখার অধিকার স্বীকার করবো না।

"এতদিন তোমাতে আমাতে যে যোগ ছিল, তাহা মিলন নয়, তাহা প্রেমের যোগ নয়। ভারতের ভগবান এতদিন তাহা সহ্য ক'রে এসেছেন, তোমার শিক্ষার জন্য, আমার শিক্ষার জন্য, জগতের শিক্ষার জন্য। আজ স্বয়ং বিধাতা পুরুষ ভারতকে চালিত ক'রছেন। ভারত আজ তাঁরই হাতের যন্ত্র হয়ে বাজ্‌বে। তোমায় আমায় এই যে বাহিরের অপ্রেমের যোগ. তাহা আমি ছিন্ন করলাম। আজ তুমিও স্বাধীন, আমিও স্বাধীন. সমস্ত মানবজাতি স্বাধীন।

"তুমি মানবপরিবারের একজন মাত্র। কিন্তু তুমি অন্ধ হয়ে নিজের সুখের জন্য মানবপরিবারের বহু জাতির সুখ, শান্তি, আনন্দ হরণ করেছ। তাতে তোমার নিজের কতখানি প্রকৃত সুখ, শান্তি, আনন্দ লাভ হয়েছে—তুমি ভেবে দেখ।

"তোমার অন্নবস্ত্রের দাবী, তোমার উন্নত জীবন যাপনের জন্য যাহা প্রয়োজন সে সমস্তের জন্য তোমার দাবী সম্পূর্ণ ন্যায্য। কিন্তু তোমার দাবী বজায় রাখতে এ ভাবে অন্যান্য জাতির ন্যায্য দাবীকে পদদলিত করবার অধিকার তোমার নাই।

"যদি বর্ত্তমান মানবসমাজ-ব্যবস্থায় তোমার দাবী ন্যায় সঙ্গতভাবে পূরণ না হয়, তা হ'লে এস, আমরা সকলে মিলে এই মানবসমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করি। ইহা তো আমাদেরই হাতে। তোমার যাহা প্রয়োজন তাহা তুমি বিশ্বমানবের ভাণ্ডার হতে স্বচ্ছন্দে লও। আর তোমার ঘরে যাহা উদ্বৃত্ত হবে তাহা বিশ্বভাণ্ডারে দিয়ে দাও। তোমারও অভাব পূরণ হোক্, অন্যান্য জাতিরও অভাব পূরণ হোক্। অন্যান্য জাতিকে অধীন রেখে,

জোর ক'রে তাদের ঘরের জিনিষ নিয়ে আসার চেয়ে এ ব্যবস্থা সহস্রগুণ ভাল।

"তোমার সাম্রাজ্য ভেঙ্গে দিয়ে ভারত তোমাকে ছোট ক'রতে চায় না। তোমার সাম্রাজ্য বিশ্বমানবসাম্রাজ্যে পরিণত হোক্, তোমার হৃদয়ের পরিধি বড় ক'রে তার ভিতর বিশ্বমানবকে গ্রহণ কর। ভগবান তোমাকে জ্ঞান-বুদ্ধি শিক্ষা-সভ্যতা দিয়ে বড় করেছেন। তুমি বড়ই থাক। মানবপরিবারে বড় ভাইয়ের মত অন্যান্য জাতির মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার কর, সকলকে শিক্ষা দাও, সকলকে তোমার মত উন্নত ও সুসভ্য ক'রে তোল, সমস্ত মানবজাতির প্রেমের পাত্র হও। কিন্তু তোমার অপর জাতিকে অধীন রাখার অধিকার আজ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হলো।

"তোমার সাম্রাজ্যের বাহিরে চলে গিয়ে ভারত তোমাকে পর ক'রতে চায় না। ভারত চায় তোমার সঙ্গে সত্যকার যোগ, প্রাণের যোগ, ভিতরে বাহিরে যোগ। সে যোগ সমানক্ষেত্রে, সমানভাবে, বন্ধুভাবে। সে যোগ বিশ্বপিতা শ্রীভগবান্‌কে সম্মুখে রেখে, তাঁরই চরণতলে। ভারত চিরদিন মিলনমন্ত্রের সাধক, ভারত চায় তোমার সঙ্গে পূর্ণ মিলন। ভারত তার নিজের কল্যাণের জন্য, তোমার কল্যাণের জন্য, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য, জগতের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে কর্ম্ম ক'রতে চায়। এতদিন তোমার শক্তি তুমি নিয়োজিত করেছ ভারতকে ও অন্যান্য জাতিকে অধীন রাখতে। তারাও তাদের শক্তি ব্যয় করেছে তোমার শক্তিকে পরাভূত করতে। এই শক্তিক্ষয়ের আজ অবসান হোক্। এস, আজ পূর্ণ মানবতার ক্ষেত্রে দুইজনে মিলে, দুইজনের শক্তিকে সম্মিলিত

ক'রে বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করি। তাতে তোমারও কল্যাণ হবে, আমারও কল্যাণ হবে, সমস্ত মানবজাতির কল্যাণ হবে। আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন জাতির স্বতন্ত্র চেষ্টায়, মানবজাতির যতটুকু উন্নতি, যতটুকু সুখ সুবিধা আরামের ব্যবস্থা হয়েছে, সমস্ত মানবজাতির সম্মিলিত শক্তি তাতে নিয়োগ ক'রলে তাহা সহস্রগুণ বাড়বে, মানবপরিবারের প্রত্যেক নরনারীর অভাব অভিযোগ, দুঃখ কষ্ট দূর হবে। প্রত্যেক নরনারীই সুখে, শান্তিতে, আরামে, আনন্দে জীবন যাপন ক'রতে পারবে। সকলের আনন্দে বিশ্বজগৎ সুখময়, শান্তিময়, আনন্দময়, হয়ে উঠবে। বিশ্বপিতা শ্রীভগবান তাতে তৃপ্ত হবেন, সমস্ত মানবজাতির উপর তাঁর আশীষ বর্ষিত হবে।"

ভারতের প্রাণপুরুষ যুগ যুগ ধরে সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় বসে আছেন। যুগ যুগ ধরে তারই জন্য তিনি তপস্যা ক'রছেন। দেবতা আজ প্রসন্ন হয়ে বর দিয়েছেন। ভারতের সিদ্ধিলাভ হয়েছে। জগতে আজ ধর্ম্মের রাজ্য, শান্তির রাজ্য, প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

ধর্ম্মের নামে, বিশ্বমানবের নামে ভারত যেদিন নিজের ও সমস্ত মানবজাতির স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রবে, জগতের ইতিহাসে সেদিন মহাস্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। সেদিন আকাশ বাতাস জুড়ে সেই সুর বাজতে থাকবে। ভারতের এই অপূর্ব্ব ঘোষণা বিশ্বের প্রতি নরনারীর প্রাণে বিপুল নাদে ধ্বনিত হবে। সেদিন বিশ্বের কল্যাণকামী এই বিরাট্ চিন্তা বিশ্বের প্রতি নরনারীর হৃদয়কে আলোড়িত ক'রে তুলবে। সেদিন ভারতের এই মহাভাব প্রতি নরনারীর অন্তরের দেবতাকে জাগ্রত ক'রবে, তাদের হৃদয়ের

সকল ক্ষুদ্রতা, সকল দৈন্য, সকল মলিনতা ধুয়ে মুছে দিবে। বিজেতার প্রতি বিজিতের বিদ্বেষ ভাব ধুয়ে যাবে, বিজিতের প্রতি বিজেতার উপেক্ষার ভাব ঘুচে যাবে। সেদিন স্বাধীনতার শত্রু মিত্র হয়ে উঠবে, স্বাধীনতার প্রতিকূল শক্তি অনুকূল হয়ে যাবে। এই বিরাট্ চিন্তার কাছে আর কেহ ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্রভাব পোষণ ক'রতে পারবে না। এই স্বর্গীয় আদর্শের কাছে সকলকেই মাথা নত ক'রতে হবে। এই মহাভাব সেদিন বিশ্বমানবকে এক ক'রে দিবে। এই মহাভাব সেদিন প্রাচ্য, প্রতীচ্য, শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত—সকলকে প্রাণে-প্রাণে মিলিয়ে দিবে। সেদিন মানবজাতির হৃদয় যমুনা উজান বহিবে, পৃথিবী নববৃন্দাবনে পরিণত হবে। সেদিন বিশ্বমানবের মহামিলনোৎসব উপস্থিত হবে। মর্ত্ত্য সেদিন স্বর্গ হবে, স্বর্গ সেদিন মর্ত্ত্যে নেমে আসবে। সেদিন পৃথিবীর আনন্দের তরঙ্গ ঊর্দ্ধলোকবাসীদের কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছবে। সেদিন সপ্তলোকবাসীরা এক সুরে সুর মিলিয়ে বিশ্বপিতা শ্রীভগবানের জয় গান ক'রবে।

সম্পূর্ণ

ভুল সংশোধন

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯	১১	দিতে	মন দিতে
৬৩	৩	knit	and to knit
৯১	২২	কেলবার	ফেলবার

অরুণাচল গ্রন্থাবলী

১। ঠাকুর দয়ানন্দ (২য় সংস্করণ)
৺মহেন্দ্রনাথ দে, এম, এ, বি, এস্ সি, প্রণীত … ১৲

২। নবযুগ ও অরুণাচল … … ৸৹

৩। অরুণাচল মিশন … … ৷৷৹

৪। শান্তি-বাণী … … ৷৷৹

৫। ঐ হিন্দী … … ৷৷৹

৬। রুদ্র-বীণা (সঙ্গীত) … … ৷৶৹

৭। ময়ণার বুলি (কবিতা) মাতাজী মৈত্রেয়ী দেবী প্রণীত ৷৹

৮। বিশ্বশান্তি
যদুনাথ সিংহ, এম, এ, পি, আর, এস্ প্রণীত … ২৲

৯। The Master's World-Union Scheme … ৩৲

১০। New Era … … ১৲
By Jadunath Sinha, M. A., P. R. S.

১১। Free India … … ৷৷৹

১২। India's Salvation … … ৷৷৹

১৩। World Peace (An International weekly published by the Mission) (Paper-bound volume—incomplete). … … ৫৲

শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন প্রকারের ফটো ৵৹, ৷৹

প্রাপ্তিস্থান—

অরুণাচল মিশন,
লীলামন্দির, দেওঘর পোঃ অঃ,
ই, আই, আর।